

ভালোবাসা

সমরেশ মজুমদার



বাংলাবুক.অর্গ



সমরেশ মজুমদারের জন্ম হয় ১৯৪২ সালে, বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৬ শে ফাল্গুন। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা বাগানে। স্কুলের ছাত্রজীবন কেটেছে জলপাইগুড়িতে। ১৯৬০ সালে কলকাতায় আসেন কলেজে পড়বার জন্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ.। প্রথম গ্রুপ থিয়েটার ও নাটক লেখা থেকে গল্প লেখা শুরু। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের বিষয়, গল্প বলার ভঙ্গি ও আঙ্গিক গতানুগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মুক্ত। এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের-পাঠক পাঠিকারা তাঁর প্রায় প্রথম আবির্ভাবেই তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। ১৯৮২ সালে আনন্দ পুরস্কার, 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে বিভিন্ন পুরস্কার, ও ১৯৮৪-তে 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার তাঁর অনন্য সাহিত্যকৃতিরই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

ভালোবাসা

সমরেশ মজুমদার

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org



মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

B H A L O B A S A

By Samaresh Mazumdar

❶ পরমা মজুমদার

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯২ / জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৩ / এপ্রিল ১৯৮৬

তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৯৩ / জানুয়ারী ১৯৮৭

চতুর্থ সংস্করণ : পৌষ ১৩৯৬ / জানুয়ারী ১৯৯০

 *The Online Library of Bangla Books*
BanglaBook.org

পঞ্চম সংস্করণ : পৌষ ১৪০০ / জানুয়ারী ১৯৯৪

প্রকাশিকা : লিতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ । নিউ ঘোষ প্রেস । ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সদ্ধীর মৈত্র অলংকরণ : গোতম রায়

প্রকাশিকা যখন ‘ভালোবাসার’ পরিকল্পনা করেছিলেন তখন আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখা গেল পরিকল্পিত ভালোবাসারও চাহিদা আছে। নাহলে এত অল্প সময়ে প্রকাশিকার অভিলাষ পূর্ণ হতো না। ঠিক প্রেমের গল্প বলে যেসব আখ্যানের কথা আমরা জানি সেগুলো কি কারণে জানিনা আমার কলম থেকে বের হতে চায় না। আমার প্রেম অন্যরকম। এই অন্যরকম ‘ভালোবাসা’ আপনাদের ভাল লেগেছে বলে আমি কৃতজ্ঞ।

মোহাম্মদ হুসাইন

ভালোবাসা, তোমাকেই

উপন্যাস

এই আমি রেগড় ১১

বড়গল্প

খড়ির গাঙী ১১৯

গল্পগুচ্ছ

মদুস্তবন্ধ ১৫৩

অক্টোপাস ১৬৫

শিকার কাহিনী ১৭৭

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ১৮৯

জন্ম বৃত্তান্ত ১৯৮

বেলোয়ারী ২১৩

ঠাকুর, থাকবি কতক্ষণ ২২২

জিয়োন মাছ ২৩২

মাতৃকা ২৪৪

চর, শহর এবং একটি বেকুফ ২৫৭

জমা জমি ২৬৯



উপন্যাস



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(**BANGLABOOK.ORG**)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে সন্মিত থমকে দাঁড়ালো। দরজা ভেজানো, তালা খোলা। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে, বেরদ্বার সময় ও ঠিকঠাক তালা লাগিয়েছিলো। ওদের এই মেসের বাসিন্দারা একটু অন্য ধরনের, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না, প্রত্যেকেই ভালো চাকুরি করে, চুরিটুরি কোনকালেই হয়নি। কেউ যে ইয়ার্কি করে তালা খুলবে এমন নয়।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চমকে উঠলো সন্মিত। সারাঘর তখনই করে গেছে কেউ জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো! এমনকি ওর সন্মিতকেশের ডালা খোলা, জামা-প্যান্ট বিছানার ওপর স্তূপ করে রাখা। টেবিলে দামী ঘড়িটা ঠিক আছে, একটা সেভার্স কলম ছিল সেটাও আছে। মাথার বালিশের নিচে একটা মোটা খামে তিনশো টাকা ছিল, সন্মিত দেখলো যে এসেছিলো সে টাকাগুলো স্পর্শ করেনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে সন্মিত চেষ্টা করে ওদের চাকরকে ডাকলো। লোকটা অনেকদিনের পুরনো, হলফ করে বললো কাউকে আসতে দ্যাখেনি। আজ রবিবার, সব বাবুরা মেসেই আছেন, কেউ এলে নিশ্চয়ই জানা যেত। সন্মিতের ঘর তিনতলায় ছাদের ওপর। সিঁড়ি দিয়ে অচেনা লোক এলে ঠাকুর-চাকর কেউ না কেউ দেখতো।

অথচ বোঝাই যাচ্ছে, কেউ ওর ঘরে এসেছিলো। বাইরে থেকে যদি না আসে, তাহলে এই মেসেরই কেউ। সেটা ভাবতে সন্মিতের কণ্ঠ হচ্ছে। জিনিসপত্রগুলো গোছাতে গিয়ে ও দেখলো কিছুই নিয়ে যায়নি লোকটা। তাহলে কেন এসেছিলো। সন্মিত কেমন নাভাস হয়ে যাচ্ছিলো।

ওর জানলা দিয়ে সামনের ট্রাম রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন এদিকটায় কম। সন্মিত দেখলো একটা খারাপ ট্রাম আলো নিভিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেলো। আর ঠিক ট্রামটা চলে যেতেই ও দেখতে পেলো সামনের সিগারেটের দোকানের পাশে ঝোলান দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে ধরিয়ে একটা শূণ্ডা মতন লোক ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে জানলার সামনে থেকে সরে এলো সন্মিত, তারপর ঘাতে ওকে না দেখতে পায় এমনভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। ছেলেটাকে আগে কখনও দ্যাখেনি সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এদিকে। এক সময় সিগারেটওয়ালার এক জিজ্ঞাসা করলো। কি করলো সেটা অবশ্য হচ্ছে করলেই জানতে পারে সন্মিত। রোজ তিন প্যাকেট ফিল্টার উইলস কেনে ও লোকটার কাছ থেকে, মিস্টার না কি যেন নাম। সিগারেট ধরিয়ে লোকটা পাশের রকে গিয়ে উবু হয়ে বসলো। অনেকটা শকুনের মতন, টাক মাথাটা ওপর দিকে তোলা।

এই লোকটাই কি ওর ঘরে এসেছিলো? সন্মিত ওর ঘরে পায়চারী করলো খানিক। হঠাৎ ওর মনে পড়লো কাল অফিসে একটা টেলিফোন এসেছিলো। ও তখন ডিরেক্টরের ঘরে। ফিরে এসে শুনলো যে টেলিফোন করেছিলো সে নাম বলেনি। মেয়েলি গলা। শুনলে একটু অবাক হয়েছিলো। ও মহিলাদের সঙ্গে ইদানিং ওর যোগাযোগ নেই। আগে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সবার মতন ওরও কিছু মেয়ে বন্ধু ছিলো তার যেমন হয়, আর যোগাযোগ রাখেনি। ঠিক তখন ওর বন্ধুর মধ্যে টক্ করে উঠেছিলো। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে সিগারেট ধরিয়েছিলো সন্মিত। যাঃ, হতেই পারে না। যে টেলিফোন ধরেছিলো তাকে গলাটা কেমন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হাছিলো ওর। বন্ধুর মধ্যে কিছু একটা তির তির করে কাঁপুনি ধরাছিলো।

লোকটা এখনও বসে আছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। রাস্তায় লোকজন কম। কেউ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে—এটা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। তাছাড়া লোকটা বেশ রোগা পটকা, ইচ্ছে করলেই সন্মিত ওকে কাবু করতে পারে। দরজা বন্ধ করে ও নিচে নেমে এলো।

আকাশে একটু মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সন্মিত ট্রাম লাইন পেরিয়ে সিগারেটের দোকানের কাছে এলো। লোকটা তখনও ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করেই ঘরের আলো নেভায় নি সন্মিত। প্রায় পাশে এসে ভালো করে লোকটাকে দেখলো ও। এক একটা লোক থাকে থাকে দেখলেই গিরগিটির কথা মনে পড়ে, প্যাণ্ট বা ধুতি কোনটাতেই তাদের মানায় না। এই সময় লোকটার নজর পড়লো ওর দিকে। চমকে উঠে মাথা ঝাঁকালো লোকটা। বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে ওকে ডাকলো সন্মিত। একটা শামুকের মত নিজেকে গাউটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। না, কোনকালে একে দ্যাখেনি সন্মিত। এরকম চেহারা কোন কালে ভোলা যায় না।

‘কি চাই?’

হাসলো লোকটা। গা রি-রি করে উঠলো সন্মিতের। হাসির সময় কালো মাড়ি দেখা একদম সহ্য হয় না ওর।

‘আসুন স্যার, একটু চা—’ ঘাড় বেঁকিয়ে সন্মিতের দিকে একটু হেসে আঙ্গুল দিয়ে ওপাশের চায়ের দোকান দেখালো। লোকটা এর মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে, সন্মিত অবাক হয়ে দেখলো।

‘আমার ঘরে আপনি গিয়েছিলেন?’ সন্মিতের ইচ্ছে হাছিলো লোকটার জামার কলার ধরে সন্মিতের গাছের মত মাথা দোলালো লোকটা—নেভার নেভার। আমি স্যার বেলা তিনটে থেকে এখানে বসে আছি, বিশ্বাস না হয় ওই সিগারেটের দোকান-দারকে জিজ্ঞাসা করুন। ও-সবের মধ্যে আমি নেই। কি যে বলেন স্যার।’ তারপর হঠাৎ চুপ করে ওর ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো ‘আলোটা জেঁদে এসে আমাকে ভড়কে দিয়েছিলেন মাইরি। আসুন স্যার একটু চাই খাই, পাঁচ ঘণ্টা চা

খাইনি, খেতে খেতে কথা বলি।’ সুড়ুং করে রাস্তা পেরিয়ে গেলো লোকটা, গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালো।

দারুণ অবাক হলো সুদমিত। লোকটা একটু অপেক্ষা করলো না, চা খেতে ওর আগ্রহ আছে কিনা জানবার জন্য। চায়ের দোকানটা এখন খালি হয়ে এসেছে। চা খেতে ওর কোন সময়ই আপত্তি নেই, কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে খাবে কেন? প্রথম কথা লোকটাকে সে চেনে না, তার ওপর এর চাল-চলন সন্দেহজনক। বিনা কারণে ও চা খেতে বলবেই বা কেন? ও যদি তিনটে থেকে এখানে বসে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছে কেউ ওর ঘরে এসেছিলো। সুদমিত সিগারেটওয়ালা সামনে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে লোকটাকে দেখালো—‘এই লোকটা এখানে কতক্ষণ আছে তুমি জানো?’ মুখ বাড়িয়ে মহাবীর না কি যেন নাম, লোকটাকে দেখালো, ‘হাঁ সাব, সামকে আগেমে ইঁহা বৈঠা হ্যায়, সি. আই. ডি. হোগা সাইদ, কাঁহাভি নেহি গেল্লা অউর আপকো বাৎ পুছা। সুদমিত দেখলো লোকটা মাথা নেড়ে তাকে ডাকছে।

শেষ পর্যন্ত একটা কৌতূহল ওকে চায়ের দোকানে নিয়ে এলো। কোণার দিকের একটা টেবিলে বসেছিলো লোকটা। পাসিং-শোর একটা প্যাকেট দিয়ে টেবিল ঠুকছিলো। কৌতুক বোধ করলো সুদমিত। আজকাল পাসিং-শোর প্যাকেট হাতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। সুদমিতকে দেখেই লোকটা বললো ‘বিশ্বাস হল স্যার?’ তারপর চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লো—‘এই লাইনে পঁচিশ বছর কাজ করেছে, মিথ্যা জিনিসটা আমার মধ্যে পাবেন না একদম।’

সুদমিত চেয়ার টেনে বসতেই লোকটা বললো—‘দেশলাই আছে স্যার?’ যেন তার কাছে দেশলাই আছে কিনা জানবার জন্যই তাকে ডাকা। পকেটে থাকা সন্ত্রেও সুদমিত বললো, ‘না’। লোকটা বয়কে ডাকলো, দেশলাই চেয়ে নিয়ে দু’কাপ চা দিতে বললো। হঠাৎ সুদমিত বলে ফেললো, ‘এক কাপ দিতে বলুন।’

চোখ ছোট ছোট করে তাকালো লোকটা, মানে? আপনি খাবেন না? সেকি! আপনার তো চায়ে অরুচি নেই। ‘কাল সারাদিনে সাতকাপ চা খেয়েছেন। মেসে দু’কাপ বাইরে পাঁচ কাপ। তার মধ্যে অফিসে তিন কাপ, আর দু’কাপ চৌরঙ্গীতে আপনাদের আড্ডায়। যাঃ, চা খাবেন না তা কি হয়।’ মাড়ি বের করে হাসলো লোকটা।

হতভম্ব হয়ে গেল সুদমিত। সত্যিই তো কাল বেশী চা খাওয়া হয়েছে। আর এটা তো তার খেয়ালই হয়নি! এই লোকটা এ-সব জানলো কি করে? তার মানে নিশ্চয়ই ও পেছন পেছন ঘুরেছে কালকে। অথচ একে একবারও দ্যাখিনি সুদমিত।

‘কি বলতে চান বলুন।’ গম্ভীর হ’ল সুদমিত।

হাসলো লোকটা—‘বসুন না, চা আসুক।’

‘আপনাকে আমি কিন্তু চিনি না।’ কথা বলতে চাইলো সুদমিত। লোকটা যেন তার ওপর কৃত্ত্ব করতে চাইছে। ব্যাপারটা হতে দেওয়া ঠিক নয়।

‘না না, চিনবেন কি করে !’

‘তাহলে ?’

‘স্যার, আপনার সঙ্গে একটা ব্যবসার কথা বলতে এসেছি ।’

‘ব্যবসা’, মজা লাগলো—সন্মিতের—‘আমি ব্যবসা করি না ।’

‘আমি করি স্যার ।’

‘কিসের ?’

‘হবে হবে, চা খান আগে ।’ সিগারেট ধরিয়ে মদুঠো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো লোকটা । এখন ওর চোখ বন্ধ । যেন সময় নিম্নে পরিবেশ তৈরী করতে চায় । জামা কাপড়ে লোকটার অবস্থা তেমন ভালো নয় । হলদে টেরিলিনের শার্টের ফাইবার উঠি উঠি করছে । এই ধরনের শার্ট আজকাল কেউ পরে না । নাকের লোমগুলো আরশুলার ঠ্যাঙের মত বেরিয়ে এসেছে । লোকটার সারা শরীরে সৌখিনতার মধ্যে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর লাল স্নাতোয় বাঁধা পেতলের একটা তাবিজযার ওপর ইংরেজীতে নাম খোদাই করা বি. জি. ।

‘কি বলবার তাড়াতাড়ি বলুন ।’ সন্মিত পা ঘষলো ।

‘আপনার ঘরে স্যার চারটে নাগাদ লোক ঢুকোঁছিলো ।’ বয় চা দিয়ে যেতেই খুব সহজ গলায় লোকটা বললো । ‘আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর, পরে বুঝলাম, না ।’

সোজা হয়ে বসলো সন্মিত—‘আপনি দেখেছেন ?’

ঘাড় নাড়লো লোকটা—আপনাদের পাশের বাড়িটা তো একটা স্কুল, না ? ওর ছাদ থেকে আপনাদের ছাদে চলে এলো লোকটা । তারপর একবার জানলায় মুখ দেখলাম । মুখ দেখেই বোঝা যায় নিরাশ হয়েছে । তারপর নিচে একটা জিপের দিকে হাত নেড়ে কি বলে চলে এলো স্কুল বাড়ি দিয়ে । জিপটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো, আমি লক্ষ্য করিনি । লোকটা জিপে উঠে বলেছিলো, একটাও পেলাম না, আসলটাও নেই । কথাটা আমি শুনিয়েছি স্যার ।’ হঠাৎ লোকটা ওর হাত চেপে ধরলো—‘স্যার তিনদিন ধরে আপনি আমাকে খুব ধরিয়েছেন, একটু যে একা পাবো তার উপায় নেই । মেসে বা অফিসে যেতে সাহস হয় না । এদিকে আমার ক্র্যাশেট মাইরি—মালটা আমাকে দিয়ে দিন স্যার, প্লিজ ।’

‘মাল ? কি যা তা বলছেন ?’ রেগে গেলো সন্মিত ।

মুখ নিচু করে চায়ের তলানিটা খেলো লোকটা, তারপর হেসে বললো, চিঠিগুলোর কথা বলছি স্যার ।’

‘চিঠি—কিসের চিঠি ?’ বিরক্ত এবং অবাক হয়ে সন্মিত চোখ কোঁচকালো । লোকটা তাকে কি বলতে চায় । বলছে কদিন থেকেই ফেলো করছে । শালা ! এই কদিনে সে অনেক কিছুই করেছে যা এই লোকটা দেখেছে । অনেক কিছু যা নিজে নিজে করা যায় এবং যা নিজের কাছে সাধারণ ব্যাপার, তা কেউ জানলে বা দেখলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ভরা বাসে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ভালো বন্ধুকে আড়চোখে দেখতে বেশ

লাগে, কিন্তু যখনই বৃষ্টিতে পারা যায় আর কেউ ব্যাপারটা দেখছে ঠিক তখন সব তেতো হয়ে যায়। এই লোকটা ওর নিজস্ব ব্যাপার—। ঠোঁট কামড়ালো স্ফূর্তিত। এ শালা চিঠি চাইছে। ‘কার চিঠি?’

‘স্যার, আমার ক্লায়েন্ট খরচ করতে রাজী আছে, আপনি চিঠিগুলো দিয়ে দিন।’ দেশলাই চাওয়ার মত মৃদু করে লোকটা বললো। ‘পরিস্কার করে বলুন, আমি বৃষ্টিতে পারছি না।’—স্ফূর্তিত ওর চোখের দিকে তাকালো। শালার চোখ কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না।

চোরারটা টেনে নিলো লোকটা। ‘আর কারো চিঠি আছে নাকি আপনার কাছে? দিয়ে দিন স্যার, ফিফটি-ফিফটি হয়ে যাবে।’

‘কি পাগলের মত বলছেন?’ ধমকে উঠলো স্ফূর্তিত। ওর গলার স্বর শুনতেই লোকটা চট করে হাতের তাবিজটা আঁকড়ে ধরলো, ধরে হাসলো—‘রাগ করবেন না স্যার। এইটাই আমার ব্যবসা। আগে লোকে একটাই প্রেম করতো, আমরাও দুটো পয়সা পেতাম। ব্যাপারটা যে অনেকদিন গড়াতো। আর এখন নাকি একটাই প্রেম ভেঙে ভেঙে একে দেয় তাকে দেয়। শালা গা ধোওয়া জলের মতন, কেউ কেয়ারই করে না। যাক, এই কেসটা খুব ভালো পেয়ে গেছি স্যার। তবে আপনার হেল্প চাই। আপনি রেগুদেবীর চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দিন। পার্টি আপনাকে ক্যাশ দেবে। বলুন কত চাই, স্যার!’

রেগু! বিস্ময়ে লোকটার মৃদুত্বের দিকে তাকিয়ে স্ফূর্তিতের দম বন্ধ হয়ে গেল। এই দুটো শব্দ যখন এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন কেন সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায়! পৃথিবীতে তো এই নামের কত মেয়ে আছে, তবু শব্দটা এমন করে বুদ্ধের মধ্যে ছটকটানি ছাড়িয়ে দেয় কেন? কি সহজে একটা পশ্চিমপাতা মৃদু চোখের সামনে ভরাট করে দেয়!

লোকটার দিকে তাকাল স্ফূর্তিত। এর মৃদুত্ব নামটা এত বিস্তীর্ণ শোনাচ্ছে! ‘আপনি রেগুকে চেনেন?’

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো লোকটা, ‘না, না, হি হি। আমাকে ওঁর স্বামী এনগেজ করেছেন। তবে একদিন দেখেছিলাম একটু, সত্যিই আমাদের স্ত্রীরা দেখতে কী বিচ্ছিন্ন!’

রেগুর স্বামী আপনাকে পাঠিয়েছে?’ বিস্ময়ে ভালো করে কথা বোঝতে পারছিলো না স্ফূর্তিত। রেগু, রেগুর স্বামী। রেগুর স্বামীকে কোনদিন দেখেননি ও।

‘হ্যাঁ স্যার। উনি ভদ্রভাবে কাজটা সারতে চান। আমাকে বলেছেন চিঠিগুলো নিয়ে যেতে, যা দাম লাগবে দিয়ে দেবেন। খুব কামেলে চলেছে বোধ হয়, বুদ্ধলেন না!’

উঠে দাঁড়ালো স্ফূর্তিত। লোকটা হাঁ করে ওকে দেখেছিলো। কোন কথা না বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো স্ফূর্তিত। চট করে তাড়াতাড়ি বয়ের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ওর পেছন পেছন ছুটে এলো লোকটা—‘স্যার আপনার কাছে একটা চিঠি

আছে রেণুদেবীর। সেই যে যেটার উনি—কনফেশন—মানে আপনার আগে যাদের যাদের সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না স্যার—ঐ চিঠিটাই দরকার। পার্টি এক হাজার দেবে।’

‘এসব-এসব কি করে জানা গেল!’ ঘোরের মধ্যে বললো সুমিত।

‘সে দারুণ ব্যাপার! রেণুদেবী নাকি বাথরুমে বসে চিঠি লিখেছিলেন ভাইকে। সেটা পোস্ট করে বাড়ির ঝি। মদুখাজী সাহেব মানে রেণুদেবীর স্বামী সেটা ধরে ফেলেন! আর তাতেই আপনার নাম ধাম—বদ্বলেন স্যার। তা আমি বলি কি মদুখাজী সাহেবের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি, চিঠিটা আপনি দিয়েই দিন।’

‘আমি রেণু বলে কাউকে চিনি না।’ সোজা হাঁটতে লাগলো সুমিত। বাঁ হাতের তাবিজটা আঁকড়ে ধরে পেছন পেছন এলো লোকটা—‘কি যে ইয়ার্কি করেন স্যার, আপনি মাইরি—’

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার জামার কলার মদুঠো করে ধরে প্রায় ওপরে টেনে তুললো সুমিত, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো বদমাস, ভাগ।’ ছেড়ে দিতেই ধপাস করে বসে পড়লো লোকটা মাটিতে—‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার। আপনি আজ একটু উত্তেজিত, আমি আবার আসবো, আপনি ভাবুন ভালো করে। মদুসকল হল আর একটা পার্টি আজ আপনার ঘরে এসেছিলো—কম্পিটিটার কিনা কে জানে।’

পথ চলতে চলতে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে আশে-পাশে। সুমিত আর তাকালো না, সোজা মেসের রাস্তা ধরলো। এখন রাত হয়েছে বোঝা যায়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওর আবার মনে পড়লো চোরের কথা। লোকটা বলছে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তাহলে কি ওরা এই লোকটার মতন একই ধান্দায় এসেছিলো? এরা কারা তাহলে! বাইরে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, এতক্ষণ রেস্টুরেণ্টে বোঝা যাচ্ছিলো না। জোরে জোরে পা ফেলে মেসে ফিরে এলো সুমিত।

আলো জ্বলছিলো ঘরে। সুমিত দরজা ভেজিয়ে একটু চুপ করে দাঁড়াল। এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এসেছিলো সে কি জন্য এসেছিলো। দ্রুত-পায়ে ও খাটের কাছে চলে এলো। খাটের সামনে দেওয়ালে ঘোঁড়াকে মদুখাজী ও শোয়, সেখানে একটা ছবি টাঙানো। বড় ফ্রেমের মধ্যে বসে সুমিত হাসছে। হাফ বাস্ট ছবি, কমলা রঙের পদ্মভার পরা। তখন ওর মাথায় চুল বেশ ফাঁপানো ছিল, চিবুকের কাছটা মিষ্টি মিষ্টি দেখাতো। হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে দেওয়াল থেকে খুলে আনলো ও। বুকের মধ্যে যে ভয়টা রবারের স্ক্রলের মত ড্রপ খাচ্ছিলো, কাঁচের ফ্রেমের গায়ে লাগা খুলো দেখে তা গাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। না, এখানে কারো হাত পড়েনি। ছবিটার পেছন দিকে পেটের বেড়ার মধ্যে অনেক কাল পড়ে থাকা মোটা খামটাকে বের করলো সুমিত। অনেক, অনেকদিন হাত দেয়নি ও। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলো এখন, নিছক খেলার বসে একদিন ও নিজের ছবির পেছনে

ছোট পেরেকের গায়ে খামটাকে বিন্ধ করে রেখেছিলো। কেন কে জানে, হয়তো কোন কারণ ছিলো না, কিংবা মনে মনে অন্য কিছু কাজ করছিলো। এখন মনে হলো, সে যাই হোক যে এসেছিলো তার সন্মিতের ছবির দিকে তাকানোর ভাগ্যিস প্রয়োজন ছিলো না।

খামটা খুললো সন্মিত, আর খুলতেই এক রাশ শিউলি ফুলের মতন একটা মৃদু হেসে উঠলো, যার নিচে ছোট ছোট গোটা অক্ষরে লেখা, ‘এই আমি রেণু।’

আমি রেণু। এই যথেষ্ট, আর কিছু জানবার দরকার নেই। আমি রেণু, এতেই আমি সম্পূর্ণ। এই আমি তোমার সামনে হাসছি, আর কি হবে জেনে। গ্লিস পেপারে ছাপা ছবিটায় রেণু ঘাড় কাৎ করে হাসছে। মাথার দৃ’পাশে খোলা চুলের কালোয় ফরসা মৃদুখানা যেন আরো টাটকা লাগছে। দুটো বড় বড় চোখে (রেণু, তুমি কি কাজল পরতে?) খুশির সুন্দর কারুকাজ, কপালটা একটু চওড়া তাই খুব বড় করে টিপ পরা বলে চোখে আরাম লাগে। ছবিতে রেণু হাসছে, হাসলে অল্প গজদাঁত দেখা যায়। বৈশিষ্ট্য তাকিয়ে থাকলে বুদ্ধের ভিতর পাক খেয়ে যাওয়া বাতাস কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস হলে বেরিয়ে যায়। ছবিটা দেখতে দেখতে সন্মিত স্পষ্ট শব্দে পেলো—‘এই আমি রেণু।’

ছবিটার সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে যে দশপাতার চিঠি তার জন্যই কি ওরা এসেছিলো? রেণুর স্বামীর এটা দরকার। রেণুর বিরুদ্ধে বোধ হয় এটাকে কাজে লাগাবেন। হেসে ফেললো সন্মিত, কি করেছে রেণু, এমন বোকামি কেউ করে। আসলে রেণু তুমি একটা আশ্রয় মেয়ে, ছবিটার দিকে তাকালো সন্মিত, মেয়েদের মতন চট করে বোকামি করতে কোন ছেলে পারে না। চিঠিটা খুললো ও। এর প্রত্যেকটা শব্দ ওর মৃদু! এত সুন্দর করে লেখা চিঠি ও কখনো পড়েনি। না, কোন সম্বোধন নেই, বছর দেড়েক আগের একটা বসন্তকালের তারিখ চিঠির মাথায় শুরুরদেই কি একটা লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে কালি দেওয়া বোঝা যায় না কিছুতেই। তারপর, ‘আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে।’ আর চিঠির শেষে ‘ভালো। থেকো কিন্তু। আমি রেণু।’ আর এর মধ্যে যে লাইনের পর লাইন, যেগুলো এক সন্ধ্যায় সন্মিতের বুদ্ধে ছোট ছোট চিত্র সাজিয়ে দিয়েছিলো, যেগুলো সত্যি নয় প্রমাণ করার জন্য ও শিশুর মত কয়েকজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এখন বুদ্ধের মধ্যে সেগুলো চিত্র দিনের দৃপ্তের হাওয়ার মত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

হলদে শাড়ি পরতো রেণু। মাথার চুলের প্রান্তে ছোট একটা বাঁধুনি, চুলগুলো ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে থাকতো চওড়া পিঠে। মেয়েদের শ্রুতি ভরাট হলে এত সুন্দর দেখায়, রেণুকে না দেখলে বোঝা যাবে না। খুবই নয় রেণু কিন্তু গলার গড়নে ওকে লম্বা দেখাতো বেশ। বছর আড়াই আগে ওরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাসের ছাত্র।

খুব পরিষ্কার সেই বিকেলটা। সবে সুদীপ্তবাবুর ক্লাস শেষ হয়েছে। এই

একটা ক্লাস করার জন্যে ওরা কফিহাউস থেকে ফিরে আসতো। শেষ হতেই সন্মিত বেরিয়েছে এমন সময় রেণু ওর সামনে এলো। বাঁ হাতে কপালের চুল সরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললো—‘আচ্ছা, আপনি এত কি দ্যাখেন বলুন তো?’

কথাটা শুনে কেমন নাভাস হয়ে গিয়েছিলো সন্মিত। এভাবে ও এসে কোনদিন বলবে—এতটা ভাবেনি কোনদিন। যখন ক্লাসে এসেছে ও পেছন দিকে বসেছে। আর সেইখান থেকে সামনে বসা ছেলেমেয়ের মাথার পাশ দিয়ে একটা সরলরেখা হয়ে যেত একসময়, যার অপরপ্রান্তে থাকতো রেণুর মুখ। অনেকদিন ওর নাম জানেনি সে। মফস্বলের ছেলে ও, নিজে এগিয়ে গিয়ে কোলকাতার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার মত মানসিক গঠন হয়নি তখনো। মেয়েদের যে একটা নিজস্ব ইন্দ্রিয় আছে যাতে তারা বদ্ব্যপেক্ষে পারে কেউ তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা, রেণু বদ্ব্যপেক্ষে ফেলেছিলো প্রথম দিনই। নইলে দুবার তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিলো কেন? তারপর একসময় এটা একটা মজার খেলা হয়ে গেলো সন্মিতের কাছে। আর এই খেলার নেশায় বন্ধু হয়েছিল এমনই যে পরপর কয়েকদিন ও না আসতে মন মেজাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো সন্মিতের। ওর নাম জেনেছিলো সে, অশোক ওর বন্ধু, এসে বলেছিলো, ‘দারুণ ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে—যা না বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নে। আসছে না কেন দ্যাখ।’

‘যাঃ, আমার সঙ্গে আলাপই নেই।’ হেসেছিলো সন্মিত।

‘তুই একটা গুড ফর নাথিং। একবছর ধরে একটা মেয়েকে শুধু দেখেই গেলি, গিয়ে আলাপ করতে পারালি না পর্যন্ত।’ অশোক ঠাট্টা করেছিলো।

সেই মেয়ে কদিন বাদেই ফিরে এসে ক্লাস শেষে ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ‘আচ্ছা, আপনি এত কি দ্যাখেন বলুন তো।’

এক মূহুর্তেই লক্ষ্যবাহিনী মনে মনে বলে ফেললো, সন্মিত, তোমাকে। মূহুর্তে কিছু বললো না, মাথা নিচু করে হাসলো।

কি কিছু বলছেন না কেন? রেণুর গলা যেন ওকে ছোট ছোট টোকা দিয়ে গেলো। রেণুর মুখের দিকে তাকালো ও—‘বলতে ঠিক সাহস হয় না।’

‘কেন?’ ঘাড়ের পিছনে আলতো ভাঁজ ফেলে চিবুক উঁচু করে তাকালো রেণু। চকিতে সন্মিতের মনে পড়ে গেলো মনের কথা। চৈত্র মাসের সকালে মাটির এক ফুটোওয়ালো হাঁড়িতে জল ঢেলে মা এমন করে তাকাতেন। আর সেই ফুটো চুঁইয়ে একটা একটা করে জলের ফোঁটা পড়তো নিচের পাতাঝরিকের আসা তুলসীগাছে।

‘কি জানি, হয়তো আপনি খুব সুন্দর বলে, সুন্দর এরুপ ভীষণ।’ অনেকক্ষণ ভবে থেকে হুস করে মাথা তুলে নিশ্বাস নিলে বোধহয় এমন হয়, কথাটা বলতে পেরে সন্মিত সেইরকম তৃপ্ত পেলো।

‘যাঃ, আপনারা এমন বাজে কথা বলেন। আসলে আপনি খুব ভীষণ, সাহস নেই। তাই না?’ হাসলো রেণু।

‘তাই হবে। ছেলেবেলা মফস্বলে কেটেছে তো, ঠিক বদ্ব্যপেক্ষে পারি না সাহসের

এইসব ব্যাপার ।’

‘আমার নাম রেণু, রেণু রায় । আপনার নাম কিন্তু আমি জানি ।’ হাসলো রেণু ।

‘আপনার নামও আমি জানতাম ।’

‘আমি কিন্তু খুব খারাপ মেয়ে, খু-উ-ব ।’

‘যাঃ, এরকম মদুখের মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে না ।’

রেণু কাছে থাকলে কোলকাতাকে অন্য রকম লাগে । য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পদ্রোণ বই-এর সার সার দোকানের সামনে দিয়ে রেণুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া মানুষজনকে যীশু খ্রীষ্টের মত মহৎ মনে হয় । কফি হাউসের টেবিলে পাশাপাশি বসে চারপাশের একটানা চেঁচামেচিকে সমুদ্র গর্জনের মত নির্জন মনে হয় ।

ওয়াই. এম. সি’ এর রেস্টোরার নির্জন কোঁবনে বসে রেণু ওর কাঁধে মদুখ রেখে একদিন বলে ফেললো—‘তুমি খুব ভালো, জানো, খুব ভালো ।’

এক লক্ষ পশ্চিমফোটা সরোবরের মত বদকের ভিতরটা টলটল করে উঠলো সন্মিতের । ঠিক এমন করে কোন মেয়ে তাকে বলেনি কোনদিন ।

‘আমি খুব খারাপ মেয়ে, জানো ?’ রেনু আবার বললো ।

‘হঁ-’ রেণুর শরীরের গন্ধ (আহা, সুবাস বলে না কেন ?) চোরের মতন বদক ভরে নিতে নিতে সন্মিত বললো ।

‘সত্যি বলছি । দ্যাখো না, এই আমি যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম । তুমি তো এতদিন শুধু দেখেই গেছ, এগিয়ে আসোনি তো । আমি কেমন নিল’জ্জর মত কথা বললাম ;’ রেণু কথাটা বলে মাথা সরিয়ে সোজা হয়ে বসলো । তারপর নিজের হাত দুটো চোখের সামনে ধরে হাতের রেখাগুলো দেখতে দেখতে বললো, ‘কি করব বল, এই ক’দিন আসিনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই তোমার মদুখটা মনে পড়তো । কি অস্বাভি, শুতে বসতে নিস্তার নেই ! মনে মনে বদ্বলাম কোথায় গিয়ে পেঁছেছি । তারপর ক্লাসে এসে তোমাকে আবার দেখলাম । বদ্বলাম আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি খুশি হয়েছ, আর পারলাম না, জানো তাই আমি নিল’জ্জ হয়ে গেলাম ।’ একটা হাত নামিয়ে সন্মিতের হাতের ~~খুঁটি~~ রাখলো রেণু—‘তোমার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম ।’

মাথার ওপর ছোট্ট পাখার হাওয়া রেণুর চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল । সন্মিত সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, এই রকম করে তুমি নিল’জ্জ হয়ে আমার কাছে থাকো, রেণু আমি বেঁচে যাই ।

রেণুর সঙ্গে দপদুরে অথবা আলো মরে আসা বিকেলে এই কোলকাতার রাস্তায় হেঁটে গেছে ও । য়ুনিভার্সিটি থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারীর মোড় । ওখান থেকে বাসে চাপতো রেণু । বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি, সেই অবধি কখনো যায়নি সন্মিত ।

‘ভীষণ গোঁড়া জানো, বিশেষ করে মা, তুমি যদি দ্যাখো ভাবতেই পারবে না।’ টিপিটিপে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে রেণু বলিছিলো। ওর খোলা চুলে গদুঁড়ি গদুঁড়ি জলকণা মদুস্তোর মত চকচক করছিলো, তুমি বিশ্বাস করবে না হয়তো, কিন্তু জানো, মা না এখনও ঘুম থেকে উঠে বাবার চরণামৃত খায়।’ রেণুর মায়ের জন্য কণ্ট হিচ্ছিল সন্মিতের। কী বিশ্বাসে মানদুষ্কেরা এখনও বেঁচে থাকে।

‘আর তোমার বাবা?’ সন্মিত জিজ্ঞাসা করছিলো।

‘বাবার সঙ্গে আমার দেখাই হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই, রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে দেখি ফেরেননি। যা কিছু ব্যাপার তা ভায়া মা। শব্দ রবিবার আমরা একসঙ্গে খাই। তখন প্রত্যেক সপ্তাহে খাওয়ার শেষে বাবা বলেন—‘বাইরের জগৎ নিয়ে বেশি মেতে থেকো রেণু।’ বোঝ। ঘাড় নাচালো ও।

‘আর তোমার দাদা?’

‘দাদা আমার মাইডিয়ার। ওর জন্যেই ও বাড়িতে থাকা যায়। ওকে আমি সব বলি, সব। এই ‘তোমার কথাও বলছি।’ রেণু সন্মিতের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

‘সর্বনাশ, কি বলেছ?’ চোখ কপালে তুললো সন্মিত।

‘এই সব ব্যাপার। দাদা কি বললো জানো, যাঃ একদম বাচ্চা ছেলে, এখনো কনসেপশন তৈরি হয়নি। তুই একটা পাগল।’

অশোক বলিছিলো, তাদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে, কে বয়সে বড় বোঝা মদুর্শকিল। ও, রেণু, অশোক আর খুব কম, ঝুমা নামের একটা মেয়ে একসঙ্গে আড্ডা দিত তখন। একবার অশোকের পরিকল্পনা মত কলেজ পালিয়ে ডায়মন্ডহারবার চলে গিয়েছিলো ওরা।

ঠিক ছিলো ধর্মতলায় এসে বাস ধরবে সবাই। মনুমেণ্টের সামনে ঠিক দশটা না বাজতেই এসে হাজির হয়েছিলো সন্মিত। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। ও জায়গাটায় ছায়ার কোন ব্যবস্থা নেই। রোদ্দুরে মুখ চোখ লালচে হয়ে উঠেছিলো ওর। চারপাশে ফেরিওয়ালারা ঘুরছে। একটা বোঁ কাঁচ বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর সামনে হাত পাতলো। সন্মিত দেখলো বোঁটির গায়ের রঙ কোনকালে কালো ছিলো হয়তো, এখন ময়লা জমে জমে কেমন শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। গায়ে জুতা পরিনি অথবা নেই, বাচ্চাটা ওর শুকনো বুক নিয়ে খেলা করছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়ে সন্মিত জিজ্ঞাসা করে ফেলল, ‘তোমার দেশ কোথায়?’ ও ভেবেছিলো বোঁটা পাকিস্তানের গল্প করবে নিখাত। কিন্তু সে সেখানে কিছুই করলো না, শিরাওঠা রোগা হাত বাড়িয়ে (ষেটায় একটা শাখা বিচ্ছিন্ন ক্রিমের সাদা) বলিছিলো, ‘দাঁক্ষণে।’ জায়গার নাম জানতে চেয়েছিলো সন্মিত। বোঁটা পয়সা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলিছিলো, ‘ডায়মন্ডহারবার।’

চমকে উঠেছিলো ও। বোঁটা চলে গেল মনে মনে বলিছিলো, আমি তোমার দেশে যাচ্ছি, তুমি যাবে? সে তখন দূরে একটা কাবুলিওয়ালার পেছন পেছন হাত

বাড়িয়ে ঘুরছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওর। এখন ওরা মজা করে বেড়াতে যাচ্ছে যেখানে সেখান থেকে একটি শেষ যুবতী মেয়ে কলকাতায় চলে এসেছে না খেতে পেয়ে। নাকি অন্যকিছু কে জানে! এই সময় ও ঝুমাকে দেখতে পেলো। একটা মেয়েদের শান্তিনিকেতন কাজ করা বড় হাতব্যাগ নিয়ে ঝুমা এলো—‘কি ব্যাপার মদুখ গোমড়া করে বসে আছেন একা, পার্টনার আসেনি?’

ঝুমার কথাটা তাই এরকম। ওর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেনি সন্মিত, বরং এড়িয়েই গেছে অনেকদিন। সাজপোশাকে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা আছে ঝুমার মধ্যে। এক একটা মেয়ে থাকে যাদের শরীরের বাঁধুনি ভালো এবং সেটাকে কাজে লাগানোর কায়দাকানুন তাদের ভালো করে জানা—ঝুমা সেই ধরনের মেয়ে। এখনো গালের মাঝখানে কয়েকটা ব্রণর দাগ কটা চোখের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গুঁদিয়ে আছে। সন্মিত দাঁড়িয়ে থেকে বোঁটাকে দেখাছিলো আর ঝুমা বললো, বসে আছে ও। এই রকমই কথাবার্তা। খুব সেজেছে ঝুমা।

সন্মিত হাসলো ‘ওরা এখনি এসে পড়বে। এত কি এনেছেন?’

‘সব। জামাকাপড়, তোয়ালে। যদি দরকার পড়ে, বলা যায় না। ধুয়ে, ওরা আসছে না কেন!’ ঘুরে বাসগুলোকে দেখলো ঝুমা—‘তার চেয়ে বলুন আমরা চলে যাই।’

‘সেকি! কোথায়? কপট বিস্ময়ে বললো সন্মিত।

আর এই সময়েই ওরা এসে পড়লো। সঙ্গে ঝুমা বললো—‘বাস হয়ে গেল, আপনি আর চান্স পেলেন না।’

একটা খালি বাস পেয়ে গেলো ওরা। অফিসের সময় বলে ফেরার বাস খালি যাচ্ছে। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা। মেয়েরা জানলার ধারে বসেছে। বাস চলতে আরম্ভ করলে রেণু বললো—‘যদি কেউ দেখে ফ্যালে।’

ফিসফিস করে সন্মিত বললো—‘তাহলে ঘোমটা দিয়ে নাও।’ চকচক করে উঠলো রেণুর চোখ। খালি বাসের দিকে চট করে নজর দুর্লিয়ে ও আঁচলটা মাথার ওপর দিয়ে ঘোমটার মত করে নিলো। বাসন্তী রঙের শাড়ির জমিতে ছোট ছোট কালো কাঁড় আঁকা। আঁচলের একটা কোণা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, ‘কেমন লাগছে গো?’

এক একটি মেয়ে আছে, যাদের গলা ঈষৎ লম্বা এবং গায়ের রঙে ব্রিকেলের রোদ মাখামাখি, আঁচলের অর্ধেক বৃত্তে তাদের মদুখ অপরিপক্ব দেখায়। লোভীর মত কিছুক্ষণ দেখল সন্মিত, রেণুর চোখে চোখ রাখলো। একটা হেসে রেণু কোন কথা না বলে আবার জিজ্ঞাসা করলো মদুখ দুর্লিয়ে। একটা হাত ওর পেছনের সিটের ওপর রেখে সন্মিত বললো—‘দারুণ। ঠিক ঝুমা মেয়ের শাড়ি পরার মত বিউটিফুল।’ এক ঝটকায় আঁচল খুলে ফেলে বাইরের দিকে তাকালো রেণু, ‘অসভ্য।’

বেহালা ঠাকুরপুকুর একে একে ছাড়িয়ে ওরা দু’পাশের ধানক্ষেতের ওপর চোখ

রাখলো। বাসে এখন মোটামুটি ভীড়। বেশীরভাগ চাষীবাসী মানুষ। ডায়মন্ড-হারবারে এ ধরনের ছেলেমেয়ে দেখতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মদুখচোখ কোলকাতার মানুষের মত উদাস। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা চুপচাপ বসে। ঠিক বসে বললে ভুল হবে, ঝুমার শরীরের অনেকটা অশোকের ওপর চাপানো। সন্মিত দেখলো, প্রায় অশোকের কাঁধে হেলান দেওয়া ঝুমার মাথার চুলে কিসব পুঁতুর মালার টুকরো জড়ানো। এখন রেণুও চুপ করে বসে আছে। জানলা দিয়ে হু হু বাতাসে ওর কপালের ওপর চুলগুলো বানমাছের মত খেলা করছে। রোদের তাতে রেণুর চিবুক কী আদর দেথাচ্ছে। বৃকের মধ্যে অনেক তৃপ্তি নিয়ে সন্মিত চোখ বন্ধ করলো খানিক।

সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে কেমন করে যেন ওদের কেটে গেলো। সবে গড়ে ওঠা একটা হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ নদীর গায়ে ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, দুপুরে ওরা সেখানে গিয়ে উঠলো। রিক্সায় চেপে আসতে হয়েছে ওদের। দুটো রিক্সা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে কে আগে যেতে পারে। রেণুর উৎসাহ ছিলো বেশি। রিক্সাওয়ালাকে ‘ভাই, আরো জোরে, সাম্বাস দাদা, ওদের হারিয়ে দাও’ এইসব বলে উৎসাহ দিয়েছে। হোটেলটা নিজর্ন, এখনো মানুষজনের বসতি কাছাকাছি হয়নি। এপাশে নদী ওপাশে ধানজমি আর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে বেশি বয়সের মহিলার সিঁথির মত নিরন্তর রাস্তা।

হোটেলে এসেই ঝুমা বললো—‘আর পারছি না বাবা, আবার হাঁটলে আমার পা আমার থাকবে না।’

অশোক দাঁড়িয়েছিলো পাশে। বেতের সাজানো চেয়ারে ঝুমা ধূপ করে বসে গা এলিয়ে দিয়েছিলো। ওদের মাথার ওপর একটা লাল নীল ডোরাকাটা কাপড়ে রোদঢাকা। জায়গাটা নদীর মুখোমুখি। হাওয়া দিচ্ছে খুব। রেণু আর সন্মিত সামনের রেলিংএ ভর করে দূরের জাহাজ দেখাছিলো। ঘাড় ঘোরালো সন্মিত, ঝুমা হাত নেড়ে অশোককে মাথা নামাতে বললো। হোটেলের ভেতর থেকে একটা বেয়ারা ট্রেতে করে চা নিয়ে আসছে। ওরা ওঠার সময় বলে এসেছিলো লবিতে চা দিতে। অশোখ মদুখ নামালো। ঝুমা কি বলছে বুঝতে পারলো না সন্মিত তবে অশোক কথাটা শুনলে হেসে উঠে ঝুমার মাথায় আলতো করে চড় মারলো, তারপর চেঁচিয়ে বললো, ‘গুড, গুড।’

চা খাওয়া হয়ে গেলে রেণু বললো, ‘চল ঐ ভাঙ্গা লাইটহাউস দেখে আসি।’

‘লাইটহাউস ভেঙ্গে গেলে দেখার কি আছে!’ ঝুমা বললো।

রেণু কোন কথা বললো না প্রথমটা, তারপর হৃদয় দিয়ে—‘শুনছি ওর ওপরে উঠলে সমুদ্র দেখা যায়।’

সন্মিত উঠে দাঁড়ালো, ‘চল সবাই, আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি।’

এখান থেকে অনেক দূরে নদী যেখানটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে সেখানে আবছা মত উঁচু গম্বুজ দেখা যায়। ঝুমা সেদিকে চেয়ে চোখ কপালে তুললো—‘আরে

বাস্ । আমার দরকার নেই বাবা ওখানে যাবার, মরে যাবো ভাই একদম । তোরা যা । আমরা এখানেই থেকে যাচ্ছি ।’

সুদমিত একটু বিরক্ত হচ্ছিলো ঝুমার আলসেমির জন্যে । একসঙ্গে বেড়াতে এসে এক-একজন এক এক রকম করবে এটা ঠিক নয় । ও অশোকের দিকে তাকালো । অশোকের ভূমিকাটা ও ঠিক বুদ্ধতে পারছে না । ও অশোককে বললো, ‘কিরে ।’

যেন নদী দেখছে এইভাবে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে সুদমিতাকে ডাকলো, ‘শোন ।’

সুদমিত যেতেই অশোক বললো—‘তোরা ঘুরে আয় ।’

‘এই রোন্দুরে এখানে বসে থাকবি তোরা !’ সুদমিত রাগ করেছিলো ।

‘ধুৱং, রোন্দুরে কেন ! এটা তো হোটেল, ঘর ভাড়া পাওয়া যায় । তোরা যাবার সময় আমাদের ডেকে নিস ।’ হাসলো অশোক ।

‘ঘর ভাড়া করে কি করবি—পরিসা নষ্ট । সুদমিত বললো ।

‘ঝুমার হচ্ছে ঘরে বসেই সমুদ্র দ্যাখে । প্রত্যেকের তো ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে, আমরা তো সেখানে বাধা দিতে পারি না । ঝুমা ভাই এক্সপেরিয়েন্সড মেয়ে, এরকম চান্স ছেড়ে দেওয়া যায়, বল ?’ আবার চোখ কুঁচকে হাসলো অশোক, ‘তুইও একটা ঘর নে না ।’

চমকে উঠলো সুদমিত । এই ব্যাপারটা, ওর খেয়ালই হয়নি । মনে পড়লো, ঝুমা তোয়ালে শাড়ি এনেছে সঙ্গে । একদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে এসে এসব কেউ আনে না । তাহলে কি ওরা আগের থেকেই এই রকম পরিকল্পনা করে নিয়েছিলো । এক ঘরে ওরা একা কিছুক্ষণ থাকবে, ঝুমার জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে আসা আর অশোকের চোখ কুঁচকে হাসি, সমস্ত ব্যাপারটা পরিস্কার করে দিচ্ছে সুদমিতের কাছে । অশোক ওর বন্ধু । ওরা এক সঙ্গে কলেজ থেকে পড়েছে । সেই অশোককে বুদ্ধতে ওর কণ্ঠ হচ্ছিলো । অশোক কবিতা লেখে, য়ুনিভার্সিটি পত্রিকার সম্পাদক, দারুণ রাইট ছেলে । সুদমিতকে সঙ্গে করে ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য যে এটাই হবে—গুলিয়ে যাচ্ছিলো সুদমিতের । ঝুমার দিকে তাকালো ও । বেতের চেয়ারে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে ঝুমা । হঠাৎ ওর মনে হলো ঝুমাকে ঠিক সমবয়সী ছাত্রী বলে মনে হয় না, ওর কোমরের যে ভাঁজ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বা গলার খাঁজ বুদ্ধের আদল, ক্লিয়কমাস বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের মতন পুরুষট । অশোক বললো, ঝুমা অসুস্থ । হতে পারে, চাষীরা মেঘ দেখে বলে দেয় বৃষ্টি হবে কি না । রেণু ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সুদমিত দেখলো । রেণু কি ব্যাপারটা বুদ্ধতে পেরেছে । ওর মুখ চোখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না । ঝুমা অবশ্য রেণুর বন্ধু নয়, মেলামেশাও কম, তবু ওর মনে কি কিছু হচ্ছে না ? খুব সহজ গলায় রেণু বললো—‘চল, আমরা বেড়িয়ে আসি ।’

সুদমিত কিছু বলার আগেই অশোক বললো—‘তোরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে

আয় চারটের বাস ধরব ।’

সুদামিত আর রেণু নিচে নেমে এলো । সুদামিত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকালো, না ওদের দেখা যাচ্ছে না । রেণু বললো, ‘চল, হাঁট ।’

নদীর ধার দিয়ে নরম মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে বাঁ দিকে মাঠ রেখে । ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো । রেণুর মুখ একটু গম্ভীর, সুদামিত ইচ্ছে করেই কথা বলছিলো না । ওপাশে গরু চরছে, একরাশ ছাগল গলার ঘণ্টা বাজিয়ে ওদের দিকে আসছে । রেণু সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো—‘এই মারবে না তো ।’ সুদামিত হেসে বললো—‘খ্যৎ, ছাগলের সে-সব বুদ্ধি আছে নাকি ।’

টং টাং ঘণ্টাগুলো বাজছে । ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো । একটা বাচ্চা ছেলে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে । মাথার ওপর চাঁদিসেঁকা রোদ, পাশের নদীতে জেলে নৌকো ভাসছে । ছাগলরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তাজুড়ে ওদের মধ্যে এসে পড়লো । হঠাৎ রেণু সুদামিতের হাত ধরে ফেললো, একটা বড়সড় ছাগল ওর গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে । জলস্রোতের মত ওরা সুদামিতদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেলো । যাবার সময় বাচ্চাটা রেণুর দিকে হলদে দাঁত বের করে হেসে গেলো । রেণু ভয় পেয়েছে বাচ্চাটা ধরতে পেরেছিলো ।

আর একটু এগোলেই বাঁ দিকে ধানক্ষেত । আলোর মত উঁচু রাস্তায় ওরা হাঁট-ছিলো । দূরে এখনো অস্পষ্ট হয়ে আছে ভাঙ্গা লাইটহাউস । হঠাৎ রেণু বললো—‘ঝুমাকে কেমন লাগলো ।’

সুদামিত ওর দিকে তাকালো একবার, কিন্তু উত্তর দিলো না কিছ্ ।

‘আমার খুব লজ্জা করছে, তুমি মনে করো না । হ্যাঁ ?’ রেণু আবার বললো, ‘ও ওইরকম মেয়ে । অশোক কি ভাবে ওকে নিয়েছে জানি না তবে মন থেকে নিলে বিপদে পড়বে ।’

‘কেন ?’ সুদামিত ওর দিকে ফিরলো ।

‘ঝুমোর এ্যাম্বিশন অনেক । মেয়েরা সবাই জানে প্রফেসর ভট্টাচার্যের সাবজেক্ট ও লেটেরমার্কস পাবে ।’

‘এখন থেকেই কি করে জানলে ।’ সুদামিত অবাক হলো ।

‘প্রফেসর ভট্টাচার্য প্রত্যেকবার দু-একটা মেয়েকে লেটার মার্ক দেন, তারপর ওরা ওঁর আন্ডারে রিসার্চ করে । অনেকে ঝুমাকে ওঁর সঙ্গে একই চেয়ারে ছুটির পর বসতে দেখতে পেয়েছে ।’ রেণু হাসলো ।

সুদামিত বললো, ‘যাঃ ।’ ওর মনে পড়লো প্রফেসর ভট্টাচার্য ষাটের কাছাকাছি, দেখতে প্রায় বৃদ্ধ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে । ওর মাঝে অশোকই অনেক কিছ্ বলেছে, কিন্তু ঝুমার সঙ্গে—। রেণু ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো, ‘তোমরা ছেলেরা, ইচ্ছে করলে মনে মনে চিবুক তরুণ থাকতে পারো, তাই না ? বড় অতৃপ্ত তোমাদের ।’

সুদামিতের ইচ্ছে হলো বলে, ঝুমার চেয়েও । কিন্তু এখন আর এ বিষয় নিয়ে কথা

বলতে ভালো লাগছে না। দৃখেল ধানগাছগুলোর শরীর নিংড়ানো বাতাস জলের সঙ্গে খেলা করে যায়, অনেক দূরে সিসে রঙা আকাশের গায়ে একটা চিল কি আলসেমিতে গা এলিয়ে দেয়, আর রেণুর নাকের গায়ে চিকচিকে ঘামের বিন্দু নাকছাবির মত সুন্দর দেখায়—এইসব সম্মাটের মত আগলে রাখতে চাইছিলো ও।

সুদমিত বললো, ‘রেণু, আমি খুব সাধারণ ছেলে।’

‘উহু’ ঘাড় নাড়লো রেণু।

‘মানে?’

‘সাধারণ হলে তোমাকে আমি ভালোই বাসতাম না। কাউকে ভালোবাসলে মানুষ আর সাধারণ থাকে না। আচ্ছা, আমাকে না দেখতে পেলে তোমার কেমন লাগে?’

‘কষ্ট হয়।’

‘রাগিবোলায় যখন একা বিছানায় শুয়ে থাকো তখন আমাকে ভাবো?’

‘তুমি?’

কোন উত্তর দিল না রেণু। হাঁটতে হাঁটতে ঝুঁকে পড়া একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়লো। তারপর সেটার সবুজ তাজা ডাঁটিটা ঠোঁটের কোণে চেপে বললো, ‘আচ্ছা, আমি যদি এখন হঠাৎ মরে যাই তুমি চিরকাল আমার কথা ভাববে? অন্তত এই সব মন কেমন করা দিনগুলোর কথা, ভাববে?’

সুদমিতের বন্ধুকের মধ্যে কেমন দূর দূর করছিলো ওর ভয় হচ্ছিলো রেণুর গলার স্বর শুনে, এই রেণুকে ও চেনে না—‘একথা বলছো কেন?’

‘মনে হলো তাই, আমি যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না।’ কথাটা বলেই সুদমিতের মুখের দিকে তাকালো রেণু। তাড়াতাড়িতে অনভ্যস্ত হাতে দাঁড়ি কামাতে গিয়ে সুদমিতের চিবুকের ওপর একটা কাটা দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে, সেদিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে হেসে ফেললো ‘ও—ছেড়ে দাও এসব কথা, আমার না বেশি আশা করতে খুব ভয় হয় তাই বলে ফেললাম।’

এখান থেকে ভাঙা লাইটহাউসটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রেণু বললো—‘চল দৌড়ই, কতদিন দৌড়ই না। স্কুলে পড়ার সময় একবার মধুপুত্র গিয়েছিলাম কিছূদিনের জন্যে, তখন খুব দৌড়োতাম। দৌড়াবে?’ বাচ্চা মেয়ের মত আঁচল কোমরে গুঁজলো ও, জুতো খুলে হাতে নিলো। সুদমিত হাসলো—‘তুমি এগোও, আমি তোমাকে ধরিছি।’

‘তুমি পারবে না।’ বলে রেণু দৌড়োতে লাগলো। আলপথের ওপর দিয়ে ওর হালকা লম্বা শরীর ছুটে গেলো সামনে, সুদমিত দেখলো। ক্রমশ রেণু দূরে চলে যাচ্ছে, ওর খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, ছুটেতে ছুটেতে ও ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো ‘এসো-ও।’ সুদমিতের দৌড়োতে ইচ্ছে করছিলো না, রেণুর ছুটে যাওয়া শরীরটা দেখে ওর কেমন ভয় করছিলো, মনে হচ্ছিলো ওদের মাঝখানে একটা ব্যবধান হঠাৎ তৈরি হয়ে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দূরত্বটা কমানোর জন্যে ও ছুটেতে শুরুর

করলো। রেণু বন্ধুতে পারলো সন্মিত আসছে, ও আরো জোরে ছুটতে শুরুর
করলো। নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকোর জেলেরা এই দৃশ্য দেখতে পেলো। ধান-
ক্ষেত থেকে ছটফটিয়ে ওড়া গঙ্গাফাড়াগুলো আচমকা ভয় পেয়ে গেলো। রেণুর
ব্যবধান কমে আসছে। রেণু, রেণু, রেণু। বন্ধুর মধ্যে একরাশ তৃপ্তি নিয়ে
এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সন্মিত দেখলো হোঁচট খেয়ে রেণু উল্টে পড়ে গেলো
আলপথ থেকে পাশের ধানক্ষেতে। পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠলো ‘ও মাগো!’

বন্ধুর মধ্যে ধক করে উঠলো সন্মিতের। ও এক নিশ্বাসে রেণুর পাশে গিয়ে
দাঁড়ালো। রেণু উঠে বসেছে, দহাতে ডান পা আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় দাঁত
চেপে ওপরের দিকে তাকাতেই সন্মিত ঝুঁকে পড়লো—‘কি হয়েছে তোমার, এই
রেণু!’ সন্মিত হাঁপাচ্ছিলো চোখাচোখি হতেই রেণু একটু একটু করে হাসলো।
সন্মিত দেখলো রেণুর হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চট
করে বসে পড়লো ও, জোর করে রেণুর হাত সরিয়ে দিলো, ‘দেখি দেখি কি হয়েছে।’
রেণু হাত সরিয়ে নিয়ে চোখের সামনে ধরলো, আঙুলের পাশগুলো লালচে হয়ে
গেছে—‘দেখছে আমার শরীরে কত রক্ত!’ সন্মিত দেখলো ডান পায়ের বড়ো
আঙুলের পাশটা কেটে গেছে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল
বের করে চেপে ধরলো ও কাটা মধুখটার ওপর। ভিতরের সাদা মাংস অল্প অল্প
দেখা যাচ্ছে। রেণু আর চিৎকার করছে না। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সন্মিতের
নাভিস হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্তটা একটু বন্ধ হতে না হতে রুমালের
অধেঁকটা ভিজ়ে লাল হয়ে গেলো। রেণু বললো ‘তোমার রুমালটা নষ্ট করে
দিলাম।’ সন্মিত ভালো করে বড়ো আঙুলটা ব্যান্ডেজ করে দিলো, রক্তটা বন্ধ
হলেও একটু একটু ভিজ়ে থাকলো রুমালটা। হাত বাড়িয়ে রেণুর হাত ধরে ওকে
টেনে তুললো সন্মিত—‘এবার উঠে দাঁড়াও ম্যাডাম।’

পায়ের গোড়ালিতে ভর করে দাঁড়ালো রেণু। ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে রেলপথের
ওপর উঠে এলো। ওর শাড়িতে পাছার কাছে শূকনো মাটি দাগ এঁকে দিয়েছে,
কনুই এর কাছে মাটি লেগে আছে। রেণুর চিট দূটো এড়িয়ে সামনে রেখে সন্মিত
বললো—‘হাঁটতে পারবে তো, দ্যাখো। ‘না পারলে?’ রেণু হাসলো, বোঝা
যাচ্ছিলো ওর কষ্ট হচ্ছে একটু—‘আমায় কোলে নিয়ে যেতে পারবে?’

‘উপায় না থাকলে করতে হবে।’ সন্মিত দেখলো সামনেই নদীর বন্ধে একটা
ছোট জেলে নৌকো ভাসছে আর তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা দাঁড়ওয়ালা বড়ো
ফোকলা দাঁতে হাসছে। লোকটা নিশ্চয়ই রেণুকে পড়ে যেতে দেখছে। সন্মিতের
রাগ হাচ্ছিলো লোকটার ওপরে, কিন্তু লোকটা মধুখর কাছে দূর হাত জড়ো করে
চোঁচিয়ে উঠলো, ‘খুব বেশী লাগেনি তো মা!’

নৌকোটা পাড় থেকে অনেকটা দূরে। বন্ধুত্ব শব্দটা অনেক ক্ষীণ শোনালো।
রেণু দেখতে পেরেছিলো লোকটাকে, ঘাড় নেড়ে বললো, না। তারপর বললো,
‘কেমন স্নেহপ্রবণ লোক, না?’

সুদমিত কিছু বললো না। ও বৃদ্ধে পারছিলো না ভাস্ক্রা লাইটহাউসের দিকে আর যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। 'চাঁট হাটে নিজে গোড়ালির ওপর ভর করে রেণু কতটা হাঁটতে পারবে? তা ছাড়া এর মধ্যে প্রায় ষাটখানেক কেটে গেছে। অশোক চারটের বাস ধরবে বলেছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো ওরা এখন কি করছে? অশোক আর বৃদ্ধা! ভাবতে গিয়েই ওর কান লাল হয়ে উঠলো। ও রেণুর দিকে তাকালো। পড়ে যাবার পর রেণু অগোছালো হয়ে আছে, রেণুর বৃদ্ধ থেকে সরে যাওয়া কাপড় এখন হাতের ওপর বাতাসে দোল খাচ্ছে। চট করে চোখ সরিয়ে নিলো সুদমিত। রেণু যে কোন শব্দবতী মেয়ের মতন পূর্ণতার সীমা পেরিয়ে গেছে। স্নানভাসিটি'র শেষ গন্ডী না পার হওয়া অবধি ওরা মেয়ে থাকে, নেহাত মহিলা হয়ে যান না, এই যা।

রেণু বললো, 'তোমার খুব লজ্জা, না?'

'কেন?'

'চোখ সরিয়ে নিলে তো, তাই।' কাপড় ঠিক করে রেণু বললো, 'কই বললে না তো আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে কি না।'

কি বলতে গিয়ে সুদমিত হেসে ফেললো, 'যা একখানা চেহারা করেছে, রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন, তোমার ও বডি যারে দাও তারে বিহ্বারে দাও শকতি—আমি হেলপলেস!'

হেসে উঠলো রেণু, 'তাহলে আমি তোমার কাঁধে ভর করলাম, একটু হেলপ করো না হয়।' রেণু একটা হাত সুদমিতের কাঁধের ওপর পাখির ডানার মতো ছাড়িয়ে দিলো। সুদমিত রেণুর কোমরের কাছে আলতো করে হাত রেখে ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো লাইটহাউসের দিকে। এখন রেণুর শরীর ওর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ওর হাতের তালুর তলায় রেণুর কোমরের একরাশ মাখন কি উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। ওর দমবন্দ্য হয়ে আসছিল, রেণুর শরীর থেকে এক লক্ষ কস্তুরী হরিণ বেরিয়ে আসছে তাদের মাতাল সুবাস নিয়ে। বৃদ্ধের পাশে হঠাৎ হঠাৎ ফুলের তোড়ার মতো নরম স্পর্শ ওর রক্তে টোকা দিয়ে যাচ্ছিলো। ওর মনে হলো এইভাবে ও যদি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো, এইভাবে।

জলে শব্দ তুলে নৌকোটা পারের কাছে চলে এলো। ওরা দেখলো বৃদ্ধা লোকটা আশ্তে আশ্তে বৈঠা বেয়ে একদম মাটির কাছে নৌকো জিঁড়ালো। ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। সুদমিত রেণুর কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলো, দেখাদেখি রেণুও। নৌকোটা ছোট, একটা ভেজা জাল মাঝখানে পড়ে আছে। বৃদ্ধা হাত জোড় করে হাসলো, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বিরক্ত হতে পারতো সুদমিত। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরন, হাত জোড় করে নমস্কার করা, এই সব ওর কণ্ঠস্বরকে নরম করে সাহায্য করলো—'ঐ ভাস্ক্রা লাইটহাউসে যাবো। তারপর সাফাই গাওয়ার মতন বললো 'এমনি বেড়াতো।'

ঘাড় নাড়লো বৃদ্ধা, 'ওটার সিঁড়িটা গেল বছর কোলকাতার কিছু মেয়ে মন্দ

এসে ভেঙে রেখেছে। তুমি মা উঠতি পারবা না।' তারপর রেণুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পাটারে তো জখম ভালমতনই করিছো, হাঁটতি পারবা?'

সুমিত হেসে ফেললো, 'কি আর করা যাবে!'

'তা আসা হচ্ছে নিশ্চয় কোলকাতা থেকে, নয়?' বড়োর দাড়ি বাতাসে দুলছিলো। চোখ দুটো সুমিতের দিকে। সুমিত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো।

'তা আমি বলি কি, মায়ের যখন এই অবস্থা, আমাদের দুটো টাকা যদি দাও তোমাদের লৌকাবিলাস করিয়ে দিতে পারি।' বলে বড়োর যেন খুব মজা লেগেছে এমন করে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগলো।

'নৌকো করে। বাঃ, দারুণ হবে। এই চলো না।' রেণু খুঁসিতে সুমিতের হাত ধরলো। সুমিতের প্রস্তাবটা আশাতীত মনে হচ্ছিলো। অন্তত হোটেলের ঘাটে নৌকো করে গেলে রেণুকে হাঁটতে হবে না। ও একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললো, 'আমরা কিস্তি ঐ যে বড় হোটেল বাড়ি, ওখানে যাবো, নামিয়ে দেবে তো।'

'ঠিক আছে বাবা।' লোকটা নেমে পড়লো মাটিতে, নেমে নৌকোর একটা দিক শক্ত করে ধরলো। আলপথ থেকে ওরা সাবধানে নীচে নেমে এলো। রেণু ঢালু মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে সুমিতকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। ওর শরীর ভয়ে কাঁপছে টের পেলো সুমিত। একটা পা নৌকায় রাখতেই নৌকো দুলে উঠলো। 'ডুববে যাবে না তো।' রেণু অঁতকে উঠলো।

'কত তুফান গেল মা, নৌকোর প্রাণ কাছিমের মতো শক্ত।' বড়ো বললো। শরীরের ভার ঠিক রেখে সুমিত রেণুকে তুলে নিলো নৌকায়, নিয়ে মাঝখানে বসলো। বড়ো এবার নৌকো বৈঠার ডগা দিয়ে পাড় থেকে ঠেলে সরিয়ে আনলো, তারপর এক প্রান্তের গলুই-এ বসে বৈঠা বাইতে লাগলো চুপচাপ।

প্রথমটায় আড়ন্ত হয়ে বসে থাকলেও এক সময় রেণু সহজ হলো। দু-পাশে জলের দাগ রেখে নৌকোটা মাঝ নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলজ বাতাস ওদের শরীরে ঠান্ডা আমেজ আনছিলো, যদিও রোদ এখনও চার ধারে ছড়িয়ে আছে। নৌকো থেকে আঁশটে গন্ধ উঠছে, বোধ হয় জালের তলায় ধরা মাছ রাখা আছে। বড়ো মাঝে মাঝে তার পাকা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলো। পাকা দাড়ি লম্বা হলেই সুমিতের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে।

এক সময় ওপাশের ধানক্ষেত অনেকটা দূরে সরে গেলো। ডানদিকে ভাঙ্গা লাইটহাউস, আর বাঁদিকে অস্পষ্ট হোটেলবাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে দু' একটা জেলে নৌকো ভাসছে। মাঝ নদী দিয়ে একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে গম্ভীর মাছের মতো। তার ঢেউগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এত দূরে এসে ওদের নৌকাকে দোল দিয়ে যাচ্ছে। রেণু নড়েচড়ে বসলো। তারপর এক হাতে সুমিতকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে ঝুঁকে পড়ে জল স্পর্শ করলো, 'আঃ দাঁড়া কি ঠান্ডা।'

আর ঠিক তখনই সুমিতের মনে পড়লো ওর কুঠিতে জলে ডুববে মৃত্যু হবার একটা ফাঁড়ার কথা লেখা আছে। ছেলেবেলা থেকে এই ভয়ে ওর সাঁতার শেখা

হয়নি। মদুখ ঘুরিয়ে সন্মিত বললো, 'বেশী ঝংকো না, নৌকা উল্টে যাবে।'

সেই সময় বড়ো বললো, না, না, মা আমার পাখির মতো হালকা। হাতটা খুঁয়ে নিলে হয়, মাটি নেগে আছে।'

রেণু কনুই ঘুরিয়ে দেখলো। তারপর জল তুলে তুলে ধুয়ে নিলো হাতটা। সন্মিত রেণুর কোমরের কাছে হাত রেখে সামনে পা ছাড়িয়ে দিলো। আঃ! হঠাৎ ওর নজর পড়লো বড়োর ওপর, একদৃষ্টে চেয়ে আছে রেণুর দিকে। কি দেখছে লোকটা? ওর হঠাৎ মনে হলো এই সব মাঝিরা ইচ্ছে করলেই শয়তানি করতে পারে। যদিও বয়স হয়েছে ওর তবু জলের ওপর ও এখন ওদের ভয় দেখাতে পারে, টাকা-পয়সা ছিনতাই করতে পারে। এখন প্রায় মাঝ নদীতে এসে পড়েছে ওরা, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পারবে না। ও ভাবলো রেণুকে একটু সাবধান করে দেয়, কিন্তু ও অবাক হয়ে শুনলো রেণু গুন গুন করছে জলের দিকে তাকিয়ে। জলের গায়ে রেণুর কাঁপা কাঁপা ছায়াটা পাশাপাশি চলছিলো। একটা মাছধরা পাখি ঠিক মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে গেলো আচমকা। বড়ো এখন আর বৈঠা বাইছে না, হালের মতো ধরে আছে। হঠাৎ নরম গলায় ও বললো, 'মা যদি দোষ না নেয় তবে বলি একটু জোরেই হোক না কেন, মদুখ বল আর দঃখই বল, মনের মধ্যে বন্দী রাখতে নেই।' ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখলো রেণু, তারপর হেসে ফেললো। বললো 'আমার মদুখ এসে গেছে, এই তুমি হাসবে না বলো?'

'আমি চোখ বন্ধ করে আছি।' সন্মিত বললো।

একটা চিমটি কাটলো রেণু ওর হাতে, তারপর নদীর ওপর চোখ রেখে গেয়ে ফেললো, 'সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।' এর আগে কখনো রেণুর গান শোনেনি সন্মিত। মাঝে মাঝে পথ চলতে একটু গুনগুন করেছে এইমাত্র। এখন এই খোলা নদীর বদকে নৌকায় বসে সারা শরীরে বাতাসের স্পর্শ নিয়ে কুচি কুচি কাগজের মতো জলের ফেনা দেখতে দেখতে ওর মনে হলো রেণু খুব দঃখী, দঃখ না থাকলে কেউ এই সুন্দর গান গাইতে পারে না। এত ভালোবাসার কথা তবু গানের ভিতর থেকে এক বিষম মেজাজ এসে চারপাশে ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। রেণু যখন গাইলো, 'আমার মতন সুখী কে আছে। আয় সখী, আয় আমার' কাছে, তখন অদ্ভুত একটা কান্না শামুকের মতো মদুখ-চোখ বন্ধ করে, বাঁসছিলো। এক সময় যখন গান শেষ হয়ে গেলো, যখন সব চুপচাপ, শব্দ বড়ো বৈঠা ধরে আশ্তে আশ্তে নাড়ছে তখন সন্মিতের মনে হলো একটাই লাইন ঘুরে ফিরে বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফিরে ফিরে আসছে—ভালোবাসা কারে কয়! ভালোবাসা কারে কয়! সন্মিত রেণুর হাত শক্ত করে মদুখের আঁকড়ে ধরলো।

হোটেলের ঘাটে নেমে সন্মিত বড়োকে দুটো টাকা দিলো। টাকাটা কেমন নিস্পৃহের মতো নিয়ে বড়ো বললো, 'আর তেঁকে দাখা হবে না বাবু।'

সন্মিত ভাবলো ও আরো টাকা চাইছে, বললো, 'ঠিক আছে, আবার যদি আসি তখন তোমার নৌকায় চড়বো।'

‘আমি তো থাকবো না’ বড়ো ঘাড় নাড়লো, ‘এই শীতেই আমি মরে যাবো, কাকশ্বপের ফকির গুণে বলেছে।’ বলে বড়ো নৌকোটা জলে নিয়ে গেল পাড়ে বৈঠা ঠেলে। সন্মিত চমকে উঠেছিলো কথাটা শুনে, কি সাধারণ গলায় লোকটা বলে গেলো ও মরে যাবে। রেণু একটু এগিয়ে গিয়েছিলো, পিছন ফিরে ডাকলো, ‘এই!’ খুব খারাপ লাগাছিলো সন্মিতের, ও তাকিয়ে দেখলো নৌকোটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে আর বড়োর মুখটা নদীর দিকে ফেরানো, এখান থেকে বাতাসে ওর শাদা দাড়ির প্রান্ত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। রেণু আবার ডাকলো।

হোটেলের সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিলো। সন্মিতদের দেখেই অশোক ঘড়ি দেখালো, ‘ক’টা বাজে খেল্লাল আছে? কোথায় ঘুরছিল?’

সন্মিত দেখলো অশোককে বেশ চকচকে দেখাচ্ছে, মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। স্নান করার পর শরীরে যে জোলুস আসে এখন অশোককে দেখলে তা বোঝা যায়। দুটো রিকশা সামনে দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে অশোকই ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ঝুমা এক পায়ে ভর রেখে শরীরটা ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। চোখাচোখি হতেই হাসলো। চমকে উঠে রেণুর দিকে তাকাতেই রেণু মুখ ফির্কিয়ে হোটেলের দিকে তাকালো। শাড়ি বদলেছে ঝুমা, খুব পাতলা একটা গা-পিচ্ছল শাড়ি পরেছে এখন। টকটকে লাল। শেষ বিকেলের রোদ সেটাকে আরো লকলকে করে তুলেছে। হাতকাটা জামা পরায় চোখের দৃষ্টি ওর নিটোল ফরসা হাতের ডানায় গিয়ে পড়বেই। রুনিভার্সিটিতে কোন মেয়েকে নাভির তলায় শাড়ি পরতে দ্যাখেনি ও! এখন ঝুমা পরেছে। কিন্তু কোমরের ওপর নিয়মিত শাড়ির বাঁধুনির দাগ চোখে পড়ে গেলো সন্মিতের। ঝুমাকে কি খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে? ওর মনে পড়লো ওদের হোস্টেল লাইব্রেরীতে আব্দুল হাসনাতের মোটকা বইটা এসেছে, পড়ে দেখতে হবে।

দুলে দুলে ঝুমা রেণুর কাছে এগিয়ে এলো, ‘কি ভাই, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, না?’ রেণু অবাক হলো, ‘মানে?’

‘কাপড়টার কি অবস্থা করেছো, যে দেখবে সেই বুঝবে।’ ঝুমা হাসলো।

‘বুঝুক।’ রেণু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রিকশায় উঠে বসলো। সন্মিত ভেবেছিলো এখানে ফিরে এসে হোটেল থেকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে রেণুর পায়ে লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এখন রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো রেণু ঈষৎ না যে এটা ঝুমার জ্ঞানুক।

অশোক দাম মিটিয়ে দিয়েছিলো। যা খরচ হবে কৌলিকাতায় ফিরে শেয়ার হবে। অবশ্যই ঘর ভাড়া নেবার টাকাটা ওরাই দেবে। ঝুমা গিয়ে রেণুর রিকশায় উঠলো। উঠে বললো ‘এবার আপনারা দুই বন্ধু একসঙ্গে যান।’ ওদের রিকশাকে আগে যেতে দিয়ে অশোক একটা সিগারেট দুব্বাটের চেষ্টায় ধরিয়ে বললো, ‘খাবি?’ ঘাড় নাড়লো সন্মিত, না। চোখ বন্ধ করে একমুখ ধোঁয়া টেনে অশোক বললো, ‘বুঝলি সন্মিত, দা-রু-ণ।’

সন্মিত কোন কথা বললো না। ও দেখলো নদী থেকে ক্রমশ দূরে চলে আসছে ওরা। এখন ভরা বিকেলে নদীর ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসা ছায়ার ছোট ছোট নৌকোগুলোকে আলাদা করে চেনা কঠিন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দাড়িওয়ালা বন্ধুকে দেখবার চেষ্টা করলো ও। এখন সব অস্পষ্ট।

মনঃশেষে তলায় ওরা যখন ফিরে এলো তখন রাত হয়ে গিয়েছে। বাসে বসেই রেণু ছটফট করছিলো। ফেরার সময় ভিড় ছিলো খুব। কথা বলার সুযোগ ছিল না একদম। রেণু মাঝে মাঝে ঘাড়ি দেখাছিলো। বাস থেকে নেমে রেণু বললো, ‘আজ কপালে কি আছে কে জানে!’

সন্মিত বললো, ‘পেঁঁছে দিয়ে আসবো?’

রেণু ঘাড় নাড়লো, ‘মাথা খারাপ। একাই চলে যাবো।’

অশোক বললো, ‘চল ট্যাক্সি করি।’ অশোক থাকে ঢাকুরিয়ায়। ওদের যেতে হবে একই দিকে। রেণু বললো, ‘না না ট্রামেই চলে যাবো।’ অশোক ঝুম্মার কাছে গিয়ে নিচু গলায় কি বলতে ঝুমা হেসে উঠলো। রেণু বললো, ‘চলি।’

সন্মিত বলতে চাইছিলো ও কোনদিন আজকের কথা ভুলবে না। কিন্তু ও বললো, ‘কাল আসছ তো।’

এগিয়ে আসা একটা ট্রামের দিকে তাকিয়ে রেণু বললো, ‘হ্যাঁ। তারপর ফিসফিস করে বললো, ‘সকালে ভেবেছিলাম আমি ঝুম্মার মতো হবো। কিন্তু পারলাম না, তুমি খুব ভালো, খু-উ-ব।’ ট্রামটা এসে দাঁড়াতেই রেণু উঠে পড়লো। সন্মিত দেখলো অশোকও ট্রামটার উঠছে, ‘সন্মিত, তুই তো নর্থ যাবি, ওকে পেঁঁছে দিস।’ কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অশোক চলে গেলো।

ট্রামটা চলে গেলে সন্মিত দেখলো অন্ধকারে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশে দুটো লোক ঘুরঘুর করছে। লোক দুটোর ভাবভঙ্গি ভালো নয়। সন্মিতকে দেখে ওরা সরে দাঁড়ালো। সন্মিত বললো, ‘চলুন।’

ওরা চোত্রিশ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের সামনে এসে দেখলো বেশ লোক জমে গেছে, বাস নেই। ঝুমা বললো, ‘আপনি হেদোর কাছে থাকেন না?’

সন্মিত ঘাড় নাড়লো। ঝুমা গ্রে স্ট্রীটে থাকে অশোক ওকে বলেছে। ট্রামে গেলেও তো হয় সন্মিত বললো।

‘ট্যাক্সি দেখুন না, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। টারারও...’ ঝুমা গলাটা ক্রান্ত করে বললো। সন্মিত ঝুম্মার দিকে তাকালো। ঘুম পাওয় নাকি, কে জানে? ওরা এগিয়ে এলো মেট্রোর কাছাকাছি। সন্মিত বললো ট্রামে গেলেই হতো, শুধু শুধু খরচ করে কি লাভ আছে।

‘ইস, আপনি তো দারুণ কিস্টে।’ ঝুমা বললো ঝুমা।

‘পগ্সা পেলে তো কিস্টেমি করবো।’ হাসলো সন্মিত।

‘আপনাকে কে দিতে বলেছে, আপনার বন্ধুকেও আমি খরচ করতে দিই না।’

একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেলো ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে সন্মিত দেখলো সেই লোক দুটো পিছন পিছন এতদূরে এসেছে। কেন? ধর্মতলায় সন্ধ্যার পর এক-ধরনের মেয়ের পিছনে এইসব লোকগুলো ঘোরাফেরা করে। ঝুম্মাকে ওরা কি ভেবেছে।

মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রেখে সন্মিত বসেছিলো। ঝুম্মা শরীর এলিয়ে দিয়েছে জানালার ধারে। হঠাৎ ও বললো, 'রেণু খুব ঠান্ডা মেয়ে না।

'ঠান্ডা মানে?' সন্মিত প্রশ্নটা বদ্বাক্তে পারলো না।

'শীতল'। আশ্তে করে বললো ঝুম্মা। এবার ধরতে পারলো ও, একটা রুদ্ধ কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেললো 'ঠিক ভাবিনি।'

'ভেবে দেখবেন।' ঝুম্মা মুখ ফেরালো রাস্তার দিকে, 'ওকে সবাই খুব অহঙ্কারী মেয়ে বলে, অবশ্য ওর কলেজের বন্ধুরা বাদে, তারা অন্য কথা বলে।'

'কি কথা?' সন্মিতের মজা লাগছিলো।

'শরীর আর মন, এই দুটোর চেহারা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে না। ছেড়ে দিন এসব। একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি।' কথা ঘোরালো ঝুম্মা। কিছু বললো না সন্মিত। ঝুম্মা কিসের ইঙ্গিত করছে? অর্থাৎ রেণুর শরীর দেখে ওর মনের বিচার করা ভুল—এটাই কি ও বলতে চাইছে। মনে মনে বিরক্ত হলো ও ঝুম্মার ওপর। অকারণে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে কেউ কেউ সুখ পায়। অথচ আজ যে কর্মটি ও অশোকের সঙ্গে করে এসেছে তার জন্যে কোন লজ্জা বা সংকোচ ওর ব্যবহারে নেই। বলতে গেলে ঢাক পিটিয়েই ওরা জিনিসটা করলো। যেন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, আর তাই বলতে দ্বিধা হচ্ছে না যে খুব টায়ার্ড, ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ এক ধরনের ঘেন্না হলো সন্মিতের। ঝুম্মা আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কই, বললেন না তো আসবেন কিনা।'

'দেখি।'

'দেখি না, আসতেই হবে, আপনাকে অনেক খবর দেবো। এই বা, আপনার হেদো এসে গেছে।' আপসোসের গলায় বললো ঝুম্মা। সন্মিত দেখলো ওদের ট্যাক্সি প্রায় হেদো পেরিয়ে যাচ্ছে। থামিয়ে নেমে পড়লো ও, 'আপনি একা একা যেতে পারবেন তো?' ঝুম্মা সরে এলো জানলায়, 'এইটুকু তো পথ শুনুন, মাথাটা নামান, রেণুর কাছে আমি খুব খারাপ হতে পারি, কিন্তু আমিও তো মেয়ে, মেয়ে না, বলুন?' তারপর সোজা হয়ে বললো 'আসবেন কিন্তু।'

ট্যাক্সিটা চলে যেতে সন্মিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। ঝুম্মার এই সব ব্যবহার ওর কাছে কেমন রহস্যের মতো মনে হচ্ছে। ঝুম্মাকে ওই ধরনের ইঙ্গিতময় কথা বলতে ও কোনদিন শোনেনি। বিয়ের পর মেয়েদের আশিষ বেড়ে যায়, কথাবাতায় ধার আসে। আজকের ব্যাপারের পর ঝুম্মাও কি হেসে ফেললো সন্মিত। আরে তা না, আসলে মেয়েরা এইরকমই, ওদের শরীরের মতো মনের রহস্যের কুল নিজেরাই পায় না, কোথায় যেন পড়েছিলো সন্মিত। ভাগ্যিস পায় না।

নটার মধ্যে মেস থেকে বেরিয়ে পড়ে সন্মিত। এই সময় ট্রাম ফাঁকা থাকে, আরাম করে অফিসে যাওয়া যায়। আজ খুব মোটা আর বড় তালা ঘরে দিয়ে এলো ও। চাকরটাকে ডেকে বললো নজর রাখতে। মেসের কয়েকজন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো কিছন্ন খোয়া গিয়েছে কিনা, ও তেমন কিছন্ন নয় বলে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিলো একটা, যদি আবার কেউ এসে পড়ে আর চিঠিটা যদি সে পেয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে কোন কারণে চিঠির মূল্য কারো কারো কাছে বেড়ে গেছে। কারণটা জানবার জন্যে কৌতূহল হচ্ছিলো ওর। কালকের লোকটা যা বলে গেলো তাই কি সব? রেগ্নুর সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি, কতকাল। বিয়ের পর একবার এসেছিল ও, তখনই জোর করে অফিসের ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে। রেগ্নুই কি তাকে ফোন করেছিল। চিঠিটা সঙ্গে নেবার কথা ভাবলো একবার, কিন্তু সেটা নিরাপদ নয়।

ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতেই ও দেখলো কালকের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। রাগে গা রি-রি করে উঠলো সন্মিতের। ওকে লক্ষ্যই করেনি এমন ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলো ও। লোকটা সামনাসামনি হতেই হাত জোড় করে নমস্কার করলো, ‘কালকে আপনাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি-স্যার, আমার নাম রজবিলাস গুপ্ত।’

যেন কালকে রাতে ওর মনে পড়েছে নাম বলা হয়নি তাই আজ আসা, এইরকম ভাব আর কি! দাঁতে দাঁত চেপে সন্মিত বললো ‘কি চান?’

‘কেন রাগ করছেন স্যার, চিঠিগদুলো—!’ লোকটা হাসতে যাচ্ছিলো, সন্মিতকে এগিয়ে আসতে দেখে মূখ বন্ধ করলো!

‘আপনাকে শেষ বার বলে দিচ্ছি আমাকে বিরক্ত করবেন না।’ সন্মিত বেশ জোরেই কথাগদুলো বললো।

‘আপনি যদি অপছন্দ করেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে রেগ্নুদেবী আপনার উপর দেখলাম ভীষণ খাপসা। কাল রাতে ওর বাবা এসে ওঁকে নিয়ে গেছেন কদিনের জন্য।’ সন্মিত লক্ষ্য করলো আগের কথার সঙ্গে পরের কথার মিল নেই। ও দ্রুত পা চালালো। ডালহৌসির একটা ট্রাম এসেছে। রজবিলাস পেছন পেছন ছুটেতে ছুটেতে বললো, ‘আমি স্যার অফিস ছুটি পর দাঁড়িয়ে থাকবো, আপনি চিন্তা করে নেবেন।’

ট্রামে উঠে বসার জায়গা পেলো ও। রজবিলাসকে রেগ্নুর স্বামী রোজ পাঠাচ্ছে। তাহলে কাল যারা এসেছিলো তারা কে। তারা নিশ্চয়ই ওদের সাহসী, ঘর তখনই করতে ভয় পায়নি। রেগ্নুর স্বামী কি ওদেরও পাঠিয়েছিলো! ভদ্রলোককে কোন্‌দিন দ্যাখনি সন্মিত। খুব বড়সড় চাকরি করেন এইটুকু শুনছে ও। বয়সে ওদের চেয়ে বেশ বড়। রুদ্‌নিভার্সিটির সামনে দিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে সন্মিত দেখলো দুটি ছেলেমেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথ ধরে। রেগ্নুকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর, ভীষণ।

অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুই করার থাকে না। মাঝে মাঝে জ্বলজ্বাল সার্ভে অফিসে যায় ও, সেখানে কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, রামিটারি খেলা হয়। অশোক এতদিন বাইরে ছিল, এখন কোলকাতায় এসেছে ট্রান্সফার নিয়ে জ্বলজ্বাল সার্ভেতে। ওর মাধ্যমেই ওখানে চেনাশোনা। অফিস ছাড়ার সময় ও ভেবেছিলো ওখানেই যাবে। সাহেব, অশোকদের রায় সাহেব, অফিসের পাশেই থাকেন। তাঁর ফ্ল্যাটেই খেলা হয়।

আজ সারা দিন কান খাড়া রেখেছিলো ও। না, কোন ফোন আসেনি। ও খুব আশা করেছিলো যে শনিবার ফোন করেছিল সে আজও করবে। মেয়েরা এই রকমই বোধ হয়, কাউকে অস্বাভিতে রেখে দিতে ভালবাসে। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটিছিলো সন্মিত। রাজভবনের পাশ দিয়ে ফাঁকায় হেঁটে রায়সাহেবের ফ্ল্যাটে যেতে বেশী সময় লাগে না। দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখেছে ব্রজবিলাস এসেছে কিনা। শালাকে আজ ভালো করে সমঝে দিতে হবে! রাজভবনের এদিকটা ফাঁকা। আনমনে হাঁটিছিলো সন্মিত, হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো সামনে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ওর কেমন অস্বাভি হলো। ছেলে দুটো কোমরে হাত রেখে ওকে দেখছে। চোখের দৃষ্টি ভালো নয়, চোয়াল শক্ত, ভাঙ্গা গাল মুখটাকে ককর্শ করে তুলেছে দু-জনেরই। ও দেখলো পেছনে আরো কয়েকজন এসে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আচমকা একটা ভয় ওর বুকের মধ্যে পাক খেয়ে গেলো। এদিকটা একদম ফাঁকা, শুধু আকাশবাণীর সামনে দিয়ে গাড়ির স্রোত যাচ্ছে। ক্রমশ বৃত্ততা ছোট হয়ে এলো। দু-একজন যারা এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো তারা ব্যাপারটা না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে। সন্মিত অসহায়ের মতো তাকালো। এই মূখগদুলো ওর অচেনা, আর দেখলেই বোঝা যায় দয়া মায়ী প্রভৃতি শব্দের কথা এরা কোনকালেই শোনেনি। ঠিক মুখোমুখি যে দাঁড়িয়েছিলো সন্মিত তার দিকে চেয়ে কোনরকম বললো, কি চাই আপনাদের?’

যেন এই রকম কথার জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিলো। পলকে সন্মিত দেখলো ছেলোট পেছনে শরীর বেঁকিয়ে ওর মূখের দিকে ঘুরি মারছে। ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে সন্মিত মাথাটা সামান্য সরাতে পারলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে ও টলে উঠলো। ঠিক সেই সময় একটা হাত ওর জামার কলার চেপে ধরে ওকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিতেই ওর মনে হলো, ওর কোমর ভঙে গেছে। পর পর কয়েকটা লাথি এসে পড়লো কোমরে। সন্মিত চিৎকার করে বললো—কি করছেন কি আপনারা—আপনাদের আমি চিনি না—।’ যে ছেলোট প্রথম ঘুরি মেরেছিলো সে এবার সন্মিতের বুকের জামা খিমচে ধরে মূখ কাছে নিয়ে এলো ‘চেনো না, শালা বদমাস, ব্র্যাকমেইল করার ধান্দা, হুতামাকে শালা আজ জ্যান্ত পুঁতবো।’ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সন্মিত হেঁথ অন্ধকার দেখলো। ছেলোট ওর কপালের ওপর এবার ঘুরি মারতে পেরেছে। যেহেতু ওর জামা ছেলোটের হাতে ধরা ছিলো ও পড়ে গেলো না। ব্র্যাকমেইল, ব্র্যাকমেইল—সন্মিত মনে মনে শব্দটা

নিম্নে হাতড়াচ্ছিলো। চিঠিটা কেন দিয়েছ? টাকার জন্যে? শালা আজ তোমাকে বাপের বাসি বিয়ে দেখাবো।' ছেলেটা আবার হাত তুলতেই সন্মিত মাটিতে পড়ে গেলো। ওর চারপাশে গাছপালার মতো কতগুলো পা, ষার ফাঁক দিয়ে দূরে দাঁড়ানো সন্মিতচন্দ্রকে দেখতে পাওয়া গেলো। হঠাৎ একটা ঘোরের মধ্যে সন্মিত শুনলো, 'এই গল্পী, হয়েছে আর নয়, তোমাদের আমি এভাবে ট্যাক্স করতে বলিনি, ছেড়ে দাও।'

'না দীপকদা, এ শালাকে ভালো করে বানাতে দিন।' আপনার বোনের ইচ্ছা মানে আমাদেরও ইচ্ছা।' গল্পীর গলা শুনলো সন্মিত।'

'কিন্তু মেরে কি হবে, আমার চিঠিটা চাই, ও মেরে গেলে ব্যাপারটা জানা যাবে না সেটা বেহাত হয়ে গেছে কিনা। ছেড়ে দাও।'

গলার স্বরে এমন কিছুর ছিলো, সন্মিত দেখলো ওর চারপাশের পায়ের সারি-গুলো আশ্বে আশ্বে ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ একটা মৃদু ওর দিকে নিচু হয়ে এলো, 'ব্যাপারটা এ ভাবে হোক আমি চাইনি, বন্ধুতে পারছেন বয়স কম ওদের, অপেক্ষেই উত্তেজিত হয়।'

সন্মিত মাথা তুলে লোকটাকে দেখলো। ফরসা চেহারা। নাক চোখ-মুখ, সন্মিত চোখ বন্ধ করেই আবার খুললো রেণু দাঁড়িয়ে আছে, অবিকল রেণু, সেই চোখ কপাল চিবুকের আদল, না রেণু নয়। সন্মিত চোখ খুলে রাখতে পারছিলো না। 'আমি বন্ধুতে পারছি এখন আপনার পক্ষে মন ঠিক করে কথা বলা সম্ভব নয়, আজ রাতে আপনার মেসে যাবো।' হাত ধরে রকে তুলে বসালেন ভদ্রলোক, 'ক্ষমা চাইছি ব্যাপারটার জন্যে।'

'দীপকদা, কুইক। সন্মিত কতকগুলো পায়ের দ্রুত যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। ফুটপাতে বসে মাথা দু'হাতে চেপে ধরে ও চোখ খুললো, একটা কালো ভ্যান আকাশবাণীর দিক থেকে এসে ময়দানের দিকে চলে গেলো। সন্মিতের মাথা ঘুরছিলো। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্বলছে ময়দানে। কয়েকজন পথচারী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিলো। সন্মিত উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করলো। কোমরের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা, ঠোঁটের উপর চটচটে গরম কি একটা লাগতেই ও জিভ বোলালো। নোনতা স্বাদ। বাঁ হাতে দ্রুত ফলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি বেশ দ্রুত এসে প্রায় ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়েই দরজা খুলে গেলো। সন্মিত দেখলো কেউ লাফিয়ে নামছে। আবার ওরা এলো নাকি! দুটো হাত ওর কাঁধের উপর আলতো করে রেখে ওকে তুলে ধরার চেষ্টা করলো, 'স্যার, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, আমি ট্যাক্স এসেছি।' এরকম অবাধ সন্মিত জীবনে কখনো হয়নি। এক চোখে কোনরকমে এঁদেখলো, রজবিলাসের মুখ কেমন দুঃখী দুঃখী। নাকি শালা গোঁফের নিচে হাসছে! ঠিক বোঝা গেলো না। কিন্তু এ শালা কোথেকে এলো! দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রজবিলাস ট্যাক্সীর দিকে

নিয়ে যাচ্ছিলো। ওর মাথা সন্মিতের বন্ধের কাছে। সন্মিত কোনরকমে ট্যাকসিতে উঠে মাথা হেলিয়ে দিলো পেছনের সিটে। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে রজবিলাস বললো, ‘হেদুয়া চলিয়ে সদরজী!’

মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা, সন্মিত ঘাড় ঘোরালো। এই অবস্থায় মেসে গেলে সবাই প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আজ অফিসের দিন, মেস এখনও খালি। কিন্তু তার কাছে একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ও দেখলো রজবিলাসের মুখ ওর দিকে ঝুঁকে এসেছে, ব্যাটারী একটুও বাদ রাখেনি, মুখটাকে কি করে দিয়েছে, ইস্।’

সন্মিত কোনরকমে পকেট থেকে রুমাল বের করতেই রজবিলাস খপ করে ওর হাত থেকে সেটাকে নিয়ে নিলো, ‘রক্ত, কত দুধের ফোঁটায় একরত্তি রক্ত হয়ে, রক্ত-খাকী মেয়ে, ঠিক করেছেন স্যার, বাধা দিলে ওরা মেয়ে ফেলতে পারতো।’ আলতো করে রুমাল বুলিয়ে ওর মুখের রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো রজবিলাস, ‘ব্যাটা নিশ্চয়ই বস্ত্রার, কেমন লো কাট একটা ঝাড়লো, ছবির মতো দেখলাম।’

মুখ সরিয়ে নিলো সন্মিত, ‘আপনি চুপ করুন তো।’

‘না স্যার, এখন কথা বলবেন না। ওরা হলো শত্রুপক্ষ আপনার এবং আমার। ট্যাকসি ফুল সব করতে হবে এখন! আমি বলি কি আপনি আমার সঙ্গে কোপারেশন করুন, শালারা তাহলে পারবে না। আর ঐ যে লোকটা প্রথমে লেলিয়ে দিয়ে পরে রাশ ধরল, ঐ হলো রেগুদেবীর দাদা, এক নম্বরের মতলববাজ। আধমরা করে তবে পিরীত দেখাতে এসেছে, একদম বিশ্বাস করবেন না। যাবার আগে কি বলে গেল স্যার?’ চটচটে রুমালটা সন্মিতের দিকে এগিয়ে দিলো রজবিলাস। বাঁ হাতে সেটাকে নিয়ে সন্মিত দেখলো, এটা আর ব্যবহার করা চলে না। হাত বাড়িয়ে বাইরে ফেলে দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠলো রজবিলাস, ‘আ হা হা— ফেলে দিলেন, দশ পয়সার সাবান ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যেত নগদ দুটো টাকা রাস্তায় ফেলে দিলেন। বন্ধুতে পেরেছি, খুব শক্ পেয়েছেন, যা হারামজাদা মেয়েছেলে। তুই কিনা এককালে যার সঙ্গে রঙ করতিস তাকেই মার খাওয়ালি! ছি ছি ছি।’

সোজা হয়ে বসলো সন্মিত, ‘কি চাই আপনার?’

সন্মিতের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর বদলে গেলো রজবিলাসের, ‘স্যার ঐ চিঠি যতক্ষণ আপনার কাছে আছে ওরা ছেড়ে দেবে না। আপনি ঐ আমাকে দিন, কাজ হয়ে গেলেই ফেরৎ পাবেন। আর নগদ টাকা।’

শরীরে একটু শক্তি ফিরে আসছিলো সন্মিত, ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললো। হারিসন রোডের কাছে ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই ওর হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলো, ‘নেমে যান।’

ভীষণ রকম অবাঁক হয়ে রজবিলাস বললো, ‘স্যার!’

ধমকে উঠলো সন্মিত, ‘নেমে যান, গেট আউট।’

‘ষাচ্ছি স্যার, ট্যাকসিটা আমিই স্যার, আপনাকে মেসে পৌঁছে, আচ্ছা আচ্ছা।’ সন্মিতের মন্থের দিকে তাকিয়ে সন্মিত করে নেমে গেলো রজবিলাস। দরজা বন্ধ করে ও ড্রাইভারকে চলতে বললো। গাড়িটা এগোতে শব্দ করতেই রজবিলাস দৌড়ে এলো পাশে, স্যার, একটু চিন্তা করে নরেন, আমি আবার আসবো, স্যার।’

দুহাতে মন্থ ঢেকে বসে থাকলো সন্মিত, বড় কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট।

ভাগ্যিস রাত হয়ে গিয়েছিলো এবং ওদের মেয়ের করিডোরের আলোর বদনাম আছে। সন্মিত ডাক্তারের চেম্বার ফেরৎ সোজা নিজের ঘরে চলে এলো, কেউ ওকে তেমন লক্ষ্য করেনি। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে যে ডাক্তারখানার এক ভদ্রলোককে চুপচাপ বসে থাকতে দেখতো ও, আজ জানলো তিনিই ডাক্তার, যদিও তাঁর পসার-পাতি তেমন নেই, তবু তার রসিকতা করার প্রবণতা আছে। দেখা হতেই ভদ্রলোক বললেন, ‘প্রেমট্রেম করতে গিয়েছিলেন নাকি মশাই।’

এখন ওর মন্থে দুটো ছোট জোড়াতালি, গোটা আটেক ট্যাবলেট গিলতে হবে ব্যথাগুলো মারতে, আর কালকের দিনটা বিশ্রাম, অবশ্য জ্বর-ফর এসে গেলে কথাই নেই, বিশ্রাম বেড়ে যাবে। বিছানায় শব্দে শব্দে ও ব্যাপারটা ভালো করে ভাবলো। মনে হচ্ছে অনেক দূর এগিয়েছে। রেণু আর ওর স্বামী, মিঃ মন্থাজী কি যেন নাম, বরেন মন্থাজী। হ্যাঁ এরকমই তো বলেছিলো রেণু, ‘বুঝলে অনেক দূর এগোবে।’ কিন্তু এর মধ্যে সন্মিতকে জড়াবার কোন দরকার ছিলো না রেণুর। আজ পর্যন্ত রেণুর কোন ক্ষতি হোক আমি চাইনি, সন্মিত মনে মনে বললো, ঐ যে ছেলেটা যে ওকে মোক্ষম ঘৃষিটা ঝাড়লো, গুপুপী, মন্থ খিঁচিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেইলার বলে গালাগালি দিয়ে উঠলো কেন? তবে কি রেণু ভাবছে ওর চিঠি এতদিন ধরে আমি রেখে দিয়েছি ওর স্বামীর হাতে তুলে দেবো বলে। ক্ষিপ্ত ছেলেগুলোকে এভাবে উত্তেজিত না করলে ওদের মন্থের চেহারা ঐ রকম হয়! রজবিলাস বলেছে রেণু, এখন বাড়ি গিয়েছে।

চোখ বন্ধ করে শব্দেছিলো সন্মিত, হঠাৎ ভেজানো দরজায় শব্দ হলো। কোনরকমে উঠে বসতেই ও দেখলো ওদের চাকর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে এক বাবু এসেছেন।’ কথাটা বলতে বলতে ওর চোখ সন্মিতের মন্থের ওপর আসতেই গোল হয়ে গেলো। কিছন্ন বলতে ষাচ্ছিলো বোধ হয় কিন্তু সন্মিত গম্ভীর হয়ে বললো, ‘ভেতরে নিয়ে এসো।’

সন্মিত দেখলো দীপকবাবু, হ্যাঁ একাই ঘরে ঢুকলেন ও চাকরকে চলে যেতে বলে দীপকবাবুর দিকে তাকালো, ভদ্রলোকের বস্ত্র-চল্লিশের মধ্যে, মন্থের মধ্যে অপরাধী অপরাধী ভাব। ঘরে ঢুকেই দু-হাত জোড় করলেন, আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার মন্থ আমার নেই, কিন্তু বিশ্বাস করুন সব কিছন্ন আমার ইচ্ছে মতন হয়নি।’

সন্মিত উত্তর দিলো না। ও ইচ্ছে করলে লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে মেসের সবাইকে ডেকে বলতে পারে এই লোকটার সঙ্গীরা ওকে মেরেছে। কিন্তু তাহলে কিছই জানা যাবে না, ওর রেগুদর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিলো, রেগু কেন এমন করলো, কেন? সন্মিত বললো ‘বসুন’।

‘ভাত্তার কি বললো?’ একটা চেয়ার টেনে দীপক বসলেন।

‘সেরে যাবে’। সন্মিত দেখলো কথাটা শুনে মুখ নিচু করলেন উনি। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। সন্মিত ঘাড় নাড়তেই নিজে একটা ধরালেন, ‘আমার নাম দীপক, দীপক রায়। আমি রেগুদর দাদা।’

‘বুঝতে পেরেছি, আপনাদের মুখের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।’ সন্মিত বললো।

‘আমি কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্য কথা বলতে কি এ ছাড়া আমাদের আর কিছই করার নেই। বরেনের প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, ও চাইছে রেগুকে এমনভাবে বশিত করতে যাতে ওর কোন দায়িত্ব থাকবে না। রেগু আমার বোন, এটা আমি কি করে মেনে নিতে পারি বলুন?’ দীপক মুখ তুলে সন্মিতের ছবির দিকে তাকালেন।

‘আপনার বোনের সব ব্যাপার যখন আপনি—’ সন্মিতকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, ‘আমি জানি আপনি কি বলবেন। আসলে কি জানেন আমাদের বাড়িটা ছিল খুব রক্ষণশীল। বাবা মায়ের থেকে আমাদের দুই ভাই-বোন অনেক দূর মানসিকতায় মানুষ। ও আমার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট, কিন্তু ওর একমাত্র বন্ধু আমি। ও যখন ছেলেদের সঙ্গে মিশতো তখন আমিই বলছিলাম, ভালো করে নিজেকে বোঝ তারপর যা ইচ্ছে কর আমি তোকে হেলপ করবো। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেলো।’

‘আমি কি করতে পারি?’ সন্মিত জানলার দিকে তাকালো।

‘আপনি রেগুদর চিঠি কি করেছেন?’ দীপক সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

‘আপনার কি মনে হয়?’

‘বরেন রেগুকে দিনের পর দিন একটা নতুন নাম বলে বলতো তোমার সব জেনে গেছি। সেইসব শুনে রেগু আমাকে একটা চিঠি লিখলো সেটা আমি পাইনি। সেই চিঠির পরই বরেন রেগুকে টচার করতে আরম্ভ করলো, আপনার নাম বললো, আর দুদিন আগে বলেছে আপনি টাকা নিয়ে বরেনকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছেন।’

‘রেগু এটা বিশ্বাস করেছে?’

‘মনে হয় সেই রকম। ও নাকি এর মধ্যে আপনাকে অফিসে ফোন করেছিল আপনি ফোন ধরেন নি। বদমা নামে একটি মেয়ে যে আপনাদের সঙ্গে পড়তো সেও ওকে কি সব বলেছে। মেয়েদের মন।’

সোজা হয়ে উঠে বসলো সন্মিত। বদমা ওকে কিছ বলছে? আশ্চর্যের বোধ হয় শেষ থাকে না। বদমার সঙ্গে ওর কতদিন দেখা হয়নি, কতদিন! অথচ

ঝুম্মা ওর সম্পর্কে রেগ্নকে কি সব বলে বসলো ।

হঠাৎ দীপক সোজা হয়ে বসলেন, 'আপনি রেগ্নকে কথা দিয়েছিলেন যে, বিয়ের পরও পাঁচ বছর ওর জন্যে অপেক্ষা করবেন ?'

সুদমিত প্রথমে কোন কথা বললো না । ওর হঠাৎ সেই রেগ্নর কথা মনে পড়ে গেলো, যে রেগ্ন ওকে বলেছিল, 'আমাকে তুমি ঘেন্না করো, ঘেন্না করো, ঘেন্না করো ।'

'আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলেন দীপকবাবু ।' হঠাৎ সুদমিত বললো ।

'বুঝতে পারলাম না, আপনি ।' হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক ।

'ফাঁসির আসামী, যে কোনদিন গাঁজায় যায়নি তাকেও আগের রাতে নম্র হয়ে বাইবেল শুনতে হয়. হয় না ? দেখুন, রেগ্নর কথা আমার ইদানিং তেমন মনে পড়তো না । হঠাৎ হঠাৎ কাউকে দেখে, এসব কাউকে বোঝানো যায় না । সেই রাতে রেগ্নকে আমি বলেছিলাম যে, আমি অপেক্ষা করে থাকবো, বেশ, তো আপনি ওকে বলবেন আমি অপেক্ষা করে আছি । চিঠিগুলো ওর স্বামী হাতে পেলে বিচ্ছেদ সহজ হবে । এটা ওর ভালোই হবে, আমি তো অপেক্ষা করেই আছি । কিন্তু সত্যি বলুন তো ও মুক্তি চাইছে কি না ?' উত্তেজনায় সুদমিত হাঁপাচ্ছিল ।

দীপক কিছু বললেন না প্রথমটা, তারপর উঠে দাঁড়ালেন । হঠাৎ সুদমিত নমে দাঁড়ালো, 'আপনারা আমার এই ব্যবস্থা করেছেন রেগ্ন জানে ?'

মাথা দোলালো দীপক, 'আমি ওকে বলেছি, আমি অনুরোধ সুদমিতবাবু ।'

'রেগ্ন শুনবে কি বললো ?' সুদমিতের গলা কাঁপছে ।

হাতটা নাড়লেন উনি, 'ছেড়ে দিন, আমি আমার বোনকে আজও বুঝতে পারিনি সুদমিতবাবু । তবে ওকে বিপদে ফেলবেন না, এই অনুরোধ ।' মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক । ওদের কাঠের সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো ।

সাতদিন রেগ্নর কোন খবর ছিল না । অশ্রুত অস্বস্তির মধ্যে সুদমিত রোজ ক্লাসে গিয়েছে, রেগ্ন নেই । অশোক হেসে বলেছে, 'তুই ভীষণ বোকা, আসছে না তো কি হয়েছে । দ্যাখ বিয়ে টিয়ে হয়ে গেল কিনা । বিয়ে ? মাথায় জেনারসীর ঘোমটা দিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে, এ দৃশ্য চোখের ওপর হঠাৎ হঠাৎ দেখতো সুদমিত । আর বুকের মধ্যে এক লক্ষ দমকল ছুটোছুটি শব্দ করে দিত । শেষ পর্যন্ত অশোকই খবর আসিলো রেগ্ন জামশেদপুর গিয়েছে । ওর কে এক আত্মীয় থাকে সেখানে ? সুদমিতের কাছে হচ্ছিলো ও সোজা জামশেদপুরে চলে যায়, আহা ঠিকানাটা যদি জানতাম ।'

সাতদিন পর এক রবিবার হোস্টেলে চূপচাপ শুনিয়েছিলো ও । বাইরে শীত এসে যাওয়া রোদ্দর । সিনিয়ার ছেলে বলে ও আলাদা ঘর পেয়েছে । আর কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা । ওদের দারোয়ান পাখর এসে দরজা খাঁকা দিলো, 'এ সুদমিত-

বাবু, দরজা খুলিয়ে ।’

দুপুরবেলায় ও আসে মনি অর্ডারের ফর্ম লেখাতে প্রত্যেক মাসে । ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই খতমত হয়ে গিয়েছিলো সুমিত । পাথরের পেছন লাল পাড় শাদা শাড়ি পরে একহাতে পুজোর প্রসাদের চ্যাণ্ডারি নিয়ে রেগু দাঁড়িয়ে । ওকে দেখে হাসলো । আর সুমিত অবাধ হয়ে দেখলো হতচ্ছাড়া পাথর ওর বিরাট বপু দুদলিয়ে বলছে, ‘মায়ি পুজা করলবা ।’ প্রথম কথা, ওদের হোস্টেলে কোন মেয়ের ঢোকা বারণ । এ নিয়ে সুপারের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে । কোন গেস্টরুম নেই, আত্মীয় স্বজন এলে অসুবিধা হয় । শেষ পর্যন্ত সুপার বলেছেন বয়স্কা আত্মীয়া আসতে পারেন, এটা ওদের মেনে নিতে হয়েছে । এই বয়স্কা বিচারের ভার ঐ পাথরের ওপর । মাছি গলতে দেয় না । একবার একটি ছেলের মা এসেছিলেন একা দেখা করতে । ‘ফাস্ট’ ইয়ারের ছেলের মায়ের বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি, দেখলে আরো কম মনে হয় । ঢুকতে দেয়নি পাথর । দ্বিতীয় সেই পাথরের কপালে একটা সিঁদুরের টিপ । দিলোটা কে । পাথর জানালো সুপার সাহেব নেই হোস্টেলেও লোক কম । তাছাড়া এমন ভক্তিময়ী মেয়ে ও দ্যাখিনি । সুমিতবাবুর এই বোন ওকে প্রসাদ দিয়েছে । বার্তাচিত করে নিন, তবে আধা ঘণ্টার বেশী নয় । চলে গেল পাথর ।

ঘরে ঢুকেই রেগু বলিছিলো, ‘এই রাগ করেছে ?’

এত অবাধ হয়ে গিয়েছিলো সুমিত, হ্যাঁ করে রেগুকে দেখিছিলো । লাল পাড় শাদা শাড়ি একটি বাঙালী মেয়েকে এমন রূপসী করে তুলতে পারে, আগে জানতো না ও । এখন ওর কপালে চিকচিকে ঘাম, রেগু ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো । সুমিত ভেবেছিলো অনেক কিছু বলবে, অনেক অনুযোগ, অভিমানে ফেটে পড়বে কিন্তু এখন এই রেগুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও বললো, ‘বলে গেলে কি হতো ?’

বাঁ হাতে ওর হাত ধরলো রেগু, ‘বলে গেলে যেতে পারতাম না যে । তুমি যেতে দিতে, বলো ? আসলে যাওয়াটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেলো । তোমাকে ফোনে জানাবো, দেখি ফোন খারাপ । তারপর রোজ কী ভীষণ খারাপ লাগতো । দুদিনের জন্যে গিয়ে সাতদিন থেকে এলাম বাধ্য হয়ে । একা থাকলেই মনটা এমন লাগতো যে বদ্বতে পারতাম তুমি আমার কথা ভাবছ । আচ্ছা বলতো, কাল রাত ঠিক দশটার সময় তুমি কি ভাবিছিলে ?’ ছেলেমানুষের মতো মুখ করলো রেগু ।

সুমিত মনে করতে চেষ্টা করলো, ‘রবীন্দ্রনাথের গান হাচ্ছিলো রেডিওতে, শুনতে শুনতে হঠাৎ ডায়মন্ডহারবারের বড়োটার কথা মনে পড়লো আর তারপরই তোমাকে— ।’

‘যাঃ ।’ চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো রেগু, ‘এমা! তুমিও একসময় ভাবিছিলাম নোকোয় বেড়ানোর কথা । বাঃ । এই চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি—অনেক দূরে । রেগুর হাত তখনও ওকে ধরা ।

‘তুমি আর কখনো আমাকে না বলে কোথাও যাবে না, আমার কষ্ট হয় ।’ সুমিত কথাটা বলতে বলতে শুনলো কারা ঘেন করিডোর দিয়ে আসছে । চট করে

দরজাটা ভেঁজিয়ে দিলো সন্মিত, তারপর কী ভেবে হুড়কোটা তুলে দিলো, 'আস্তে কথা বলো, এখানকার ছেলেরা খুব জেলাস।'

'আজ সকালে ফিরেছি। ভাবলাম তোমাকে ফোন করি। তারপরে ঠিক করলাম কাকে দেবো তোমাকে। স্নান খাওয়া করে কাউকে না বলে বেরিয়ে এসেছি। আসার সময় মনে পড়লো যে, তোমাদের ধর্মপ্রাণ দারোয়ান আমাকে হয়তো ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ঠনঠনের সামনে বাসটা থামতেই একটা প্র্যান মাথায় এসে গেলো। পূজো হচ্ছে না এখন, তাই এই প্রসাদ কিনে একজনকে বলে সিঁদুর আর বেলপাতা দিয়ে মায়ের পা ছুঁইয়ে নিয়ে এলাম।'

'কেন?'

'তোমার মঙ্গল হবে তাই।' হাত বাড়িয়ে প্রসাদের চ্যাঙারি সামনে ধরলো ও।

'কি আশ্চর্য মেয়ে তুমি!'

'আরে শোন, এই প্রসাদ দেখিয়ে তোমাদের দারোয়ানকে তো ম্যানেজ করেছি, বলো? ওকে বললাম এ ভীষণ ভারী প্রসাদ, যার উদ্দেশ্যে পূজো তার হাতে না দিলে খুব পাপ হবে। ও বললো, 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি। তখন আমি দুটো সিঁদুর লাগা সন্দেশ ওর হাতে দিলে কপালে টিপ পরিয়ে দিলাম। ব্যস, লোকটা কেমন ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেলো। এই জানো, প্রসাদ নিয়ে না হাতজোড় করে আমার নমস্কার করলো, আমার না যা মজা লাগছিলো।' হাসতে হাসতে সন্মিতের বৃকের কাছে এসে দাঁড়ালো রেণু।

'আমি ও প্রসাদ চাই না।' সন্মিত বললো। চাঁকতে মুখ তুললো রেণু। তারপর চ্যাঙারিটা টেবিলের ওপর রেখে হঠাৎ আছড়ে পড়লো সন্মিতের বৃকে। সমস্ত শরীর থর থর করে উঠলো। সন্মিত দেখলো রেণু পাগলের মতো ওর কাঁধে গলায় মুখ ঘষছে। পায়ের পাতা থেকে হাতের আঙুল অবধি একটা 'কি জানি কি' বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সন্মিত রেণুর কাঁধে হাত রাখলো। দৃ-হাতে সন্মিতকে জড়িয়ে ধরেছে ও, দাঁড়িয়ে থেকে সন্মিত টলতে লাগলো। তারপর ও রেণুর মুখ দৃ-হাতে অঙ্গুলির মতো করে ওপরে তুললো। রেণুর চোখে জল।

এখন এই নিজর্ন দৃপ্তরে ওর হোস্টেলের এই ঘরের বন্ধ দরজা সন্মিতকে তার সমস্ত ছেলেবেলা, কৈশোর থেকে টেনে এনে ছুঁড়ে দিলো যৌবনের রহস্যময় বিধা আর বিস্ময়ে। চোখে চোখ রাখলো রেণু! ভিজো-চোখের পাতায় এক কথা লেখা থাকতে পারে, সন্মিত কখনো জানতো না। দৃ-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো সন্মিত। তিল তিল করে বৃকের মধ্যে একটা বোধ ছড়িয়ে যাচ্ছে, এরই নাম কি স্নেহ! একটা ঘরের মধ্যে চাপা স্বরে সন্মিত বললো, 'রেণু আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

সন্মিতের বৃকে একটা গাল চেপে রেণু বললো, 'জানি জানি।'

'তুমি?' কাঙালের মতো বললো সন্মিত।

'হুঁ হুঁ হুঁ।' একটু করে দুলছিলো রেণু। ওর দৃহাতের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সন্মিতের শরীরটায় সেই দুলুনি লাগলো। রেণুর মসৃণ মুখ, ঠোঁটের

কোণে মৃদু হাসির ঢেউ, সন্মিত মাথা নিচু করলো। মৃদু নামালো ও, চোখের সামনে একশো নন্দন কানন, রেণু চোখ বঁজ়ে ফেললো। রেণু কি ভয় পাচ্ছে? ওকি চাইছে না? সন্মিত দেখলো কি একটা আশ্চর্য মায়ার রেণুর মৃদু ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠছে আরো। রেণুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখছিলো ও, রেণুর গরম নিশ্বাস লাগছে মৃদু, আর ঠিক সেই সময় এক ঝটকায় মৃদু সরিয়ে নিলো রেণু। তারপর সন্মিতের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললো ও, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ।'

খুব নাড়া খেলে কারো সাড়া থাকে না আচমকা। সন্মিত প্রথমটা কিছু বলতে পারাছিলো না, তারপর এগিয়ে এসে রেণুর কাঁধে হাত রাখলো, 'এই কি যাতা বলছো?'

'তুমি আমাকে খুব বিশ্বাস করো না?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি রেণু।'

'অথচ দ্যাখো, এই সাতদিন তোমাকে কি কষ্ট দিলাম আমি। তুমি তো একবারও জিজ্ঞাসা করলে না কেন চলে গিয়েছিলাম আমি?'

'তুমি তো বলবেই যদি তেমন কিছু জরুরী হয়।'

দুহাতে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরলো রেণু সন্মিতকে। তারপর সন্মিতের ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো। চমকে উঠলো সন্মিত, এরকম হচ্ছে কেন? শরীরের সব রক্ত আচমকা টলে উঠলো কেন? চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেবার মত রেণু ওর কপালে, চোখের পাতার গালে চিবুকে, এখন সারা মৃদু ছোট ছোট চুমু খেয়ে যাচ্ছে শব্দ নিষিদ্ধ করে রাখছে ঠোঁটটা। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেলো সন্মিতের, বৃকের বাতাস এত ভারী কেন? শেষ পর্যন্ত তিন বছর না খাওয়া কোন ভিখারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো রেণুর ঠোঁটে। দুটো নরম ঊরু অথচ সিন্ধু জবাফুলের মতো ঠোঁট পাগলের মতো নিতে চাইলো নিজের মতো করে। অস্ফুট আওয়াজ করলো রেণু, 'উঃ একেবারে রান্ধস, লাগে না বৃঝি।' একটু থমকে গেলো সন্মিত, মৃদু তুলে দেখলো রেণু হাসছে, 'উম, আমাকে নাও, নাও, নাও।'

একটা ঝড়ো বাতাসের মতো সন্মিত রেণুকে বৃকে তুলে নিলো। ওর অগোছালো বিছানায় রেণুকে শইয়ে দিলো যত্ন করে। ছেলেমানুষের মতো রেণু ওকে দেখাছিলো। খাটের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে সন্মিত রেণুর হাতে মৃদু রাখলো। কি নরম জলের মতো গন্ধ রেণুর হাতে, সমস্ত ছেলেবেলা মনে কঁপিয়ে দেয়। আশ্বে আশ্বে মৃদু নামালো ও হাতের ওপরের দিকে বাহুতে। রেণুর বৃকের কাছে মৃদু রেখে ও রূপণের মতো চুপ করে বসে থাকলো খানিক। রেণু অবাধি কোন যুবতী মেয়ের বৃক দ্যাখনি ও, রেণুর বৃক কি রকম?

একটা হাত সন্মিতের মাথায় রেখেছে রেণু, আঙ্গুলগুলো ওর চুলের ভিতরে খেলা করছে। রেণুর বৃকের মধ্যে থেকে মন কেমন করা সুবাস উঠে আসছে ওর নাকে। এই জামা এবং অন্তর্বাসের আড়াল খুললেই রেণুর সমস্ত যৌবনটা ওর

দামনে এসে দাঁড়াবে, অথচ ওর খুলতে কেমন ভয় হচ্ছিলো। একবার আড়াল খুঁজে গেলেই সব যে দিলের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার যা তা কি শাদামাটা নয়? ও আস্তে আস্তে মুখ নামালো নিচে, রেণুর কোমর পেট কী নয়, আঃ!

রেণু চোখ বন্ধ করে শূন্যে আছে। এখন ওর ঠোঁটদুটো ঈষৎ খোলা, চিকচিকে কুঁদ ফুলের মতো শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। জিভের ডগা দাঁতের গায়ে সামান্য পড়ছে, 'এই শোনো।' রেণু ডাকলো।

মুখ তুললো সন্মিত। রেণুর গলার স্বর কেমন ভারী।

'এখানে এসো, আমার পাশে এসে শোও।' হাত বাড়িয়ে ডাকলো রেণু। মুহূর্তে পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে টের পেলো সন্মিত। এই রেণু একটু আগের রেণু নয়। অনেক ভিতরের থেকে কথা বলছে ও, যা সন্মিতের বন্ধুর মধ্যে একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে দিলো। উঠে এসে রেণুর পাশে শূন্যে পড়লো ও। সরে এলো রেণু, তারপর সন্মিতের বন্ধুকে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আনুমনে কি লিখতে লাগলো। চোখ বন্ধ করে সন্মিত লেখাটা বোঝার চেষ্টা করছিলো।

'এই আমাকে বিয়ে করবে? আজ কিংবা কাল।' খুব আস্তে আস্তে রেণু বললো।

'রেণু!' সন্মিত অবাধ হয়ে গেলো।

'আমার ভীষণ ভয় সন্মিত, ভীষণ ভয়।'

'কেন, কিসের ভয়, তুমি তো পরীক্ষা দেবে, দেবে না?'

'পরীক্ষা?' হাসলো রেণু, 'বাবা ভীষণ ফিউরিয়াস, আর রাশ ঢিলে রাখতে চাইছেন না। জামশেদপুরে গিয়ে দেখলাম প্রস্তুতিপর্ব পুরোদমে চলেছে। ওখানে থাকে দেখলাম সে শক্ত ধাঁচের মানুষ বলে মনে হলো। এখানে আমি রাজী হবো না বলে জামশেদপুরে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখানো হলো। ভদ্রলোক কি বললেন জানো, 'রুনিভার্সিটিতে সবারই কিছুর না কিছুর কাফ্লাভ থাকে, আমি কিছুর মনে করি না তাতে।'

উঠে বসলো সন্মিত, 'তুমি বলছো জামশেদপুরে তোমাকে বিয়ের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো!'

মাথা নাড়লো রেণু, 'হুঁ। লোকটা চাকরী করে কোলকাতায়, খুব বড় অফিসার। আমার দিকে এমন করে তাকালো যেন আমি খুব ব্যস্ত মেয়ে।'

'তুমি কেন দেখা করতে রাজী হলে?' সামনে একটা অশুভকারের ভারী পর্দা, সন্মিত দুহাতে তাকে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

'আমি বন্ধুতে পারিনি, এমনকি দাদাও আমাকে বললেন।'

'আমি তোমার বাড়িতে যাবো, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।' সোজাসুজি বললো সন্মিত। রেণু হাসলো, 'বাবাকে তুমি চেনো না। তুমিই বরং যা করার করো ফেলো। আমি আর পারছি না, যা করবে আমি তাতেই রাজী।'

‘কিন্তু আমার তো একটু সময় দরকার।’ অশ্বের মতো হাতড়ালো ও, ‘একটা চাকরী না হলে, তুমি তো সবই জানো, আমি এখনই বিয়ে করতে চাই, কিন্তু বিয়ে করে তোমাকে রাখবো কোথায়?’

‘আমি জানি না, কিছু জানি না, এসব তুমি ভাববে, আমি আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দিলাম।’ ছেলমানুষের মতো সন্মিতের বন্ধে মধু ঘষলো রেণু।

‘এত ভার দিচ্ছ, আমি তোমার কে? হাসতে চেষ্টা করলো সন্মিত। ফিস ফিস করে, গভীর নিঃশ্বাসে রেণু বললো, ‘পতি দেবতা গো।’

একমাত্র অশোক, যাকে সব বলা যায়, সন্মিত বললো। চুপচাপ শব্দে গিয়ে অশোক বললো, ‘কুছ পরোয়া নেই, তোর যদি মনে হয় রেণুকে না পেলে তুই মরে যাবি, এক কাজ কর, রেজেষ্ট্রী করে ফেল, আমি সাক্ষী দেবো।’

‘তারপর?’ সন্মিত প্রশ্ন করলো।

‘তারপর আর কি! ও পরীক্ষা দেবে, তুইও। আর ওর বাপশালা যদি নাছোড়-বান্দা হয়, বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে দেবে। আর যা হোক বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না তো।’ অশোক সিগারেট ধরালো।

‘যদি দেয়।’

‘তোদের মাইরি শুধু যদিই ধান্দা। এই যে আমি আর ঝুমা কমসে কম, বলে হেসে ফেললো, ‘নাইবা শুনলি সংখ্যাটা আমরা একবারও বলিনি যদি কিছু হয়। হলে হবে, দেখা যাবে! আমরা চাঁদা তুলবো তোর নামে, রিলিফ ফান্ড।’

বিরক্ত হলো সন্মিত, ‘এইসব সিরিয়াস ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না অশোক। তুই ব্যাপারটা বন্ধ করে পারছিস না।’

‘চা বাগানে কাজ করবি?’ হঠাৎ বলে বসলো অশোক।

‘কি কাজ?’

‘কেরানীর। কোয়ার্টার পাৰি, আরো কি কি সব।’

‘করবো।’

‘গুড। প্রেমের জন্যে কি স্যাক্রিফাইস। বেশ, চলে যা ঝুমার বাড়ি। ওর মামার দুটো চা বাগান আছে ডুয়াসে।’ ঝুমা ধরলে হয়ে যাবে।’

‘সিরিয়াসলি বলছিস!’ কল্পনার সব কিছু দেখতে পেলো সন্মিত।

‘হ্যাঁ ভাই। তোর অবশ্য পরীক্ষা দিলে লাভ হতো। তা আর কি হবে এই আমিই তো পরীক্ষা দেবো না।’

‘সে কি, কেন?’

‘তোকে বলিনি, জুলজিকাল সার্ভেতে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি, হায়দ্রাবাদে ইন্টারভিউ। কেটে পড়ছি। এম. এ. পাশ করে তো আর একটা হাত গজাবে না।’

‘বাঃ দারুণ খবর। এতক্ষণ চেপে রেখেছিলি কি বলে।’ খুব খুশি হলো

সুদৃশিত, 'তা, বিয়ে করে যাচ্ছিস নাকি।'

'ধন্য আমি বলে পালাচ্ছি একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচতে।'

'একঘেঁয়েমি?' অবাক হলো সুদৃশিত।

'একটা মেয়ের সব জানা হয়ে গেলে কান্দিন টিঁকে থাকা যায় বল। আর সেটা ঝুম্মার মনে হতে পারে। দূ-জনেই রিলিফ পাবো। ছেড়ে দে, তুই বরং চলে যা ঝুম্মার বাড়ি, আমি পদ্রুতমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে ফেলি তোর।' 'কি বলিস?'

কোন কথা বলতে পারেনি সুদৃশিত। কি সহজে অগোচর এসব কথা বলে গেলো। এতদিনের একটা সম্পর্ক বাঁ হাত নেড়ে অবহেলায় যেন সরিয়ে দিলো। ওর মনে পড়লো ডায়মণ্ডহারবারের সেই হোটেলটার কথা। প্রয়োজন কত সহজে মিটে যায় কারো কারো! রেগুদর ব্যাপারে এরকমটা ও ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলেই রক্ত হিম হয়। কেন?

তখন একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সুদৃশিতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো। চোখ বন্ধ করলেই রেগু সামনে এসে দাঁড়ায়, আর বুকের মধ্যে একটা ভয় অক্টোপাসের মতো সেই রেগুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই মদহুতে ওর মনে হচ্ছিলো কী অসহায় হয়ে মানদুশেরা বেঁচে থাকে। রাগে শূন্যে শূন্যে ও ভেবেছে রেগুকে নিয়ে কোথাও যদি চলে যাওয়া যায়। রেগু ওর থাকবে না, বুকের আড়ালে বসে রেগু চিরকাল থাকবে না, কি অসহ্য কষ্ট ঘূর্ণি'র মতো পাক খেয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হলো মেসে, 'দিন ফিন ঠিক করে ফেলোঁছি। আজ হলো শুক্রবার, সোমবার দপদুর বারোটায়া। এই কার্ড। রেগুকে আসতে বলবি ঠিক সময়।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো সুদৃশিত, বলছেটা কি? ও শুনোঁছিল অন্তত এক মাসের নোটিস দিতে হয়, আরো কি সব ফর্মালিটি আছে, অথচ অশোক দ্রুত করে দিন ঠিক করে এলো।

এক চোখ ছোট করে অশোক হাসলো, 'আমার ওপর তোর দেখাছি আস্থা ফাফা কমে গেছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আমার চেনাশুনা, এটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আর হ্যাঁ, তুইতো ঝুম্মার কাছে যাসনি। কি ব্যাপার, ভ্যানিটিতে লাগছে?'

সুদৃশিত বললো 'ভাবছি।'

হতাশ হবার ভান করলো অশোক, 'থাক আর ভাবতে হবেনা, ঝুম্মার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ও অবশ্য একটু আধটু গাইগাই ঝুম্মার ধান্দায় ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে। ওর আমার আশঙ্কি মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। ঝুম্মার কথা ফেলতে পারবে না।' দিন দশেক পরেই ভদ্রলোক কলকাতা আসছেন। সেন্টপাসেন্ট সিওর হয়ে থাকি।'

সেইদিন দপদুরে বসন্ত কেবিনের বারান্দায় বসে সুদৃশিত রেগুকে বললো, 'সোমবারে য়ুনিভার্সিটি আসছো?'

ইদানিং কেমন পম্ভীর হয়ে গিয়েছে রেণু। কথা বলার আগে কী জানি কি ভাবে, চোখ তুলে তাকালো 'কেন?'

'মাঝে মাঝে তো দেখি ডুব মারছো, তাই।' সন্মিত কথাটা বলবার জন্যে ছটফট করছিলো।

একটু হাসবার চেষ্টা করলো রেণু 'আসবো।'

'শোন, রুইনিভার্সিটিতে আসতে হবে না তোমাকে। ঠিক পোনে বারোটোর সময় তুমি ওয়েলিংটনের মোড়ে উষা কোম্পানীর দোকানটার সামনে আসবে, আমি থাকবো।' সন্মিত বললো।

'কি ব্যাপার, আবার কোথায় যাবে।' চা দিয়ে গিয়েছিলো বয়, কাপটা টেনে নিতে নিতে বললো রেণু।

'আমি চা বাগানে চাকরী নিচ্ছি। শুনছি ভালো কোয়ার্টার দেয়, নিরিবিলি নিজরন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে ঐ সোমবার ওয়েলিংটনে এসো। রেণুর চোখে চোখ রাখলো সন্মিত, 'আমরা ঐ সময় বিয়ে করবো, রাজী?'

চারের কাপটায় চুমুক দেবে বলে তুলেছিলো, আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো রেণু।

সন্মিত ওর দিকে তাকালো, চোখ বড় হয়ে গিয়েছে রেণুর। আস্তে আস্তে মৃদুতা খুঁশিতে ভরে গেলো। কোন রকমে বললো 'হাঃ।'

সন্মিত ঘাড় নাড়লো। অনেকক্ষণ চোখ সরালো না রেণু। তারপর বললো, 'এই, তুমি সত্যি কথা বলছো, বলো।'

'তিন সত্যি কেন, তিনশো সত্যি করতে পারি।' সন্মিত হাসলো, 'সব ঠিকঠাক, শুধু তুমি আসবে এইটুকু বাকী।'

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা সন্মিতের আঙ্গুলের ডগাগুলো ছুঁলো রেণু, 'চা বাগান অনেক দূরে না, আঃ, তুমি কি ভালো স্ন, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে স্ন।'

হঠাৎ সন্মিতের মনে হলো, আজ ওর বিরাট পাওয়াটা হয়ে গেলো। এখন আর কোন বাধা সামনে নেই, আর মেগগুলো আছে মেগগুলোকে বাধা বলে সে থোড়াই তোয়াক্কা করে। রেণু সঙ্গে থাকলে সে কোলকাতা জয় করে ফেলতে পারে।

'এই একটা কথা বলবে? রেণু অনেকক্ষণ পরে বললো।

'বলো।'

'তুমি পরীক্ষা দেবে না?'

'এবছর তো হবে না, পরে দেখা যাবে।' প্রসঙ্গটা ভালো লাগছিলো না সন্মিতের।

'আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে না।'

'রেণু।'

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে তাকালো রেণু। এখান থেকে মেডিকেল

কলেজের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। রেণু বললো, 'চাকরীটা তুমি কি করে পেলে? তুমি তো কোনদিন চা-গাছ দ্যাখোনি।'

হেসে ফেললো সুমিত, 'আমি তো তোমাকেও চিরকাল দেখিনি, তবু পেলাম কি করে! না, না, শোন, অশোক ঝুম্মার মামার মাধ্যমে চাকরীটা জোগাড় করেছে।'

'ঝুম্মার মামার মাধ্যমে?' চোখ তুললো রেণু।

'ভদ্রলোকের অনেক চা বাগান আছে। ঝুম্মা বললে ফেলতে পারবেন না।' বেশ বিশ্বাসে বললো সুমিত।

'অশোক বলেছে?'

'হ্যাঁ, ও তো সব জানে।'

'তার মানে তুমি এখনো এ্যাপরেস্টমেন্ট লেটার হাতে পাওনি। আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না সু।' ছোট ছোট কয়েকটা আঁচড় রেণুর কপালে ফুটে উঠলো।

'কিন্তু অশোক বলছে, ঝুম্মা কথা দিয়েছে ওকে। আর ওর মামা ঝুম্মার কথা ফেলতে পারবেন না।' মরীয়া হয়ে বোঝালো সুমিত, 'ষাদের অনেক চা বাগান আছে তাদের পক্ষে একটা চাকরী দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।'

'ভালো। আমার শৃঙ্খল ভয় হয়। আমার কপালটাই যে এরকম, সুখ একদম সতীন হয়ে আছে।' ওর কথা বলার মধ্যে এমন একটা সুর ছিলো, সুমিত কিছতেই সেটাকে মেনে নিতে পারছিলো না। অথচ রেণু যখন এই ধরনের কথা বলে ওকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হয় না। এই সময়ের রেণুকে কিছতেই চিনতে পারে না সুমিত। এই ধরনের কথাবার্তা শুনলেই কেমন ভয় হয় ওর।

'ঝুম্মার কাছে তুমি গিয়েছিলে?' রেণু আবার বললো।

'না। অশোকই যোগাযোগ করেছে।'

'ঝুম্মা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে জানো?'

এই প্রশ্নটাকেই ভয় করছিলো সুমিত। এতদিন মেলামেশার পর কত সহজে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারে না সুমিত। কিন্তু রেণুকে ও এর কী উত্তর দেবে। ভালোবাসা যদি পরস্পরকে কাছে আনার জন্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে এইভাবে বিচ্ছেদ কেন শুরতেই। এই ঘটনা কি রেণুকে প্রভাবিত করবে অন্য কোন চিন্তায় যেতে? ও অবশ্য জোর করে বলবে, সবাই অশোক বা ঝুম্মা নয়। কিংবা কোন ভুল ওরা আবিষ্কার করে সচেতন হয়েছিল। কিন্তু রেণু আবার বললো, 'ঝুম্মা এখন একটি অবাঙালী ছেলের সঙ্গে মোটরে ঘোরে সবাই বলছে, তুমি জানো?'

এটা জানতো না সুমিত। তবে অশোক ছাড়াও ঝুম্মার অনেক ছেলে বন্ধু আছে। এ খবর তো খুব পুরোন। বাস্তবিক, প্রথম প্রথম ও অবাক হতো, ভাবতো

অশোক এটাকে কি করে সহ্য করছে। কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে ক্রমশ মনে হয়েছিলো, এটা আসলে কোন ব্যাপারই নয়। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলো, মানুষ ভালোবাসলে নিশ্চয়ই আনসোস্যল হয়ে পড়বে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যদি নিজস্ব বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় তাতে হানিকর কিছু ঘটে না। ভালোবাসার মূলমন্ত্র যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, তবে যে কোন ব্যাপারেই মানিয়ে নেওয়া চলে। মনে হয়েছিলো অশোকের তুলনায় ঝুমার প্রকাশ একটু উগ্র। তা আর কি করা যাবে, হাতের পাঁচটা আঙুল তো আর সমান হয় না। ঝুমা ক্ষেত্রে তা সমান করতে গেলে বরং অসুবিধেই হতো। একটা মানুষের পাঁচটা আঙুল সমান, ভাবা যায়! সে একটা শব্দ স্বচ্ছন্দে লিখতেও পারবে না।

কিন্তু এসব কথা রেগুকে বললো না সুমিত। ঝুমা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন যে ঝুমা কোন অবাঙালী ছেলের সঙ্গে মোটরে করে ঘুরছে এটা কি অশোককে অপমান করা নয়? ছাড়াছাড়ি মানে কয়েকটা সম্পর্কের কাটান ছাড়ান? অশোক তো এমনিতে ঝুমার সঙ্গে কথা বলে, নইলে সুমিতের পক্ষে সুপারিশ করছে কি করে! সেদিক দিয়ে অশোক কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না বোঝা যায়। আর ঝুমার এই নতুন মেলামেশা কি মোটা দাগ দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিচ্ছে অশোকের সঙ্গে মেলামেশাটা আন্তরিক ছিল না? নাকি ঝুমা আর একবার চাইছে হৃদয়টাকে বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের জন্যে। অসম্মান সম্মান সব বাজে ব্যাপার।

সুমিত খুব ক্লান্ত চোখে তাকালো রেগুর দিকে, 'ছেড়ে দাও ওদের কথা। সব কিছু তো আমি বুঝতে পারি না।'

সোজাসুজি রেগু বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না, বল?'

'পাগল!' সঙ্গে সঙ্গে বললো সুমিত।

'আচ্ছা তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসো?' অনেক দূর থেকে বললো রেগু।

'কি প্রমাণ চাও?'

'আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করে এসে বলি, ক্ষমা করো, করবে।'

'আমি সেটাকে অন্যায় বলে ভাববোই না।'

'আমি যদি বলি পাঁচ বছর আমার জন্যে অপেক্ষা করো, আমি তোমার কাছে আসবো, আসবো, আসবো। তুমি অপেক্ষা করবে?'

'হ্যাঁ আমি করবো। কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন? তুমি সোমবার দুপুরে ওখানে আসবেই। আমি আর কোন রিস্ক নিতে চাই না রেগু।'

'আমি আসবো।'

রেস্টুরেন্ট থেকে নামবার সময় রেগু হঠাৎ ফিসফিস করে বললো, 'এই তোমার হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে গো।'

থমকে দাঁড়ালো সুমিত। এখন চারদিকে বেশ ভীড়। লোকজন উঠছে, নামছে। ক্রেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন রেগুকে হাতটা ধরতে দিলে কেমন

দেখাবে! ধর্মতলা পাড়ায় ফিরঙ্গী মেয়েরা কি সহজে বশুদের হাত ধরে যায়। অথচ এখানে রেগদর হাত ধরতে ওর সঙ্কেচ হচ্ছে কেন? হঠাৎ ও হাত বাড়িয়ে রেগদর নরম হাতটা মৃদুতার মধ্যে নিয়ে সোজা পায়ে চলে এলো বাইরে। একরাশ লোক সিনেমা দেখার মতো বিস্ময়ে তাকিয়েছিলো ওদের দিকে। বাইরে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য করে হাত ছাড়িয়ে রেগদর বললো, ‘এই তুমি কি করলে গো?’

সুদমিত বললো, ‘আমি সব পারি সব।’

ঠিক আধঘণ্টা আগে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে দাঁড়ালো সুদমিত। এখন বেশ রোদ উঠে গেছে। অফিস যাবার তাগিদে এসপ্লানডে যাবার গাড়িগুলোয় প্রচণ্ড ভীড় এখন। মোড়েই বাসস্টপ। বালীগঞ্জের দিক থেকে আসা বাসগুলো কিন্তু ফাঁকা। এর যে কোন একটা বাসে রেগদর এসে পড়বে। সুদমিত দেখলো ঘাড়তে এখন এগারোটা বেজে কুড়ি।

কাল সারারাত প্রায় বিনিদ্র কেটেছে ওর। অশ্রুত একটা আনন্দ মেশানো ভয়, অনিশ্চয়তায় ও ছটফট করেছে। অনেক দূরে বিহারের এক শহরে থাকা মায়ের কথা মনে হয়েছে বার বার। মা শুনলে কি বলবেন? একবার ভেবেছে মাকে সব বর্ণিয়ে চিঠি লেখে। কিন্তু সাহস হয়নি ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, সব চুকে থাক, তখন জানানো যাবে। হয়তো মা মেনে নেবেন না। কোন মা-ই নিজের সন্তানকে উপায় না থাকলে পছন্দ করে বিয়ে করতে দিতে চান না। আর ওর এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না শুনলে তো কোন কথাই নেই। একটা বয়স ছিলো যখন মায়ের মনে কণ্ট দেবার কথা ভাবনায় আসতো না। তেমন কিছুর হলে নিজেকে কী অপরাধী মনে হতো। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বটা কতদূর বেড়ে গেছে। যৌবনে এসে গেলে প্রত্যেকের নিজের নিজের ‘আয়না তৈরী হয়ে যায়। নিজের মন্থ নিজের মতো করে দেখা যায় তাতে, মায়ের আয়নায় নিজের মন্থ দেখতে হয় না আর। মায়ের দৃষ্টি বোধ হয় এখানেই।

মিনিট দশেক আগে অশোক এসে গেলো। আর সুদমিত অবাক হয়ে দেখলো, সঙ্গে ঝুমা। দারুণ সেজেছে মেয়েটা, এই সকালে মাথায় একটা গ্লান্ডফ্লোরের কান্দি গুঁজেছে। অশোকের সঙ্গে ঝুমাকে ভাবতেই পারেনি সুদমিত। ট্যাকসি থেকে নেমে ঝুমা বললো, ‘কি দেখছেন অমন করে, আজ তো অন্য লোককে দেখতে হবে, চোখ তার জন্যে বশ রাখুন।’

‘আমি ভাবতে পারিনি—’ সুদমিত বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

‘ইচ্ছে করেই চলে এলাম। বিয়ে দেখতে কোন মেয়ের খরাপ লাগে বলুন। আর সাক্ষী হিসেবে সই দিতে আমার খুব সাধ। আর আপনার আপনায় বিয়ে বলে কথা।’ বেশ জোরে জোরে বলছিলো ঝুমা। দেখলো আশেপাশের দাঁড়ানো লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখছে। লজ্জা লাগলো, ‘তোরা এগো, আমি অফিসটা দেখে এসেছি, রেগদর এলে নিয়ে যাবো।’

‘আপনার বিয়েতে কি প্রেজেন্টেশন দেবো জানেন?’ ঝুমা হাসলো।

অশোক বললো, ‘তোরা চাকরী কনফার্মড ! বরুমা প্রমাণ নিয়ে এসেছে !’

সন্মিত মাথা নিচু করলো, ‘কি বলে আপনাকে—’

অশোক বললো, ‘গড়, গড়, বেশ ফর্মালিটি চলছে। আচ্ছা, আমরা এগোচ্ছি, তুই আয়। বারোটা পাঁচ নাকি খুব শুব সময়। পাঁজিতে আছে। রেগুদর চলে আসা উচিত ছিল এতক্ষণে।’ ওরা এগিয়ে গেলো রাস্তা পার হয়ে সামনের বড় বাড়িটার দিকে।

বরুকের মধ্যে একটা আনন্দ টগবগিয়ে উঠছে। যাক্, চাকরীটা তাহলে পাওয়া গেছে। মূল্যে না বলুক, একটু শ্বিধা ছিলো সন্মিতের, যদি শেষ পর্যন্ত না হয়। এখন ও শ্বান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু রেগুদ এখনও আসছে না, কেন? একটা টু-বি বাসকে দুলতে দুলতে আসতে দেখলো ও। কিছ্র লোক নামছে। না রেগুদ নেই। বাসটাতো ফাঁকা। রেগুদ ইচ্ছে করলেই চলে আসতে পারতো। এর পরের বাসটা কতক্ষণে আসবে? ঘড়ি দেখলো সন্মিত। ঠিক পৌনে বারোটা বাজে এখন। এত দেরী করছে কেন? ওকি? খুব সাজগোজ করছে? আর একটা ডবলডেকার আসছে, না, এটা তিন নম্বর। বালীগঞ্জের বাস নয়। রেগুদ তো ট্যাক্সি করেও আসতে পারতো। আজকের দিনে একটু বেঁধিসাবী হলে ক্ষতি কি!

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলো। পায়ের তলা ঘামছে সন্মিতের। বারোটা পাঁচ মিনিট শুবসময়—রেগুদর যদি একটু আক্কেল হতো। এ খবরটা আগে ওকে জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করতো রেগুদ। সময় টময় বেশ মানে ও। শিবরাত্রির সময় পর্যন্ত উপোস করে। কিন্তু এখনো আসছে না কেন। ওর বাড়িতে ফোন নেই, থাকলে করা যেতো। অবশ্য পাশের বাড়িতে আছে, নম্বরটা দিতে চার্লি রেগুদ। যার ফোন তিনি পছন্দ করবেন না। কি যেন নাম—সন্মিত মনে করতে চেষ্টা করলো, রায়চৌধুরী—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ টাইটেলই তো। একদিন রাত হচ্ছিলো বাড়ি ফিরতে। রেগুদ ফোন করতে গিয়েছিলো এক দোকান থেকে বাড়িতে খবর দেবার জন্যে। ফোনটা ভালো ছিলো না! জোরে কথা বলতে হচ্ছিলো। ভদ্রলোক নম্বর বরুতে পারাছিলেন না, রেগুদ নাম জিজ্ঞাসা করেছিলো। তখন রায়চৌধুরী টাইটেলটা শুনতে পেয়েছিলো ও। রায়চৌধুরী, যেহেতু রেগুদের পাশের বাড়ি, নিশ্চয় বালীগঞ্জ স্টেশন রোড! একবার গাইড দেখে ফোন করবে নাকি! হাতের তালু ঘামছে এবার। সন্মিত দেখলো একটা দু নম্বর বাস আসছে। ভীড় আছে বাসটায়। হলদুদ শাড়ির আভাস দেখে সন্মিত হাসবার চেষ্টা করলো। না, ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। আড়চোখে সন্মিতাকে দেখে ব্যাগ থেকে গগলস বের করে চোখে এঁটে চলে গেলেন ওয়েলসলির দিকে। না রেগুদ এই বাসটাতোও এলো না। এখন বরুকের মধ্যে একটা শীতল ভয় চুইয়ে চুইয়ে ঢুকে পড়েছে। সন্মিত অসহায়ের মতো তাকালো। এখন রাস্তা ফাঁকা। কোথাও বাস ট্রামের চিহ্ন নেই। যেন শেষ বাস চলে গেলো এইমাত্র, সন্মিত হতাশ চোখে সামনের

বাড়িটার দিকে তাকালো। অশোকরা নিশ্চয়ই খুব অবাধ হচ্ছে। ওদের কি খুব তাড়া দিচ্ছে রেজিস্ট্রার? বারোটা পাঁচ চলে গেলে আর কি শৃঙ্খল পাওয়া যাবে না? শৃঙ্খল ফণ আবার কি—যখনই ইচ্ছে হবে তখনই সময় শূন্য। একটু সরে দাঁড়ালো সুমিত। রেণু, রেণু, রেণু। মনে মনে ডাকলো ও। ডাকার মতো ডাকলে সব পাওয়া যায়। তবু রেণু আসছে না কেন? তবে কি রেণু আসবে না। ওর মনে পড়লো সেদিন কথা বলার সময় রেণু কেমন অনামনস্ক ছিলো। রেণু ওকে অপেক্ষা করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করছিলো কেন?

খুব দ্রুত কেউ ঢাক বাজাচ্ছে বৃকের মধ্যে বসে—সুমিত মাথা নাড়লো। তারপর সামনের দোকানে ঢুকে পড়লো ও। এখান থেকে বাসস্টপ পরিষ্কার দেখা যায়। রেণু যদি আসে, ও চট করে বেরিয়ে আসতে পারবে। কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকের কাছে ফোন করতে চাইলো ও। মাথা নাড়তে গিয়ে কি ভেবে আঙ্গুল দিয়ে ফোনটা দেখিয়ে দিলেন উনি, ‘আট আনা লাগবে।’

চট করে গাইডটা খুলে ও রায়চৌধুরী বের করলো। আঃ, কোলকাতার কত রায়চৌধুরী আছে! এইতো রায়চৌধুরী—ও ঠিকানাটা দেখছিলো। রায়চৌধুরী স্টেশন রোড বালীগঞ্জ—এটাই হবে নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে ওর নজরে পড়লো ঐ একই রাস্তায় আর তিনজন রায়চৌধুরীর টেলিফোন আছে। কোনজন হবে। রেণুদের বাড়ির পাশেই যখন, ওর হঠাৎই মনে পড়লো, আর মনে পড়ে শরীর হিম হয়ে গেলো, রেণুকে কোনদিন বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করেনি সুমিত। রেণুও কোনদিন বলেনি তাকে। শূন্য জানে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামে একটা বিরাট মিষ্টির দোকানের সামনের বাড়ি ওটা।

এখন কি হবে! হঠাৎ প্রথম নম্বরটা ডায়াল করলো ও চারটের একটা তো নিশ্চয়ই হবে। রিং হচ্ছে ওদিকে। একজন ফোন ধরলো, ‘বেশ হেঁড়ে গলা। সুমিত নম্বরটা যাচাই করতে ওপাশ থেকে বললো, ‘হ্যাঁ, কাকে চাই?’

গলাটা নরম করে সুমিত বললো, ‘দেখুন খুব জরুরী দরকার, আপনার পাশের বাড়ি থেকে রেণুকে ডেকে দেবেন?’ সঙ্গে সঙ্গে একটা ধমকানি শুনলো ও, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না, না?’ কট্ করে কেটে গেলো লাইনটা। মাথা নেড়ে ফোনটায় ডায়ালিং টোন আবার ফিরিয়ে আনলো সুমিত। শ্বিতীয় নম্বরটায় ডায়াল করতে অনেকক্ষণ রিং হলো। তারপর একটি মহিলাকণ্ঠ শুলে উঠলো, ‘হে-লো-ও। খুব বিনীত গলায় সুমিত বললো, দেখুন আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার পাশের বাড়ির রেণুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘কেন রেণু?’ কণ্ঠস্বরে লবঙ্গলতিকা ভাব।

আর কোন রেণু আছে নাকি, একটু ঘাবড়ে গেলো সুমিত ‘রেণু মানে রেণু রায় রুনিভার্সিটিতে পড়ে।’

‘মুদ্র হাসির শব্দ, আপনিও কি রুনিভার্সিটিতে পড়েন?’

‘হ্যাঁ, ওকে আমার দরকার।’ তাড়াতাড়ি করছিলো সুমিত।

‘আমাকেই বলুন না, আমি দেখতে খুব খারাপ নই,’ খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো কণ্ঠ, ‘চং, সত্যি বলতো তুমি কে? তোমার গলা আমি চিনি না, না? শোন, এখনই চলে আসতে পারবে? বাড়িতে কেউ নেই, আমি একা, গ্রেট চান্স!’

ফোনটা নামিয়ে রাখলো সন্মিত। বাপস। এখন আছে আর দুটো নম্বর বাকী। এমন সময় কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ‘একটা টাকা দিন।’

সন্মিত বলতে চাইলো ‘আমার এখনো—’

বাধা দিলেন ভদ্রলোক, ‘বুঝতে পেরেছি। আমার এখান থেকে এসব ফোন আমি পছন্দ করি না। ফোনে মেয়েদের ডিসটার্ব করছেন, আবার—দিন দিন—’

ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতে টাকাটা ধরিয়ে বেরিয়ে এলো সন্মিত। এখন ওর সর্বাস্থে ঘাম জমে গেছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের কড়া রোদ কেমন বিবর্ণ লাগছে। ও দেখলো অশোক বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কাছাকাছি হতেই অশোক বললো, ‘কি হলো?’

‘বুঝতে পারছি না।’ অশোকের দিকে তাকালো না সন্মিত।

ঘাড়ি দেখলো অশোক, ‘প্রায় সাড়ে বারো বাজে। আসবে বলে মনে হয় না আর। এই মেয়েছেলে জাতটা এমনি।’

খুব দুর্বল গলায় বললো সন্মিত, ‘হয়তো অসুখ বিসুখ করেছে, কিংবা বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না—’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’ অশোক বললো, ‘আজ অবধি কোন মেয়ের বিয়ের দিন অসুখ করেছে বলে শুনেছি? মেয়েটা যা চাপা গম্ভীর প্রকৃতির, বাড়িতে নিশ্চয়ই টের পাবে না। ও মুখে বলে এক, ভাবে আর এক।’

আর একটা দক্ষিণের বাস এসে চলে গেলো। রেণু এলো না। অশোক বললো, ‘এখন কি করবি?’

‘বুঝতে পারছি না।’ খুব ক্লান্ত গলায় বললো সন্মিত। ও দেখলো ঝুমা সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে। খুব লজ্জা করছে সন্মিতের, ঝুমার সামনে ও মুখ দেখাবে কি করে।

ঝুমাকে দেখে অশোক বললো, ‘শোন, মনে হচ্ছে কোন গোলমাল হয়েছে, বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে রেণু, আমরা দেখতে যাচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও।’

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ঝুমা, ‘খুব খারাপ লাগছে সন্মিত, স্যার, আজকের দিনটা এভাবে নষ্ট হলো, যান আপনারা, আশা করি মারাত্মক কিছু হয়নি ওর।’ ঝুমার দিকে তাকালো সন্মিত, মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারছে না ও।

ঝুমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে অশোক বললো, ‘চল।’

সন্মিত ঘাড় নাড়লো, ‘না।’

‘কেন?’

‘বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হবে। রেণু চাইবে না আমরা যাই।’

‘ছাড়তো, তোর এখন অবশ্যই যাওয়া উচিত।’ এতদূর এগিয়ে এসে কোন মেয়ের

সাইট নেই এভাবে কেটে পড়ার। তোরও যদি ইচ্ছে না থাকতো তাহলে অন্য কথা হতো। তুই চল, ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেল আজই।' খুব দৃঢ় গলায় বললো অশোক।

ভয় এবং দ্বন্দ্ব থেকে মানুষের মনে এক ধরনের শক্তির জন্ম নেয়, যা তাকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার রসদ জোগায়। অশুভ এক হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্মিত সেইরকম একটা অবলম্বন খুঁজছিলো। এখন ও একবার রেগ্নকে যদি দেখতে পেতো, রেগ্ন নিশ্চয়ই বলবে কি হয়েছে, আর তাহলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। তবু সন্মিত বললো, 'ওর বাড়ির লোক খুব গোঁড়া।'

উট্টোদিকের বাস স্টপে এগিয়ে যেতে যেতে অশোক বললো, 'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে।'

বালীগঞ্জ স্টেশন রোড ধরে এগোতে এগোতে অশোক বললো, 'বাড়ির নম্বরটা পৰ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিসনি, কি প্রেম করছিস বাবা। বাবার নাক কি?'

সন্মিতের খুব সঙ্কোচ হচ্ছিলো, ব্যাপারটা নিজের কাছেই কেমন হাস্যকর মনে হচ্ছে। সত্যি তো এতদিন এসব চিন্তাও করেনি। রেগ্নর বাবা কিংবা দাদার নাম অথবা তাঁরা কি করেন—এইসব ব্যবহারিক প্রশ্ন কোনদিন তার মাথায় আসেনি। রেগ্ন যখন আসতো তখন অন্য কোন কথা মনে করার কোন উপায়ই ছিলো না। কিন্তু এখন অশোকের প্রশ্ন শুনলে মনে হলো, এই যে এর উত্তর দিতে পারছে না, খুব স্বাভাবিক ভাবেই অশোক ওদের সম্পর্কের গভীরতা সম্বন্ধে আস্থা হারাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সন্মিত বললো, 'ওসব ডিটেলস আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি ওকে। তার চেয়ে চল, ফিরে যাই, আমার ভালো লাগছে না।'

ঠিক সেই সময় অশোকের নাম ধরে একটা গলা চেঁচিয়ে ডাকলো। ওরা দেখলো মোড়েই একটা চায়ের দোকানে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাদের একজন হাত তুলে অশোককে ডাকছে। সন্মিত বললো, 'চাঁদস নাকি এ পাড়ার কাউকে?' অশোক কিছু বলার আগেই ছেলেরা বেরিয়ে এলো। রোগা, ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, চোখে চশমা আছে, অশোককে দেখে হেঁচকি করে জড়িয়ে ধরলো, 'আরে খ্যাস গদর, তুমি, এপাড়ার, আমি শালা প্রথমটায় চিনতেই পারছিলাম না।'

'বিপ্লব না?' অশোক বিস্ময় কাটিয়ে উঠলো, 'কি আশ্চর্য, তুমি এখানে।'

'বাঃ, এটাতো আমার পাড়া। বছর পাঁচেক হলো এখানে চলে এসেছি আমরা। এসো এসো চা খাবে।' প্রয়ে জোর করে ওদের রেস্টুরেন্ট ধরে নিয়ে গেলো বিপ্লব। সন্মিত দেখলো এই ভরদুপুরেও কয়েকটি ওদের বয়সী ছেলে আড্ডা মারছে দুটো টেবিল জুড়ে। ছেলেগুলোকে দেখলে বোঝাই যায় বেকার, দু-একজনের গালে মাথায় কাটা দাগ আছে। কথাবার্তাও সর্বধ্বংসীয়। সন্মিতদের আড়চোখে দেখলো ওরা। এদের সঙ্গেই বিপ্লব আড্ডা দিচ্ছিলো।

অশোক পরিচয় করিয়ে দিলো ওদের। বিপ্লব অশোকের সঙ্গে একসময়ে মেট্রোপলিটানে পড়তো। খুব ডার্নাপটে ছেলে। বিপ্লব বললো ও এখন রাতে

এম. কম. পড়ছে। দিনের বেলা চাকরীর খান্দায় আছে।

চা দিতে বলে বিপ্লব জিজ্ঞাসা করলো, 'এই দুপুরে এপাড়ার কোথায় যাচ্ছ গুরুদ্বা।' কথাটা শুনে অশোক আড়চোখে সন্মিতের দিকে তাকালো। তারপর যেন মহা স্বামেলায় পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে বললো, 'আরে আর বলো না, য়ুনিভার্সিটির ইলেকশন আসছে, তোমাদের এ পাড়ার একটি মেয়ে নমিনেশন পেয়ার সার্বমিট করে যাচ্ছে না। খোঁজ নিতে এসেছি কি ব্যাপার।'।

'আমাদের পাড়ার মেয়ে ইলেকশনে লড়ছে।' অবাক গলায় চেঁচিয়ে উঠলো বিপ্লব 'কে ভাই?'

বিপ্লবের গলা শুনে ওপাশের আড্ডাটা চুপ মেরে গেল আচমকা। সন্মিত দেখলো ওরা এদিকে তাকিয়ে আছে। অশোক আবার একি গল্প ফেঁদে বসলো, সন্মিত অস্বস্তিতে বাইরের দিকে তাকালো।

'চিনবে তুমি?' অশোক বললো।

'বাঃ চিনব না কেন? এ পাড়া থেকে মোট পাঁচটা মেয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট হিসেবে ভাবা যায় না কাউকে।' বিপ্লব চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো।

'রেন্দু, রেন্দু রায়।' অশোক চায়ে চুমুক দিলো।

সন্মিত দেখলো বিপ্লবের মুখ কেটে যাওয়া দুধের মতো হয়ে গেলো। ফিস ফিস করে ও বললো, রেন্দু? কি বলছো কি?

অশোক বললো, 'চেনো?'

বিপ্লব ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দেখলো, ওরাও শুনতে পেয়েছে। এখন কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। বিপ্লব বললো, 'হাড়ে হাড়ে।'

'কেন, মেয়ে কেমন? ডোবাবে না তো? অশোক খুব ভালো অভিনয় করতে পারে, মনে মনে সন্মিত বললো। ও এমনভাবে চা খেতে খেতে কথাটা বললো যেন কিছুই হয়নি। বিপ্লবের হাড়ে হাড়ে চেনা ব্যাপারটা সন্মিতের খারাপ লাগছিলো। ও দেখলো ওর সামনে রাখা চায়ের কাপে সর পড়ছে একটু একটু করে।

হাসতে হাসতে বিপ্লব বললো, 'কোথায় খাপ খুলেছো শিবাজী, এম্মে শলাশী। এ জিনিস কোন স্ক্রমে বাঁধানো যাবে না মাইরি। আমরা সব কষ্টে ওর হাফসোল খাওয়া মাল। অল সেকেন্ড হ্যান্ড।

অশোকও হাসলো, 'ব্যাপারটা কি?'

'দারুণ কেসিয়াস মেয়ে ভাই। কতগুলো কেস আছে ভগবান জানে। ঐ যে দেখছো কালো গেঞ্জি, ওর নাম সুন্থেন। তিন বছর ওকে গাড়িয়াহাটা মোড় থেকে এই রাস্তা অবধি হাঁটিয়ে এনেছে। স্নেহ কিছু না, ও কলেজ থেকে আসতো, নামতো গাড়িয়াহাটে। সুন্থেনবাবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওর জন্যে। তারপর

তিনি হেসে হেসে গল্প করে করে এই অবধি এসে কাটিয়ে দিতেন ওকে । সন্ধান চেষ্টা করছে রেস্টুরেন্টে ঢোকাতে, পারেনি । ভিক্টোরিয়া, লেক, সিনেমা—কোন চান্স পারানি সন্ধান ।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানিত শুনলো কালো গেঞ্জি পরা ছেলেটি চাপা গলায় কি বলে উঠতেই, আর সবাই হো হো করে হেসে উঠলো ।

হঠাৎ বিপ্লব বললো, শুনলাম রুনিভার্সিটিতেও নাকি কাউকে খুব ড্রিবল করাচ্ছে । বেচারার প্রেমের কবরে আমাদের ফুল দেওয়া থাকলো ।' আবার হো হো হাসি উঠলো রেস্টুরেন্টে । সন্ধানিতের মনে হলো ও যদি উঠে সটান বিপ্লবের নাকে একটা ঘৃষি মেরে দিতে পারতো, সন্ধানিত দেখলো অশোকের চটিপরা পা ওর পায়ের ওপর আলতো করে চাপ দিলো ।

অশোক বললো, 'এসব বাবা তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ, আমাদের চিন্তা ইলেকশন নিয়ে । মেয়েটা কোন বাড়িতে থাকে ?'

ওপাশের বেঞ্চিতে একটা ছেলে ফস করে বললো, 'ঐ যে সামনে মিষ্টির দোকান দেখছেন তার উত্তে দিকে, হলুদ বাড়ি ।'

অশোক বিপ্লবকে বললো, 'তুমি চলো আমাদের সঙ্গে ।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত পা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলো বিপ্লব, 'ভাই আমার লাইফ ইন্সুরেন্স নেই, ঐ বড়োর একটা রশদা খেলে আমি মরে যাবো । আর ওর মায়ের মৃত্যুর যা জোর ঐ রশদারও বাবা । একমাত্র ওর দাদাই যা কিছু ভুললোক । তা আমরা তো পাড়ায় দেখিই না বলতে গেলে । তুমি ওখানে ইন কর, আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি ।'

বাড়িটা একতলা, সামনে রেলিং দেওয়া রোয়াক । জানলাগুলো বন্ধ । বিপ্লব ওদের দেখিয়ে দিয়ে চলে যেতে অশোক বললো, 'ওর বাবার সঙ্গে যা বলার আমি বলবো । তুই চুপ করে থাকবি ।' সত্যি বলতে কি সন্ধানিতের এখন কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না । রেগে সম্পর্কে এই ছেলেগুলো যা বললো তা হিংসে থেকে বলা হতে পারে । তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো না সন্ধানিত । কিন্তু এখন সবার সামনে রেগের কাছে জবাবদিহি চাইতে ওর মন সায় দিচ্ছিলো না । এ ব্যাপারটা ও আলাদা করে নিজেই করতে পারতো । ওর মন বলছে, অশোককে রেগের না যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন গোপন গুরুতর কারণ আছে । হয়তো রেগে সেকথা সবার সামনে উচ্চারণ করতে পারবে না ।

কালিং বেলের বোতামে চাপ দিলো অশোক । এখন প্রায় দুটো বাজে । চার-ধারে রোদ খাঁ খাঁ করছে । সন্ধানিত দেখলো সামনের মিষ্টির দোকানে বসে দুটো ছেলে কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে । একটা বি.ম.জি.মেয়ে ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দিয়েই ভিতরে চলে গেলো তাড়াতাড়ি । সন্ধানিত শুনলো বেশ হেঁড়ে গলায় একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে ওখানে ?'

ওরা ঘরে ঢুকলো । বেশ বড় ঘর । সামনের দেওয়াল ঘেঁষে সোফা সেট ।

বাঁ দিকে একটা ডিভান পাতা। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি তার নিচে লেখা, হে ভারত ভুলিও না—। সোফায় বসে আছেন যিনি তিনিই প্রশ্নটা করেছেন। গোলগাল চেহারা, তবে বোঝাই যায় ব্যায়াম-টায়াম করতেন এককালে। পণ্ডাশের ওপরে বয়স যদিও, তবু বাইসেপগুলো দেখা যায় বেশ। লুঙ্গি পরা, খালি গা। মাথায় ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। মনে হয় মাথটা কে যেন ঘাড়ের ওপর আচমকা বসিয়ে দিয়েছে। মদুখটা গোল। ওদের দেখে চোখ ছোট হয়ে গেল ভদ্রলোকের, বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন আবার, ‘কি চাই?’

সুদৃমিত উসখুস করলো। অশোক বললো, ‘এটা, মানে এখানে কি রেগু রায় থাকেন?’

‘কোথেকে আসা হচ্ছে?’ গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেলো হঠাৎ।

‘সুদৃমিতা’সি’টি থেকে। ওকে একটু ডেকে দেবেন?’ অশোক নির্বিকার গলায় বললো। পা ছড়িয়ে বসেছিলেন ভদ্রলোক, চকিতে চটিজোড়া টেনে নিয়ে সোজা হলেন, ‘কি দরকার?’

‘দরকার আছে নিশ্চয়ই, নইলে এই দুপদুরে আসতাম না।’ অশোক হাসলো, ‘ওকে ডেকে দিন।’

‘যা দরকার আমাকে বলো। আমি ফাদার।’ গর্জন করে উঠলেন ভদ্রলোক। সুদৃমিত দেখলো ওঁর গলার নালি কাঁপছে। সুদৃমিত কিছু বলতে যাচ্ছিলো, অশোক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো, ‘সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না, তাছাড়া আপনি আমাদের সমবয়সী নন। বরং রেগুকেই ডেকে দিন।’

‘গেট আউট আই সে গেট আউট।’ গম গম করে উঠলো ঘর।’

‘তা কি হয়! এতদূর থেকে এই রোদ্দুরে আমরা তো মিছির্মিছি আসিনি। ওর যাবার কথা ছিল—।’

‘আই সি, তাহলে তুমিই সেই ডিবাচ্।’ রেজেষ্ট্রী করবে রেগুকে, দাঁড়াও আমি তোমাকে পুর্লিশে দেবো, দীপক দীপক—। চেঁচাতে লাগলেন ভদ্রলোক। ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গলা, বোধ হয় পর্দার পাশেই ছিলেন মহিলা, গলা ভেসে এলো, ‘দূর করে দাও না, চাল চুলো নেই—সাহস দেখে মরে যাই, বাড়ি বয়ে এসেছে দ্যাখো। দীপদু বাড়ি নেই।’ গলাটা শুনে সুদৃমিত অনুমান করলো বিপ্লবের কথামতো এই তাহলে রেগুর মা! অশোক বললো ‘আপনি ভুল করছেন, রেগুর সাক্ষ বন্ধুত্ব এর, আমার বন্ধু। ঠিক আছে, আপনি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইছেন না, তাহলে আপনাকেই সব বলি, শুনুন। কিন্তু বসতে বলবেন তো?’ ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ঘটে গেলো ব্যাপারটা। তীব্র মতো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো রেগু। তারপর ছুটে এসে সুদৃমিতের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলো চমকে গিয়েছিলো সুদৃমিত। অবাধ হয়ে দেখলো রেগুর চোখে জল। কাঁদলে রেগুকে এরকম সুন্দর দেখায় যে, বুকোর মধ্যে হাঁপ ধরে যায়।

লোহার রেলিং ধেরা রকে দাঁড়িয়ে বললো, ‘আমি তো তোমাকে কতবার

বলেছি, আমি খারাপ, খুব খারাপ, তবু তুমি কেন এলে, কেন ?’ রেণু কাদছিলো ।
সুদমিত বললো, ‘রেণু, তুমি কেন এলে না, রেণু ?’

‘লোকে তো কত কিছু ত্যাগ করে, আমাকেও না হয় তুমি ত্যাগ করলে ।
আমাকে তুমি ক্ষমা করো-ও ।’ ফোঁপাতে লাগলো রেণু । সুদমিত শুনলো ভিতর
থেকে রেণুর বাবা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওকে ডাকছেন । অশোক দরজায়
দাঁড়িয়ে ওকে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে । সুদমিত দেখলো সামনের মিষ্টির দোকানের
ছেলে দুটো বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁ করে ওদের দেখছে । রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে,
তাদেরও নজর এদিকে ।

সুদমিত চাপা গলায় বললো, ‘তুমি আমার সঙ্গে চলো রেণু, আমি তোমাকে কী
করে বোঝাবো—।’

ওর হাত রেণুর মন্থায় তখনো ধরা । রেণু কাঁপছিলো । ‘তুমি যাও, পায়ে
পাড়ি তোমার, যদি তুমি ভালোবাসো আমাকে, তাহলে এখন চলে যাও । আমি
তোমাকে সব জানাবো, কথা দিচ্ছি তিনটে দিন আমাকে সময় দাও, প্লিজ ।’

রেণুর বলার মধ্যে এমন একটা স্বর ছিলো সুদমিত সরে দাঁড়ালো । মিষ্টির
দোকানের সামনে জটলাটা বাড়ছে । রেণু আবার দ্রুত ফিরে গেলো ভিতরে ।
রেণু চলে যেতেই অশোক বেরিয়ে এলো, সুদমিতের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘চল ।’

রাস্তায় নামতে নামতে হঠাৎ সুদমিতের মনে হলো, রেণু এখন অনেক অনেক
দূরের মানুষ । চট করে কাছে গিয়ে কিছু দাবী করা যায় না । ভালোবাসি শব্দটা
সেই দূরত্ব অবধি পৌঁছায় না । সুদমিত শুনলো, একটা ছেলে অশোককে জিজ্ঞাসা
করছে, ‘কি হয়েছে দাদা, কেসটা কি ?’

অশোক বললো, ‘পারিবারিক ব্যাপার, ও, কিছু নয় ।’

ছেলেটা আরো কিছু বলে ঝামেলা পাকাবার তালে ছিলো । আর একজন
বললো, ‘বিপ্লবদার বন্ধু এরা ।’

উল্টো রাস্তায় হাটতে লাগলো অশোক । সুদমিত বদ্বতে পারাছিলো ও এখন
বিপ্লবদের রেষ্টুরেন্টটা এড়িয়ে যেতে চায় । খানিকটা দূরে এসে অশোক বললো,
‘এই জন্যই শালা আমি প্রেম ট্রেন করি না । ধর তস্তা মার পেরেক । তুই শালা
যদি ডায়মন্ডহারবারে ঘর ভাড়া নিতিস, তাহলে আজ আর আফগানিস্তান কিছুর
থাকতো না । মেয়েটাকে চুমু টুমু খেয়েছিস কখনো, না সেখানেও সত্যি ।’

সুদমিতের সমস্ত শরীর হঠাৎ থরথর করে উঠলো, কিছু বোঝার আগেই ওর হাত
উঠে গেলো ওপরে । প্রচণ্ড জোরে চড় মারলো অশোকের মূখে । ছিটকে সরে
গিয়ে দু’হাতে মুখ চেপে ধরল অশোক । ও এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে ওর
চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিলো । সুদমিত যে ওকে মারতে পারবে হয়তো চিন্তার
বাইরে ছিলো ওর । চড় মেরেই সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেলো সুদমিতের । ও
চোখ বন্ধ করে অন্ধকার দেখলো ।

সুদমিত শুনলো অশোক বলছে, ‘সাবাস । চল, এবার নিশ্চয়ই মদ খাবি তুই ।’

তোদের মতো দেবদাসদের পাছায় জোড়া লাথি মারতে হয় ।’

সুদামিত কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ ও দেখলো ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে । ও প্রাণপণে শক্ত হতে চাইলো । অশোক ওর মূখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বললো, ‘চল, কর্ফি হাউসে গিয়ে একটু আড্ডা মারা যাক ।’

সুদামিত এই প্রথম বদ্বতে পারলো চোখের পাতার আড়াল বড় পলকা এক বিন্দু জোর নেই ।

তিন তিনটে দিন যেমন যায়, তেমনি চলে গেলো । না, রেণুর দেখা পেলো সুদামিত । রেণু রুনিভার্সিটিতে আসছে না । ভীষণ রকম আশা করেছিলো সুদামিত, রেণু ওর কথা রাখবে । চতুর্থ দিন সকালে অশোক এলো হোস্টেলে, এসে বললো, ‘তোর রেণুর বিয়ে ।’

তিন দিন ধরে বৃকের মধ্যে কে যেন বসে ফিসফিস করে বলছিলো এরকম কিছুর হবে, এরকম কিছুর হবে । অশোকের মূখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সুদামিত । অশোক কথাটা কি ভাবে বলবে, এই নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলো, সোজাসুজি বলতে পেরে খুশী হলো, ‘একদিক দিকে দ্যাখ ভালোই হয়েছে । পড়াশুনা ছেড়ে তুই চলে যেতিস চা-বাগানে, কিন্তু সুখী হতে পারতিস কিনা সন্দেহ । রেণুর মতো অস্থির মনের মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়া যায় না, বরং আমি বলবো এটা তোরা শাপে বর ।’

অনেকক্ষণ বাদে সুদামিত কথা বললো, ‘তুই জানিলি কি করে ?’

‘আজকে আবার বিপ্লবের সঙ্গে দেখা । সকালে ফিয়ার্লি প্রেসে গিয়েছিলাম হায়দ্রাবাদের টিকিট কাটতে, ওখানে ও এসেছিলো । বললো, আমরা যেদিন যাই সেদিন নাকি পাত্রপক্ষ এসে ওকে দেখে ফিরে গেছে । তুই ভাব, দুপুরে তোরা সঙ্গে রেজিস্ট্রী করবে কথা দিয়ে তোকে অপেক্ষা করিয়েছে, আর বিকেলে সে সঙ্গে পাত্রপক্ষের সামনে বসে ‘চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে’ গিয়েছে, তুই বলতে চাস ও জানতো না ? একশোবার জানতো ! এখন বোঝ এই জাতটা কি রকম ।’ বলে উঠে দাঁড়ালো অশোক, ‘সামনের সোমবার আমি কার্টিছ ।’

সুদামিত অশোককে আবার জিজ্ঞাসা করলো, ‘বিয়েটা কবে জানিস ?’

মাথা নাড়লো অশোক, ‘না, তা বিপ্লব জানে না । আচ্ছা, আমাদের তোরা একটা ফেয়ারওয়েল দিবি না, এই যে আমি চলে যাচ্ছি, তুই তো কিছুর বলিছিস না ?’

হাসলো সুদামিত, ‘ফেয়ারওয়েল ! সেটা তো অনেককেই দিতে হয়, না ?’

‘যাচ্ছিলে । তোকে নিয়ে কিছুর হবে না । আমি কার্টিছ এখন, যাবার আগে বেশ জোর আড্ডা মারবো কিন্তু ।’

সেদিন বিকেলের ডাকে চিঠিটা পেয়ে গেলো সুদামিত । বেশ মোটা খাম । ওপরে সুন্দর করে সুদামিতের ঠিকানা লেখা । বাঁ দিকে কি লিখে কেটে দিয়েছে রেণু, কাটা অক্ষরগুলোয় কালি বুলিয়ে দিয়েছে ।

চট করে প্রথমেই একটা নদীর কথা মনে পড়ে।

য়ূনানিস্‌টি থেকে ফিরে দরজায় লেটার বাক্সে পড়ে থাকা খামটা নিয়ে সন্মিত দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। বন্ধুর মধ্যে টিপ টিপ করছে, কি লিখেছে রেণু? এখন, সব যখন শেষ, কি বাকী থাকে বলার! না সান্‌সনা কৈফিয়ৎ? কি মনে হতে দরজা বন্ধ করে দিলো ও।

খামটা খুলতেই এই সন্ধ্যাবেলার ঘর আশ্বিনের পূজো পূজো রোদ্দুরে মাখামাখি হয়ে গেলো। আশ্বে আশ্বে গ্লিস পেপারে প্রিন্ট করা ছবিটাকে সামনে ধরলো ও, রেণু ঘাড় কাৎ করে হাসছে। মাথার দুপাশে চুলের গোছা যেন পোস্টকার্ড সাইজের এই ফটোটা ধরে রাখতে পারছে না। সেই গভীর কালোর পটভূমিতে ওর ফরসা মুখখানা ঈষৎ উপরে তোলা, রেণু হাসলে ওর গজদাঁত দেখা যায়। আর কী আশ্চর্য, বড় বড় যে চোখে খুশির ঝিলিক, সে চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডাইনে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের মণির আড়াল হতে পারলো না সন্মিত। কপাল রেণুর একটু বড়, তাতে টিপ পরেছে খুব বড় করে। মুখ ওপরে করা বলে রেণুর নরম গলার সবটুকু দেখা যাচ্ছে। নিচে ছোট গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ‘এই আমি রেণু।’ চোখ বন্ধ করে ফেললো সন্মিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলে উঠলো, এই আমি রেণু। ছবিটার ভিতর থেকে অনুভূত একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে আসছে, রেণুর হাতের গন্ধ। ভীষণ চেনা। এই গন্ধ কতদিন থাকবে? মানুষ কতদিন তার সুবাস রেখে যেতে পারে স্মৃতিতে।

সঙ্গে আসা পুরনু চিঠিটা খুললো ও। চিঠিতেও সেই হাতের গন্ধ। চার ভাঁজ করা শাদা কাগজে লেখা চিঠি। না, কোন সম্বোধন নেই। ওপরের ডানদিকে গতকালের তারিখ। শুরুরতেই কি লিখে কেটে দিয়েছে রেণু। কাটা জায়গাগুলো কেটে একবারে তৃপ্তি হয়নি, বার বার কালি বুলিয়ে শেষে একটা নোকোর মতো চেহারা করে দিয়েছে। এটা ওর মজার খেলা। কিছ্র লিখতে গিয়ে ভুল হলে গেলেই ও রবীন্দ্রনাথের নকল করতো। ও কি এটা অন্যমনস্ক হয়ে করেছে? কে জানে। তারপরই দুমদাম করে শুরুর হয়ে গেলো চিঠিটা ‘আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো এতক্ষণে, দিনটা এসে গেলো বলে—’

দোতলার বারান্দার ইঁজিচেয়ারে বসে ছিলো বরেন, বরেন মুখাঙ্গী ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। চুপচাপ বসে সামনের রাস্তায় একটু আগে জ্বলে ওঠা আলোগুলো দেখাছিলো ও। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে। ষেহু ওদের ফ্ল্যাটের দক্ষিণটা খোলা, হাওয়া আসে খুব। এই বারান্দায় এমনি ভাবে বসে থাকা ওর খুব প্রিয় অভ্যাস। ইদানিং কাজের চাপ বেড়েছে অফিসে। যে পোস্টে ও কাজ করে, সেখানে এটাই স্বাভাবিক আর তা নিয়ে কোন অভিযোগ ওর নেই। চার অঙ্কের দুঘরের মাইনে ওকে মুখ দেখে দেওয়া হয়।

পায়ের শব্দ শুনেন মুখ ফেরালো বরেন। নীরেন বাইরে এলো। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখলো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো,

‘রজবিলাসবাবু আসেন নি?’

প্রথমে ঠাওর না করলেও বরেন বুঝলো প্রশ্নটা। ঘাড় নেড়ে বললো, না। নীরেন বললো, লোকটা গুড ফর নাথিং। তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? আমি একদিন টাইট করে দিতাম লোকটাকে।

বরেন হাসলো। এই কথাটা নীরেন ওকে অনেকবার শুনিয়েছে। সে রকম ইচ্ছে হলে বরেন নিজেই তো কত কি করতে পারতো। তার জন্যে নীরেনের কলেজের বন্ধুদের দরকার নেই। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি সামান্য প্রয়োগ করলেই ছেলেটি শেষ হয়ে যেতে পারে। ইদানিং নীরেন যাকে লোকটা বললো, তাকে ও ছেলেটা ভাবছে। কত আর বয়স হবে। নিঃসন্দেহে ওর থেকে ছোট হবে। অনেক ছোট। চোখ থেকে চশমা খুলে দুই আঙ্গুলে চোখের পাতা চেপে ধরলো ও। এখন সবকিছু ভেবেচিন্তে করতে হবে। তার যে বয়স, নীরেন সেখানে এলে নিশ্চয়ই এমনই করতো। প্রায় আঠারো বছরের ছোট ও। এখনো মনে পড়ে ও যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে তখনই নীরেন হলো। খুব লজ্জা লাগতো তখন বন্ধুদের বলতে পারতো না ওর ভাই হয়েছে। সেই ভাই এখন এত বড়সড়, অস্পষ্ট উত্তেজিত হয়। এই আটত্রিশ বছর বয়সে শরীর ঠিক আছে বরেনের। একটুও মেদ জমেনি, শুদ্ধ সামনের চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে এই যা। আর যেমন হয়ে থাকে, ওর মুখের ওপরে সেই ছোট ছোট রেখাগুলো এই কয়মাসে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

‘ওকে তুমি যেতে দিলে ভালো করোনি দাদা।’ নীরেন বললো।

‘আমি যেতে দিইনি, ও গিয়েছে। ওর বাবাকে আমি সম্মতি দিইনি, কিন্তু—’ এইখানটাই বিপ্রী লাগছে ওর। ও এতে আপত্তি করেছে, তা সত্ত্বেও এক প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে রেগে চলে গেল। রেগে বাবার সামনে বরেন ওকে বলেছিলো, ‘তুমি চলে যাচ্ছো এবং এটা তোমার শেষ যাওয়া হতে পারে, ভেবে দ্যাখো।’ একটাও কথা বলেনি ও, মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিলো। ওর বাবা ট্যাকসি ডেকে আনতে সোজা নেমে গেল নিচে।

নীরেন একটু উসখুস করলো। ইদানিং দাদার সঙ্গে ও সব কথা খোলাখুলি বলার সাহস পাচ্ছে। বিয়ের পর থেকে হঠাৎ দাদার সঙ্গে ব্যবধানটা কমে গেছে ওর। বাইরে ও যে সব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, দাদা তাদের কোমকালেই পছন্দ করে না। এখন সব ব্যাপারেই কেয়ার করি না একটা ভাব এসে গেছে নীরেনের মধ্যে। পাড়ায় ও এখন নেতা গোছের, বাড়িতেও সেই ভাবে একটু একটু করে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে বলে, বরেনের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলার সময় কোন সঙ্কোচ বোধ করে না ও আজকাল।

‘ওর কথা শুনে ওরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে টাটকা উদ্ধার করতে।’ নীরেন আবার বললো। বরেন তাকালো ভাই-এর দিকে, তারপর হাসলো, ‘তোর কি মনে হয় টাকার লোভ গায়ের জোরের কাছে হেরে যাবে?’

কথাটা শব্দে একটু কাঁধ নাচিয়ে নীরেন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাতেই বলে উঠলো ‘ঐ যে আসছেন। হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে না কোন ভালো খবর আছে।’ বরেন সোজা হয়ে বসলো, ‘রজবিলাস?’ নীরেন ঘাড় নাড়লো, তারপর ঘরের ভিতর চলে গেলো বোধ হয়, দরজা খুলে দিতে। নীরেনের চলে যাওয়া দেখলো বরেন। ভাই-এর এত কৌতূহল ওর ভালো লাগছে না। ওর সামনে বা ওর সঙ্গে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। কিন্তু রেগু এমন সব ব্যাপার করে বসলো, যা কারো সামনে থেকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এখন রজবিলাস আসবে, ওর সঙ্গে যদি একা কথা বলে যেত। কিন্তু বরেন দেখলো রজবিলাসকে বারান্দায় নিয়ে এলো নীরেন, এসে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে গ্যাট হয়ে বসলো।

রোয়া ওঠা টেরিলিনের সার্ট পরে রজবিলাস বাঁ হাতের কনুই-এর ওপর লাল সূতোয় বাঁধা পেতলের তাবিজ ডান হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মদুখটা ছুঁচলো, চোখ দুটো বরেনের পায়ের দিকে নামানো।

বরেন বললো, ‘বলুন।’

সঙ্গে সঙ্গে কথার ফোয়ারা ছুটলো, রজবিলাস হাত পা নেড়ে বলতে লাগলো, ঘেন বরেনের অনুমতির জন্যে চুপ মেয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, ‘কি বলবো স্যার, মেয়ে একদম ফ্ল্যাট করে দিয়েছে, হাড়গোড়গুলো যে কি করে আশু থেকে গেলো ভগবান জানে। মদুখটা যদি একবার দেখতেন, কাটা পাঁঠার মতো রক্তে মাখামাখি।’

‘কাকে মেয়েছে? কে মেয়েছে?’ নীরেন চটপট জিজ্ঞাসা করলো।

‘আমাদের পার্টি’কে। দুদিন ধরে জপিয়ে জপিয়ে কিছুতেই টোপ গেলাতে পারছি না। তা আমিও তো ছাড়ার পাত্র নই, এর চেয়ে কতবড় শক্ত কেস—। এই সেবার বালিগঞ্জ প্লেসের এক জাঁদরেল মেয়েছেলে—।’

হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিলো বরেন, ‘কাজের কথা বলুন।’

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো রজবিলাস, ‘রেফারেন্স স্যার, আপনি বুঝতে পারেন। তা আমি পার্টি’কে সকালে বলেছিলাম যে অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে দেখা করবো। সেইমতো আমি ঠিক সময়ে হাজির। দেখি মিনিট পনের বাদে উনি বেরোলেন। তারপর সোজা গভর্নমেন্ট প্লেস দিয়ে রাজভবনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু নিরিবিলাতে ধরবো বলে আমিও পেছন পেছন যেতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ঠিক নিরিবিলা নয়, আরো কয়েকজন এপাশে ওপাশে আছে। একটা ঢোক গিললো রজবিলাস। একবার ভাবলো কাল রাতে সুমিতের ঘরে যাওয়া ঢুকোছিলো তাদের কথা বলবে কিনা। তারপর নিজের মনেই মাথা নাড়লো, এতসব বললে ক্লারেন্ট ঘাবড়ে যাবে। সব কথা খুলে বলা ঠিক নয়। তারপর স্যার, আমি গন্ধটা পেলে গেলাম কেস খুব খারাপ। একবার ভাবি পার্টি’কে সাবধান করে দিই, কিন্তু স্কেপ পেলাম না আর। ওরা ওকে ঘিরে ধরলো। তবে খুব বুদ্ধিমান লোক স্যার, একদম নড়ার চেষ্টা করেনি। যা ধোলাই দিলো না। স্যার, আপার কাট,

লোয়ার কাট, পাণ্ড, এক সময় আমি বক্সিং শিখেছিলাম তো। নাইশ্টিং ফরটি এইটে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে—।’

থমকে উঠলো বরেন এবার, ‘আপনার কথা কে শুনতে চাইছে, তারপর কি হলো বলুন।’

‘বলছি স্যার, এটা একটা রেফারেন্স, হ্যাঁ উনি তো পাকা কুলের মতো টুপ করে মাটিতে খসে পড়লেন। মেরেই ফেলতো, হঠাৎ দেখি বৌদিমণির দাদা এসে আগলে রাখলেন। প্ল্যানটা বুঝলেন স্যার, প্রথমে ধোলাই তারপর প্রেম। কি বললো বুঝতে পারলাম না আমি, হাওয়াটা স্যার খচরামি করে তখন উষ্টো দিকে বইতে আরম্ভ করেছিলো। তারপর দেখি ওকে ফেলে রেখে সব হাওয়া। আমি দেখলাম এই একটা জোর সন্যোগ। দৌড়ে একটা ট্যাকসি নিয়ে ওর পাশে গিয়ে ওকে টেনে ট্যাকসিতে তুললাম। কী বলবো স্যার, এমন মেরেছে না। রুমাল কেন, গামছা দিয়েও সব রক্ত পরিষ্কার করতে পারিনি আমি।’

বরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, ‘আপনি দেখেছেন ও রেগুদর দাদা? ‘সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ালো ব্রজবিলাস, ‘একদম কারেন্ট স্যার।’

‘আপনি ওকে চিনলেন কি করে?’ বরেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলো। বিনয় মুখ নামালো ‘স্যার এটা হলো আমার ট্রেড সিক্রেট। জানতে হয়।’

নীরেন বললো ‘কি বলেছিলাম দাদা, শুরুরগুলো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। তোমাকে বললাম বৌদিকে যেতে দিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ।’

‘তারপর কি হলো?’ বরেন পায়চারি করছিলো।

‘তারপর স্যার আমি অনেক ভালো ভালো কথা বলে, ডাক্তার দেখিয়ে মেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম। এখন আমার ওপর একটু নরম স্যার। হাজার হোক, বিপদের সময় এত সেবাবদ্ধ করলাম, এমনকি ট্যাকসি ফেলার দিতে দিইনি। মনে হচ্ছে টাকার অঙ্কটা একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। মানে, আজকের এই ধোলাই-এর পর আর কোন মায়া-মমতা তো থাকার কথা নয়।’

‘আপনি নিশ্চিত যে চিঠিটা ওর কাছে আছে?’ বরেন বললো।

‘হ্যাঁ স্যার, তবে ঘরে রাখেনি। চিঠি যে ওর কাছে আছে, তা আমি মুখ দেখেই বলতে পারি।’ ব্রজবিলাস বললো।

হঠাৎ নীরেন এলো বরেনের সামনে, ‘দাদা, তুমি একবার আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও। আমি আমার পার্ট নিয়ে—।’

মাথা নাড়লো বরেন, ‘না তোমার যাবার দরকার নেই। এই পাঁচজনকে চেঁচিয়ে বলার মতো সম্মানজনক ব্যাপার নয়।’

নীরেন মুখ তুলে দাদাকে দেখলো। তারপর কি হবে আর কিছুর বললো না, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর চলে গেলো। ব্রজবিলাস বললো ‘স্যার।’

বরেন তাকালো।

‘স্যার, টাকার মাত্রাটা যদি আর এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কাজ

হয়ে যাবে।' রজবিলাস বললো।

কিন্তু চিঠিতে কি ছাইপাশ লেখা আছে না দেখে কোন কথা আমি কাউকে দেবো না। যদি মনে হয় চিঠিটা দামী, তবে না হয় এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।' বরেন বললো।

'চিঠিটা তো স্যার দামী, আপনিই বলেছেন। বোর্দিমণি তার লাইফের সব ব্যাপার-স্যাপার খুলে লিখেছেন।' রজবিলাস প্রতিবাদ করলো, আর ঐ চিঠি তো আপনাকে দেখানোর জন্যে আমার হাতে দিয়ে দেবে না, দেখতে হলে আপনাকেই যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো বরেন, 'ঠিক আছে, আপনি কথা বলুন।'

রজবিলাস আর একটু এগিয়ে এলো, 'আপনাকে একদম চিন্তা করতে হবে না, স্যার, আমি সব ব্যবস্থা করছি। আজ তাহলে চলি স্যার।'

ঘাড় নাড়লো বরেন। তারপর দেখলো রজবিলাস তাবিজ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসলো লোকটা, 'আজ অনেক খরচ হয়ে গেলো স্যার, টাকারি ভাড়া, চা—ফা—।'

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলো বরেন, 'এবার যখন আসবেন তখন ভালো খবর আনবার চেষ্টা করবেন। আপনার পেছনে অনেক ব্যয় হয়ে যাচ্ছে।'

টাকাটা হাতে নিয়ে গুলিট গুলিট বেরিয়ে গেলো রজবিলাস। এইসব কথার পিছনে কথা বলতে নেই, অনেক অভিজ্ঞতায় এটুকু জেনে গেছে ও।

রজবিলাস চলে যাবার পর বরেন চুপচাপ বসে থাকলো খানিক। ভিতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। আজকাল মা বাড়িতে আছেন কিনা বোঝা যায় না। নীরেন নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। ঠিক এই মূহুর্তে ভীষণ একলা লাগলো বরেনের। অন্ধকারে একা বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না, নিজের ঘরে চলে এলো ও।

আলো জ্বলছিলো ঘরে। চাকরীর সূত্রে পাওয়া এই কোয়ার্টারে অটেল জায়গা, ঘরগুলো কোলকাতার বলে মনে হয় না। তবে ইদানিং বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ঘরের দু'দিকে দুটো খাট পাতা। আসলে জোড়া খাটটাই খুলে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। মাঝখানে বেতের নিচুপায়ী সোফাসেট, টেবিল, তার ওপর ডিম সাইজের নীল কাঁচ পাতা। মাথার দিকে দেওয়ালের মাঝামাঝি ছোট টিউব লাইটের নিচে সেই বাঁধানো ছবিটা, বিয়ের পরদিন সকালে যেটা তোলা হয়েছিলো। পায়ে পায়ে বরেন ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ফুলের মালাটা ও খুলে রেখেছিলো সেদিন, কিন্তু কপালে পরিয়ে দেওয়া চন্দনের টিপটা এখনো ছবিতে বোঝা যায়। রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোট এমন করে চেপে আছে, হাসছে কিনা বোঝা মূশকিল। বেনারসী শাড়ির ঘোমটায় বেশ কিছু সন্দের দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বেশ বড়, পরিষ্কার চাহনি, কপালটা চওড়া আর তাতে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরা, সুন্দর। বরং ওর পাশে নিজেকে কেমন মূশকিল মনে হলো বরেনের। সত্যি

কি বেমানান ? হ্যাঁ, এছবিতে অবশ্য ওকে একটু ভারি ক্লি বলে মনে হচ্ছে, মূখ্যচোখ দেখে মনে হয় অবশ্য বয়েস হয়েছে। কিন্তু ওর মধ্যে যে স্মার্টনেস এই বয়েসেও আছে, সেটা তো চমৎকার ধরা পড়েছে ছবিটায়, একটু বেশী বয়েসেই বিয়েটা করেছে ও কিন্তু সত্যি কি বেশী বয়েস এমন ? ছত্রিশ বছর বয়েস কি খুব বেশী হলো ?

বিয়ে করবো না এমন কোন ইচ্ছে ছিলো না বরেনের। যে সময়টাকে লোকে ঠিক বিয়ের সময় বলে তখন নীরেন খুব ছোট। মনে হতো নতুন বো এসে নীরেনকে একটু বড়সড় দেখুক। তাছাড়া মাও কোনদিন উচ্চবাচ্য করেন নি বিয়ের ব্যাপারে। সাধারণত মেয়েরাই উদ্যোগী হয় এসব ব্যাপারে। কিন্তু বরেন দেখেছে মা খুবই নির্লিপ্ত। আত্মীয়স্বজনরা যখন প্রশ্ন করেছে তখন উনি বলেছেন, একদিন তো করবেই, এত তাড়াতাড়ি কিসের। অবশ্য বিয়ে না করে বেশ চলে যাচ্ছিলো ওর। চাকরীর ঝামেলায় অষ্টপ্রহর জড়িয়ে থেকে এক ধরনের সুখ পায় বরেন। রবিবারও অফিস যেতো মাঝে মাঝে। এই করতে করতে দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশে এসে ঠেকলো।

অফিসের কাজে জামশেদপুরে যাচ্ছিলো বরেন। উঠবে নটরাজ হোটেলে। সুধাময় গান্ধীলি যেচে এসে খবরটা দিলেন। ওদের অফিসের পারচেজিং-এর কর্তা সুধাময়। বরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন। সুধাময় বললেন, ওর এক ভাণ্ডারী আছে, বিউটিফুল দেখতে, বরেন যদি চায় জামশেদপুরে গিয়ে ওকে দেখতে পারে। মেয়েটিও যাচ্ছে ওখানে আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে। কোন ফর্মালিটিস নেই।

বরেন হেসে বলেছিলো, ‘বয়েস কতো ?’

সুধাময় বলেছিলো, ‘মেয়েদের আবার বয়স। পনের পেরিয়ে গেলেই ওরা যে কোন বয়েসের সঙ্গে মানিয়ে যায়। তবে আমার ভাণ্ডারীকে নেহাৎ বালিকা ভাববেন না, এম. এ. পড়ে, এবারই পরীক্ষা দেবে। লম্বা চওড়া আছে। এই সৌন্দর্য্য ওকে দেখে আমিই চিলতে পারছিলাম না।’

সেই মতো যোগাযোগ হয়েছিলো জামশেদপুরে। কাউকে বলেনি বরেন, বেশ কৌতুক লাগছিলো। দেখাই যাক্, এরকম একটা ভাব ছিলো ওর। হোটেলে এসে রেণুর আত্মীয়রাই যোগাযোগ করেছিলো। বিকেলে জুর্নালিষ্টিক ওরা আসবে, জামশেদজী টাটার স্ট্যাচুর নিচে বরেন অপেক্ষা করবে। আজকালকার মেয়ে, বিয়ের কথা চট করে বলা যায় না বলে এই ব্যবস্থা।

বরেন ইদানিং শাদা জামা আর সন্ট পরতো বাইরে যেতে। অফিসেও ওর এই পোশাক। কিন্তু সৌন্দর্য্য ধূতি পাজাবী পরলো। একটু জিজ্ঞাসা লাগছিলো প্রথমটা, কিন্তু আয়নায়ে নিজেকে দেখে বেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। ধূতি পাজাবীতে ওকে বেশ ভালোই দেখায়। ঠিক পাঁচটার সময় জুর্নালিষ্টিক পৌঁছে গেলো বরেন। বিষ্ণুপুর থেকে ট্যাকসিতে সাক্ষাৎ বেশী সময় লাগে না। তবু একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলো ও। জামশেদজী টাটার মূর্তির নিচে দাঁড়ালে পুরো জুর্নালিষ্টিক

পার্কটাকে চোখের সামনে ছবির মতো মনে হয়। ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে পার্কটা। পাহাড় কেটে সুন্দর করে সাজানো গাছগুলো। এখন বিকেলে ফোয়ারাগুলো ছেড়ে দিয়েছে প্রতিটি ধাপে। অনেক নিচে রাস্তা, আর ওপাশে লেক। লেকের মধ্যখানে একটা আকাশ-ছোঁওয়া ফোয়ারা। বরেন সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকালো। বেশ ভীড় হয়ে গেছে এখনই। সুধাময়ের নাম করে আজ যে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে পেলো না বরেন। খুব বাতাস দিচ্ছে, ধূঁতি সামলানো মূশকিল। বরেন একহাতে চুল ঠিক করলো। এমনিতেই ওর চুল বেশ ফাঁপা, সহজেই বাতাসে ওড়ে।

তারপর ওরা এসে গেলো। বেশী লোক আসেনি বলে বরেন মনে মনে ধন্যবাদ দিলো ওদের। সুধাময়ের আত্মীয় সেই ভদ্রলোক, শ্যামল না কি যেন নাম, সঙ্গে যে বিবাহিতা মহিলা, তিনি অবশ্যই ওঁর স্ত্রী, আর ওদের পেছনে যে লম্বা এবং সুন্দর মেয়েটি যাকে দেখেই বোঝা যায় গভীরতা কাকে বলে, ওরই সঙ্গে আজ আলাপ করতে হবে—বরেন মনে মনে খুঁশি হলো বয়েসের তুলনায় মেয়েটি বড় গম্ভীর। আর সেজনেই নেহাৎ পঁচকে মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি যেভাবে ঘাড় সোজা করে হেঁটে আসছে, যেভাবে কী অবহেলায় দুপাশে তাকাচ্ছে—বরেন খুঁশি হলো। এই বয়সে এসে একটি চটুল লম্বা স্বভাবের মেয়েকে বিয়ে করলে নিজেরই ক্ষতি হতো হয়তো। বরং এই মেয়েটিকে দেখেই মনে হচ্ছে এর সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু ও এতো গম্ভীর কেন? এই বয়সে?

আলাপ পরিচয় হলো। শ্যামল পরিচয় করিয়ে দিতেই রেণু হাত তুলে নমস্কার করলো। বরেন লক্ষ্য করলো হঠাৎ রেণুর ঝুঁকুটুকু উঠলো, ও চট করে শ্যামলের দিকে তাকালো। মেয়েটি এমন অনামনস্ক হয়ে যাচ্ছে কেন? কথা বলছিলো শ্যামলের স্ত্রীই বেশী। শ্যামল হুঁ হাঁ করছে। রেণু চুপ করে বসে আছে বোঁগেতে। একটু বাদে, যেমন হয় আর কি, শ্যামল পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে উটে গেলো কথা বলতে। তখন সম্ভব হবো হবো, পুরো জীবলী পার্কের আলো জেরলে দেওয়া হয়েছে। আলোগুলো জলের গা ঘেঁষে পায়ের নিচে। লাল নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো ঠিকরে বেরিয়ে এসে পার্কটাকে সুন্দর করে তুলেছে। শ্যামলের স্ত্রীই বললো, ‘বাঃ, আপনারা চুপ করে আছেন যে, কথা বলুন না।’

শ্যামলের স্ত্রী, দেখেই বোঝা যায়, ওর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা যে-কোন বয়েসের লাইসেন্স পেয়ে যায়। হাসলো বরেন, ‘আমি ঠিক এ রকম কথা বলতে অভ্যস্ত নই।’

বড় ঠোঁট কাটা মেয়ে শ্যামলের বউ। বলে বসলো, ‘প্রেম করেন নি কখনো?’ বিরক্ত হতে গিয়ে হলো না বরেন, ‘সে রকম প্রশ্ন তো আজ এখানে আমার দরকার হতো না। তাছাড়া উনি তো নিতান্তই ছেলমানুষ।’

শ্যামলের বউ বললো, ‘আপনি ছেলমানুষ বলছেন, ও কিন্তু খুব রোগে যাচ্ছে। ঋনিভার্সিটিতে ও দারুন পপুলার। দু-একজন তো পাগল হয়ে আছে ওকে প্রেম

জানাবার জন্যে । আপনার কেমন লাগছে ?’

হাসলো বরেন, ‘ছেলেমানুষী ব্যাপার সব । তা য়্‌নিভাসি’টিতে পড়তে গেলে ও রকম কাফ্‌লাভ প্রত্যেকের একটু আধটু থাকেই । এতে আমি মনে করার কিছু দেখি না । ওগুলো যারা আঁকড়ে থাকে, তারা ঠকবেই ।’ তারপর রেণু’র দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আপনি নিশ্চয়ই সেই দলে নন ?’

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রেণু চোখ ঘূঁরিয়ে নিলো, তারপর বললো, ‘কি করে বদ্বলেন ?’

‘আপনাকে আমার বদ্বিশ্মতী বলে মনে হচ্ছে । আমি কি ভুল করছি ?’ বরেন হাসলো । রেণু কোন উত্তর দিলো না ।

এরপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো ইতস্তত, তারপর শ্যামল ফিরে এলো । যাবার সময় একান্তে শ্যামল জিজ্ঞাসা করলো, ও হোটেল দেখা করবে কি না । হেসে ফেলোছিলো বরেন । বলেছিলো তার কোন দরকার নেই । স্ত্রী হিসাবে রেণুকে পেলে ওর ভালো লাগবে । ওর পূর্ণ সন্মতি থাকলো ।

হোটেল ফিরে এসে বরেন ব্যাপারটা ভেবে খুঁশি হাচ্ছিলো । এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের, আর চাপলোর হালকা ব্যাপার ওর মধ্যে না থাকায় বরেনের মনে কোন শ্বিধা নেই । তবে ব্যয়সে ছোট, অন্তত বছর পনের ষোল তো হবেই । এটাকে যদি ঘাটতি বলা যায়, তবে সেটা ও মিটিয়ে দিতে পারবে । কিন্তু কথা হলো রেণু কি জানতো ওরা জুঁবি’লি পার্কে আসছে বরেনের সঙ্গে দেখা করতে ! যদি শ্যামলের পরিকল্পনা আগে থেকে না জানতো তাহলে নিশ্চয়ই পার্কে বসে বদ্বতে পেরেছে । বরেন ভাবতে চেষ্টা করলো তখন রেণু’র ভাবভঙ্গী কেমন ছিলো ? ও যদি অপছন্দ করতো ব্যাপারটা, অথবা ওর যদি সন্মতি না থাকতো বরেনকে দেখার পর তবে কি ধরনের ব্যবহার করতো ? নাঃ, এই ধরনের মেয়েকে দেখে মনের কথা বোঝা যায় না—সেটাই যা মনুশকিল ।

কোলকাতায় ফিরে আসার পর সুধাময়কে বললো বরেন, ভালো লেগেছে । খবরটা বোধ হয় সুধাময় পেয়ে গিয়েছিলেন আগেই, বললেন, ‘কথাবার্তা হোক !’

ইঙ্গিতটা বদ্বতে পেরে বরেন বললো, ‘কথাবার্তা’র কোন দরকার নেই । আপনারা একটা দিন ঠিক করুন সেদিন আমার ভাই আর, মা একবার দেখে আসবেন । এই দেখা মানে পছন্দ করতে যাওয়া নয়—আলাপ পরিচয় করে আসা । আর বিয়েটাও তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভালো হয় ।’

নীরেনকে নিয়ে মা এক সোমবার দেখে এলেন । এদিনে মা খুব কম কথা বললেন । রাতে ফিরে এলেন বরেন জিজ্ঞাসা করলো ‘কেমন দেখলে ?’ মা প্রথমে কোন কথা বললেন না । নীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আস্তে আস্তে বললেন ‘দেখতে তো বেশ ভালোই । তবে এতো গম্ভীর হবে কেন এই ব্যয়সেই । তাছাড়া বাচ্চা হলে যা ভাবতাম য়্‌নিভাসি’টিতে পড়া মেয়েকে কেউ দেখতে এলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে—এটাও ভালো লাগলো না ।’

মাথা নাড়লো বরেন, ‘আহা, এ বাড়ির বোঁ হিসেবে কি মনে হলো?’

‘তোর যখন পছন্দ হয়েছে, আমারও মত থাকলো। তবে আমরা তো শব্দ ওকেই দেখলাম ওর সম্পর্কে ওদের পরিবার সম্পর্কে তো কোন খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, সেটা ভেবে দ্যাখ।’

‘আঃ, আমি তো ওর পরিবারকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আর মের্সেডিস যখন রুনিভার্সিটিতে পড়ে তখন শিক্ষিতা বলতেই হবে, দেখতেও সুন্দরী, হাসকা টাইপের নয়। বাস্। আর খোঁজ খবর বলতে যদি বল অন্য কোন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে কিনা বা কতখানি ছিলো, আমি তাতে কিছু মনে করি না। বিয়ের পর সে সব না থাকলেই হলো। আমার মনে হয় সে-সব চুকে বৃকে না গেলে আজকাল কেউ বিয়ে করে না।’

শেষ রাত্রে লগ্ন ছিলো। বিয়ের পর কোন কথা বলেনি রেণু। বাসর ঘরের তো ব্যাপারই ছিলো না। বসতে না বসতেই ভোর হয়ে গেলো। হাঁটুতে চিবুক রেখে রেণু বসেছিলো! কনের সাজে দেখতে দেখতে বরেনের মনে হয়েছে ওকে একটু বিশ্রাম নিতে বলা দরকার। খুব ধকল গেছে মেয়েটার ওপর দিয়ে।

কথাটা বলতেই রেণু উঠে দাঁড়ালো, যেন এটুকু শোনার জন্যে ও অপেক্ষা করছিলো। রেণু ভিতরের ঘরে চলে যাওয়ার পর বরেনের মনে হলো ঘরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেলো। শেষ রাতের বাসর জাগার ভীড় তেমন নেই, যারা ছিলো তারাও বোধ হয় জেগে থাকতে আর পারছিলো না। বরেন মনে মনে ভীষণ হতাশ হলো, ও ভেবেছিলো বিশ্রাম করতে বললে রেণু নিশ্চয়ই এখানেই শব্দ পেড়বে। শোওয়ার তো মোটামুটি ব্যবস্থা করাই আছে এখানে, কিন্তু রেণুর ভঙ্গীতে মনে হলো ও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলো এ ঘর থেকে চলে যেতে পেরে।

বাসি বিয়েটা সকাল সকাল হয়ে যাওয়ার পর এই ছবিটা তোলা হয়েছিলো। ফটোগ্রাফার ছোকরাটা ওদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রেণুকে বলেছিলো, ‘আপনি ঘাড়টা অমন শক্ত করে দাঁড়াবেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু, এদিকে তাকান, দেখুন তো, দাদা কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ গুড, একটু হাসুন, হাসুন।’ কিন্তু সেভাবে হাসেনি রেণু। এই বাঁধানো ছবিটায় রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোট এমন করে চেপে আছে, হাসছে কিনা বোঝা মুশকিল।

আসলে রেণুর এই হাসির মতো কোনো কিছুই বোঝা গেল না ওর কয় বছরে। আর গতকাল রেণু চলে যাবার পর মা ওর দিকে তাকিয়েছিলেন মৃদুখে কিছু বলেনি। এই সময় ধরে বাড়িতে এতকিছু কান্ড ঘটে গেলো, তবু মৃদু খোলেনি ওর কাছে। এখন মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা মানে নিজের অসহায়তাকে প্রকাশ করা—তা কখনো পারবে না বরেন।

মেয়েরা যৌদিন বরের সঙ্গে বাড়ি থেকে টোপের মতো দিয়ে বেরিয়ে আসে সেদিন কেঁদে ভাসায়। ঐ কান্না তাকে মনে করিয়ে দেয়, এতদিন যাকে নিজের বাড়ি বলে ভেবেছে সেটা আসলে বাপের বাড়ি। কান্নাটা এতোই স্বাভাবিক, বরেন তার জন্যে

প্রস্তুত হয়েই ছিলো। কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখলো, রেণু একফোঁটা চোখের জল ফেললো না। শব্দ ট্যাকসিতে ওঠার সময় ওর দাদা দীপক এসে যখন ওর কাঁধে হাত রাখলো তখন থর থর করে ওকে কেঁপে উঠতে দেখেছিলো বরেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত। খুব অবাক হয়েছিলো বরেন। তারপর ওর মনে হয়েছিলো, প্রিয়জন মারা গেলে অনেকে চোঁচিয়ে কাঁদে না, চোখের জল পড়ে না, গুম্ব হলে বসে থাকে। সে দৃংখটা নাকি ভয়ানক। লোকে বলে কাঁদলে বেঁচে যেতো। রেণুরও কি সেই রকম ব্যাপার? তবে এ কি রকম দৃংখ?

ফুলশয্যার খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত হয়ে গিয়েছিলো। বরেনের দুই বোন যারা বিয়ের পর বাইরে থাকে, এসেছিলো বিশ্রুতে। বোঁ দেখে তারাও খুঁশি। তবে ছোট বোন এসে বলেছিলো, ‘দাদা, বৌদি বড় গম্ভীর।’ সেই বোনেরাই সাজগোজের ভার নিয়েছিলো। এই ঘরই ছিলো ফুলশয্যার ঘর। ফুলটুল এনে খুব বাড়াবাড়ি করেছিলো ওরা। বরেন এতটা পছন্দ করেনি। ওর মনে হয়েছিলো, রেণুরও এসব পছন্দ হবে না। রাগিত্তে সবাই যখন বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছে, তখন বরেন ঘরে এলো। ওদের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্তে আড়িপাতার কথা কেউ চিন্তাও করবে না, এটা বরেন জানে। দরজা বন্ধ করে দেখলো রেণু জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওর মাথায় ঘোমটা নেই, খসে যাওয়া আঁচলটা কাঁধের ওপর আলতো করে পড়ে আছে। লাল বেনারসীতে ওকে খুব ভালো লাগলো বরেনের। আজ অবধি কোন মেয়ের, যুবতী মেয়ের শরীর স্পর্শ করেনি ও সচেতনভাবে। এবং এতদিন পরে এই ফুলশয্যার রাত্তে রেণুকে, নিজের বোঁকে পিছন থেকে দেখে হঠাৎ একটা নতুন ধরনের উত্তেজনা আবিষ্কার করলো।

কাছে গিয়ে বরেন রেণুর কাঁধে হাত রাখতেই ঘুরে দাঁড়ালো রেণু। শব্দকনো চোখের দিকে তাকালে বৃকের মধ্যে কেমন শিরশিরানি হয়। সেইরকম চোখে রেণু ওকে দেখলো, ‘আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।’

‘বলো!’ হাসতে চেষ্টা করলো বরেন। আচ্ছা বিয়ের, মানে ফুলশয্যার পর কতদিন বা কতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা ‘আপনি’ চালিয়ে যায়?

‘আপনাকে শব্দনতে হবে!’ রেণুর গলা শক্ত। ‘অবশ্যই শব্দনবো। তুমি খাটের ওপর এসে বসো।’ বরেন হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে দাঁড়ালো রেণু, ‘কথাটা এটাই। আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।’

‘কি বলছো?’ চমকে উঠলো বরেন।

‘আমি না বোঝার মতো কিছু বলছি না।’

‘কিন্তু কেন? তুমি এখন আমার স্ত্রী!’

‘স্ত্রী বলেই তার শরীরটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সব অধিকার পেয়ে গেছেন, তাই না? অবশ্য ঠিকই, এই বয়সে যখন আমার সঙ্গে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছেন তখন প্রথমে এটাই চাইবেন।’

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না বরেন। রেণু কি বলতে চাইছে? বিয়ের পর

ওর বন্ধু বাম্ববরা অনেকে স্ত্রী সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। অপরিচিতা মেয়ে স্ত্রী হবার ছাড়পত্র পেয়ে বিয়ের রাতেই শরীরের স্বাদ দিয়েছে অনেককে, আবার কাউকে কাউকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সপ্তাহখানেক। আগে মনের সায় আসুক তার পর শরীর। রেণুও কি তাই বলতে চাইছে? কিন্তু কথা বলার ভঙ্গী এরকম কেন?

‘ঠিক আছে’, বরেন বললো ‘এখন তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ ঘটেনি। সত্যি তুমিই নেহাতই ছেলেমানুষ।’

‘আপনি যা খুশি বলতে পারেন। তবে আমার কথা হলো, আপনি অথবা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করবেন না। আর আপনার সঙ্গে ঐ বিছানায় শুতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার জন্যে যদি আলাদা খাট করে দিতে পারেন তো ভালো, নইলে আমি মেঝেতেই শোবো। হিশ্ট্রিরিয়া রোগীর মতো কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো রেণু।

‘কেন?’ অনেকক্ষণ পর বললো বরেন। ছোট শব্দটা ঘরের মধ্যে একবার ঘুরপাক খেয়ে মিলিয়ে গেলেই রেণু মাথা তুললো, আপনার চাকরী, অর্থ, ব্যক্তিগত এসব পুঁজি করে আপনি সহজেই আমাকে বিয়ে করতে পেরেছেন। কিন্তু মনের দিক থেকে আপনাকে আমি নিতে পারছি না, তাই।’

‘অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার সম্মতি ছিলো না?’ বরেন ওকে দেখাছিলো। জানলার দিকে সরে গেলো রেণু। মাথা না নেড়ে না বললো।

‘তাহলে বিয়ে করলে কেন? কেন প্রতিবাদ করোনি?’

এখান থেকে রেণুর চওড়া পিঠ, ঘোমটা নেমে যাওয়া সুন্দর করে বাঁধা খোঁপা বরেন দেখতে পাচ্ছে। ক্রমশ একটা অপমানবোধ, একটা জ্বালা বরেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রশ্নটা করার সময় নিজের অজান্তেই গলাটা জোরে হয়ে গেছে। এখন নিজের কাছেই নিজেকে অসহায় বলে মনে হলো।

রেণু কোন উত্তর দিলো না। ওর পিঠ তির তির করে কাঁপছে, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকি নামানো। বরেন আবার বললো, ‘জামশেদপুরে যখন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তখন আপত্তি করোনি কেন? কেন আমার সামনে ভালোমানুষ সেজে বসেছিল?’

মুখ না ফির্সিয়ে এবার রেণু বললো, ‘আমার আপত্তির কোন দাম ছিলো না। কেউ শুনতে চায়নি।’

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঘেন রক্ত উঠে এলো বরেনের। কোন কণ্ঠ না বলে রেণুর পাশে এসে দাঁড়ালো, ‘তুমি এরকম নাটক করছো কেন?’

বরেনের শরীর ওর পাশেই এটা বৃষ্টিতে পেরেই ঘেন রেণু সরে দাঁড়াতে চাইলো। ‘আর কেউ না শুনতে চাক, জামশেদপুরেই তুমি আমাকে বলতে পারতে তুমি বিয়ে করতে চাও না। এখন, আমাকে তুমি যে কথা বলছো তা নেহাতই হয় ছেলেমানুষীয় নয় তো ন্যাকামো। আমি ন্যাকামো একদম সহ্য করতে পারি না রেণু।’

‘আমি যা সত্যি তাই বললাম। আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন।’ রেণুর কথাটা শেষ না হতে হতেই বরেন দহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো, ‘অনেক হয়েছে, আর পারছি না আমি, একটা মানুষ তার ফুলশয্যার রাতে এভাবে সহ্যশক্তির পরিচয় দিতে পারে না, তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো, রেণু?’ রেণুর শরীর নিজের বন্ধুর মধ্যে চেপে ধরে বরেন হঠাৎ কেমন নিজেকে সুখী সুখী ভাবতে চাইছিলো। এইসব কথা, রেণুর এই আচরণ নেহাতই অভিনয় এই রকম একটা কল্পনা ও করতে চাইছিলো। কিন্তু ততক্ষণে রেণু সমস্ত শরীর বেকায়ে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করছে। বরেনের গলার কাছে ওর চিবুক বার বার ঘসে যাচ্ছে, দহাতে বরেনের কাঁধ ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে ও। শেষ পর্যন্ত প্রাণপনে চিৎকার করে উঠলো রেণু ‘ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন আমাকে, ইতর অসভ্য, কামুক!’

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শক লাগলো শরীরে, বরেনের হাত শিথিল হয়ে গেলো। আর রেণু দৌড়ে একবার বন্ধ দরজার দিকে গিয়ে কি ভেবে ফিরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলো বরেন, আচমকা ওর মাথায় কোন চিন্তা কাজ করছিলো না। চোখের পাতা না ফেলে ও রেণুর ছুটে যাওয়া দেখলো। খাটের ওপর রেণুর শরীর কাঁপছে, খাটের ওপাশে বিয়েতে পাওয়া বড় সাজগোজের আয়না। বরেন হঠাৎ দেখলো আয়নাতে রেণুর মুখের একটা দিক, যা কান্নায় কাঁপছে, দেখা যাচ্ছে। আর তার পেছনে একটু দূরে দাঁড়ানো বরেন। নিজের দিকে তাকিয়ে ও চমকে উঠলো, অনেক বয়স বেড়ে গেছে যেন হঠাৎই, গিলে করা পাঞ্জাবী ধুতি পরা সঙ্গেও ওকে কি কামুক কামুক দেখাচ্ছে?

আর তারপরই বরেনের খেয়াল হলো অস্বাভাবিক চূপচাপ হয়ে গেছে বাড়িটা। এতক্ষণ যাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো তারাও যেন চূপ করে গেছে হঠাৎই। রেণুর চিৎকার নিঃসন্দেহেই সমস্ত বাড়িময় ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই শুনছে কথাগুলো, কাটা কাটা বিষাক্ত শব্দ। এখনি হয়তো দরজায় শব্দ হবে, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করবে সবাই। ফুলশয্যার রাতে নতুন বৌ যদি এইসব শব্দ ব্যবহার করে, চিৎকার করে ওঠে, তাহলে লোকে সহজেই ভাববে ও বলাৎকার করতে গিয়েছিলো। রেণুও কি তাই ভেবেছে? নীরেন, মা, এখনই বোধ হয় মা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন, ‘খোকা?’ লজ্জায় ঘেন্নায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো বরেন। তারপর দহাতে মাথা চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললো, ‘এ তুমি কি করলে রেণু, এ তুমি কি করলে, ছিঃ!’

কিন্তু কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলো না। বিষয়ে ঠাট্টার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই ঘরটাকে যেন সবাই এড়িয়ে গেলো এখন। কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎই কোন মন্ত্রে যেন সমস্ত বাড়িটা ঘুসিয়ে পড়েছে।

চূপচাপ জানলায় ফিরে গেলো বরেন। এখন অনেক রাত। রাস্তায় লোকজন নেই। এপাশের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়। বরেনের

ইচ্ছে হলো একটু ঠান্ডা হাওয়ায় গিয়ে বসে। কিন্তু ওখানেও লোকজন শূন্যে বসে থাকতে পারে। কারোর সঙ্গে মুখোমুখি এখন দেখা হওয়া—বরেন চেয়ার টেনে নিলো। সমস্ত বাড়িটাই যে বিয়েবাড়ি হয়ে আছে।

স্ত্রীর দিকে তাকালো ও। রেণুকে স্ত্রী ভাবতে এখন অস্বস্তি হচ্ছে কেন? ও কি করবে? রেণুর সঙ্গে সম্পর্কটা কিভাবে চলবে? ওর মাথায় কিছুর্তেই ঢুকছিলো না, ও এ রকম কেন করলো। আজকের যুগে কোন মেয়েকে নিশ্চয়ই জোর করে বিয়ে দেওয়া যায় না। রেণু যদি কোন ছেলেকে ভালোবাসে তাহলে কেন ওকে বিয়ে করবে? আর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে সেই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে আসা। তাহলে তো এখন বিয়ের পরেই স্ত্রী হিসেবে নিজের সম্মান আঁকড়ে ধরতে চাইবে ও। সেরকম যদি কিছুর্ত হয়ে থাকে তাহলে বরেন স্বচ্ছন্দে ওকে ক্ষমা করতে পারে। রেণু যদি বলে আমি কাউকে ভালোবাসতাম, বরেন সেটা হেসে মেনে নিতে পারে। কিন্তু এই আচরণের অর্থ নিশ্চয়ই সেই ভালোবাসার মানুষকে ও ভুলতে পারছে না। এতো স্পষ্ট করে নিজেদের সম্পর্কটা যে ভেঙ্গে ফেললো রেণু, তার পিছনে নিশ্চয়ই সেই ছেলের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক না রেখে চললে কি ছেলের ওকে কোন কিছুর আশা দিয়েছে? না নেহাতই প্রতিবাদ এটা, নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, দ্যাখো তোমাকে বিয়ে করতে পারিনি বলে আমি নিজেকেও বঞ্চিত করলাম। কিন্তু ছেলের ওকে? রুনিভার্সিটিতে পড়া চালগুলো নেই এমন কোন ব্যক্তি ছেলে।

রেণু এখন উঠে বসেছে। আধো ভাঁজ হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে আছে। চুপচাপ। কি মনে হতে উঠে দাঁড়িয় বরেন বড় আলো নির্ভয়ে দিয়ে বেড সুইচ জেরলে দিলো।

হঠাৎ রেণু মুখ তুললো, ‘আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?’

বরেন চট করে কোন কথা বলতে পারলো না। ওর ইচ্ছে হলো বলে চমৎকার, চমৎকার, এবার আমাকে হাততালি দিতে বলো! কিন্তু ও কোন কথা বললো না।

রেণু আবার বললো, ‘আপনি যদি চান বাইরের লোকের কাছে আমি আপনার স্ত্রীর মতো ব্যবহার করবো। শূন্য পাঁচ বছর আপনি আমার শরীরের দিকে তাকাবেন না। এই অনুরোধটুকু রাখুন।’

হঠাৎ বরেন বলে উঠলো, ‘পাঁচ বছর পর, আমার বয়স কতো হবে জানো? আর পাঁচ বছরের কথা উঠছে কেন?’

রেণু বললো, ‘আমি উত্তর দিতে পারবো না।’

‘তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছো, এটা বদ্ব্যপ্তি পারছো না?’ বরেন খুব অসহায়ের মতো কথা বললো, ‘তুমি বদ্ব্যপ্তি পারছো না? আমি কোন অন্যায় করিনি, তবু আমাকে এটা চাপিয়ে দিচ্ছো?’

মাথা নাড়লো রেণু ‘আমার কিছুর্ত করার নেই এখন।’

‘ছেলেটি কে?’ আস্তে আস্তে শব্দ দুটো উচ্চারণ করলো বরেন।

এই প্রশ্নটাই আশংকা করেছিলো যেন রেণু এতোক্ষণ, চট করে মাথা নাড়লো, 'আমি জানি না।'

'কি করে সে?' বরেন আবার জিজ্ঞাসা করলো।

'বলতে পারবো না।' রেণু চোখ বন্ধ করলো।

কাছে এলো বরেন, এমন একটা ছেলের জন্যে তুমি নিজের জীবন, আমার জীবন নষ্ট করছো যার কোন মেরুদণ্ড নেই, সামান্য ক্ষমতা নেই, তোমাকে ধরে রাখার? যাকে তুমি ভালোবেসেছো ভেবে এতো কাণ্ড করছো সে যে কত বড় অপদার্থ সেটা বুঝতে পারছো না?

রেণু বললো, 'আপনি চুপ করুন, আমি কোন উত্তর দিতে পারবো না।'

মরীয়া হয়ে গেলো বরেন, 'তোমাকে বলতেই হবে ছেলেরি কে?'

'আমি বলবো না।' চাপা গলায় বললো রেণু।

'বলতে তোমাকে হবেই, আমি ছাড়বো না।' রেণুর দড়টো কাঁধ দশ আঙ্গুলে আঁকড়ে ধরলো বরেন, 'কোথায় থাকে সে?'

'আমি জানি না।' দাঁতে দাঁত চাপলো রেণু।

'আমি তোমাকে আজ ছাড়বো না, তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিতে চাইছো, ছেলেরিটার নাম বলো।' থর থর করে কাঁপছিলো বরেন। ওর হাত ক্রমশ বসে যাচ্ছে রেণুর পিঠে, গলায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রেণু ছটছট করছিলো। তারপর কী ভীষণ ক্ষেদে বলে গেলো 'আপনি আমাকে মারুন, ধরুন যা ইচ্ছে করুন, আমি কিছড়ই বলতে পারবো না।' আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তে হাত উঠে গেলো বরেনের, রেণুর সরে যাওয়া মুখে প্রচণ্ড জোরে চড় মারলো ও। দড়-হাতে মদুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো রেণু 'আপনি আমাকে মারুন, মারুন।'

মুখে কেউ কিছড় বললো না, কিন্তু বরেন বুঝলো সবাই ওকে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে মুখিয়ে আছে। পরদিন সকালেই সব আত্মীয়-স্বজন চলে গেলে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেলো। ছুটি নিয়োগ ছিল ও দিন সাতকের, বাতিল করে অফিসে চলে গেলো ও! মা কিছড় বললেন না, নীরেন দুবার ওর দিকে তাকালো। রেণু নিজের ঘরেই রয়েছে। বরেন লক্ষ্য করলো নীরেন বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে গেলো না। অথচ কাল সন্ধ্যাবেলায় নীরেনকে রেণুর সঙ্গে খুঁশি হয়ে কথা বলতে দেখেছে।

দুপুরে সন্ধ্যায় এলেন ওর ঘরে। কাজে মন বসছে না, অফিসসমৃদ্ধ লোক অবাক। এমন কাজ-পাগল লোক দেখা যায় না— এমন ভাব সবার চোখে। সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে বললেন, 'কি ব্যাপার ছুটি ক্যান্সেল করলেন যে!'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে 'জবাব' হয়ে গেলো বরেনের। এই লোকটাই সব কিছুর জন্যে দায়ী। ও যদি খবর না দিতো, ঘটকালি না করতো তবে আজ ওকে এভাবে—। বরেন বললো 'দরকার হলো না।'

‘বাড়ির সবাই কি বলছে, বৌ কেমন হয়েছে ? সদ্ধাময় হাসলেন ।

মন ঠিক করে ফেললো বরেন । এ ধরনের ন্যাকামি আর ভালো লাগছে না, ‘আপনি কিছ্‌র জানতেন না ?’

‘কি ?’ সদ্ধাময় বরেনের বলার ধরনটা বদ্বতে পারছিলেন না ।

সামলে নিলো বরেন, ‘কিছ্‌র না ।’

‘কি ব্যাপার বলুন তো ! কোন গোলমাল হয়েছে নাকি ? বিয়ের দিন তো কিছ্‌র মনে হরনি । কাল তো দেখলাম বেশ ! কি হয়েছে ? সদ্ধাময় কৌতুহলী হলেন ।

‘আপাতত আমি কিছ্‌র বলতে পারছি না ! তবে ওদের বলে দেবেন শ্বিরাগমন না কি সব ফর্মালিটিস আছে, সেগ্দুলোর কোন দরকার নেই ।’ বরেন ফাইল টেনে নিলো । সদ্ধাময় কি ভাবলেন খানিক, ‘রেগ্দু তো ভালোই মেয়ে । অবশ্য আমার সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক দূরের, তবু । আমাকে যদি খুলে বলেন—’

মাথা নাড়লো বরেন ‘কিছ্‌রই বলার নেই ।’

সত্যি আর কিছ্‌র বলার থাকলো না বরেনের । পরপর কদিনে একই ব্যাপার । সেই কান্নাকাটি, কথা কাটাকাটি, রেগ্দু মাটিতে শব্দে পড়লো । বাড়িতে ফিরতেই এখন খারাপ লাগছে । মনের মধ্যে রেগ্দুর সেই ছেলোট বারবার এসে যাচ্ছে । কি করে খোঁজ পাওয়া যায় ? শেষ পর্যন্ত এক রাতে ও ক্ষেপে গেল খুব । রেগ্দুকে জোর করে ভোগ করার একটা ইচ্ছে, ওর সমস্ত সন্তাকে গুঁড়ো করে দেবার বাসনায় বলপ্রয়োগ করলো । প্রাণপণে চেঁচালো রেগ্দুর জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, বরেনের গাল থেকে ওর নখের আঁচড়ে রক্ত বেরিয়ে এলো । এমন সময় মা দরজায় এসে দাঁড়ালেন ।

এতোদিন যা ছিল ঢাকাঢাকি, এখন তা দিনের মতো পরিষ্কার বাড়ির সবাইয়ের কাছে । মা-ই আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করলেন, মুখে কিছ্‌র বললেন না । নীরেন রেগ্দুকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করতে লাগলো । দীপক নিতে এসেছিল রেগ্দুকে । সদ্ধাময় খবর দিয়েছিলেন বরেনের কথা শুনেনে । শ্বিরাগমন বাতিল করে দিলো বরেন । দীপককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলো, ‘এসব ঘটনা চেপে রেজেনার বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?’

মুখ নিচু করেছিল দীপক, উত্তর দ্যায়নি ।

ক্ষেপে গিয়েছিল বরেন, ‘উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? ছেলোটর নাম কি ?’

‘কি হবে এসব ভেবে ।’ দীপক বলেছিলো ‘ছোটখাটো ভুল যদি কেউ করে থাকে ক্ষমা করে নিন না ।’

‘ছোটখাটো ভুল ? আপনার বোন আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে, আর আপনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন ?’

ঘাড় নেড়েছিলো দীপক, ‘আমি সত্যি ওর সব কথা জানি না ।’

রেণুকে পাঠান্নি করেন। দীপককে বলে দিয়েছিলো, নিয়ে যেতে পারেন তবে আর ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই। রেণু কিছু বলার আগেই দীপক চলে গিয়েছিলো। কড়া হুকুম দিলো বরেন, রেণু বাড়ির বাইরে যাবে না, কাউকে কোন চিঠি পৰ্বন্ত লিখতে পারবে না। বাড়ির টেলিফোনে তালাচাবি দিয়ে দিলো ও। রেণুকে বললো, 'ফোন এলে তোমার ধরার দরকার নেই, মনে রেখো।'

প্রচণ্ড জ্বালায় কথাগুলো বলিছিলো বরেন। জন্দ করার জন্য ও মরীয়া হয়ে উঠেছিলো। বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকো এখন। ব্যাপারটা যেন মেনে নিয়েছিলো রেণু। বরেনের সবকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে সে। বাপের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা একবারও প্রকাশ করেনি। ওর দাদা দু'বার এসে ফিরে গেছে। রেণুই আর যেতে চার্নি। বরেনের তো সাফ কথা বলা আছে, দীপক তাই জোর করতে সাহস করেনি। অনেক রাত অবধি অফিসে কাটিয়ে বরেন যখন বাড়ি ফিরতো, তখন রেণু বলে যে একটা মেয়ে ওদের বাড়িতে আছে তা ভুলে যেতে চাইতো। কথাবার্তা তো এমনিতেই বন্ধ। ওর জন্যে যে ঘরটা দেওয়া হয়েছে সেখানেই থাকে সারাদিন। দুই আলমারি বই নিয়ে দিন কাটাতো প্রথম প্রথম, এখন সম্ভবত ঝি-কে দিয়ে পাড়ার লাইব্রেরি থেকে বই আনায়।

যে ছেলোটর জন্যে ওর এতো জেদ তাকে খুঁজে বের করতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছে বরেনের। কিন্তু নিজের কথা, পাঁচ রকম নতুন সমস্যার কথা ভেবে এই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে ও। যেমন চলছে তেমন চলুক। বাকী জীবনটা এইভাবেই দিবা কেটে যাবে। মিছিমিছি কাদা ছুঁড়ে কি লাভ। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেলো চূপচাপ। শেষ পৰ্বন্ত একদিন ঘটে গেলো ব্যাপারটা। যেন এইটে ঘটাবার জন্যে রেণু এতোদিন সব মেনে নিয়েছিলো।

দুপূরবেলা বাড়িটা যখন ফাঁকা, কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো রেণু। মা তখন নিজের ঘরে শুন্যে আছে। ঝি-কে দরজা বন্ধ করতে বলে নিচে নেমে এসেছিলো ও। ব্যাপারটা নীরেন ওকে বলিছিলো বিস্তারিতভাবে।

পাড়ার চা-য়ের দোকানে আঙা দিতে দিতে নীরেন অবাক হয়ে দেখেছিলো, রেণু হেঁটে যাচ্ছে, একা। সেই রাত্রে ঘটনার পর ও রেণুকে আর বোঁদি বলে ডাকে না। কথাই বলে না। বাড়িতে কিছু হলে ও চিৎকার করে বলতো, 'দাদার বোঁ।' ইদানিং অবশ্য তাও বলছে না।

রেণুকে দেখে ও উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। একবারে জবলো সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে দাদা নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন সাহসে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? তেমন দরকার হলে ও রেণুকে হাত ধরে হিড় হিড় করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই মেয়েছেলোটর ওখুঁ ওর কোন দরদ নেই। একজনের সঙ্গে পিরীত করে ওদের বাড়িতে এসে সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর নিজের বোঁ হলে দু'বেলা প্যাঁদাতো মেয়েছেলোটাকে। কদিন পূরনো পিরীত আঁকড়ে থাকে

দেখা যেতো তাহলে ।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলো নীরেন, হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই থমকে দাঁড়ালো । রেণু ওকে দেখতে পায়নি এখনো । মাথায় ঘোমটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ডের দিকে । কোথায় যাচ্ছে ও ? এক, বাপের বাড়ি যেতে পারে, নয় সেই প্রেমিকের কাছে । একদম হাতেনাতে ধরা যেতে পারে যদি দ্বিতীয়টা হয় ।

খানিক দূরত্ব রেখে নীরেন হাঁটতে লাগলো । বাস স্ট্যান্ডে এসে রেণু মাথার ঘোমটা খুলে ব্যাগ থেকে একটা কালো চশমা বের করে চোখে এঁটে নিলো । নীরেন রিকশা স্ট্যান্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখলো, রেণু ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে । এখন দূরত্ববেলা । তাই স্ট্যান্ডে লোকজন কম । আর এই সময়টায় বাসও কম চলাচল করে ! দূরে কোন বাস দেখতে পেলো না নীরেন । পাশেই একটা ওষুধের দোকান । নীরেন চট করে ভিতরে ঢুকে গেলো । এখান থেকে রেণুকে দেখা যাচ্ছে । দোকানদার চেনাশোনা, আটআনা পরসাদা দিয়ে নীরেন বরেনের অফিসে ফোন করলো । নীরেনের গলা শুনে বরেন অবাক হলো, ‘কিরে কি ব্যাপার !’

‘তুমি এখনই বাড়ি চলে এসো ।’ নীরেন তাড়াতাড়ি করছিলো ।

‘কি হয়েছে ?’ বরেন বুঝতে পারছিলো না ।

‘উনি বেরিয়েছেন একা একা । বোধ হয় কারোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন । আমি সঙ্গে যাচ্ছি বুঝতে পারছেন না, ঐ যে বাস আসছে, তুমি এখনি এসো, ছাড়ছি । উত্তেজিত ভাবে কথাগুলো বলে নীরেন ফোনটা ছেড়ে দিলো ।

রেণু ততক্ষণে বাসে উঠে পড়েছে, প্রথম দরজা দিয়ে ।’ প্রায় চলন্ত বাসের দ্বিতীয় দরজায় উঠে পড়লো নীরেন । ভাগ্যিস বাসটায় বেশ ভীড়, রেণুর চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই । দরজার কাছে সের্টে থেকে নীরেন রাস্তা দেখতে লাগলো । কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে একটু মূশকিলে পড়ে গেলো, একদম ধর্মতলার টিকিট কাটলো ও । এর মধ্যেই রেণুকে নামতে হবে নিশ্চয় । প্রত্যেকটা স্টপেজে বাস দাঁড়ালো ও ঝুঁকে পড়ে দেখাছিলো রেণু নামছে কিনা । মহাজাতি সদনের কাছে বাস থামতেই শেষ পর্যন্ত রেণুকে নামতে দেখলো । এদিকে ওর বাপের বাড়ি নয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই কেণ্ট ঠাকুরের কাছেই যাচ্ছে । তড়াক করে ল্যাফলে নামলো নীরেন । বাসটা চলে যেতেই বিব্রত হয়ে পড়লো ও । এখানে কোন আড়াল নেই । যদিও রেণু সামনে হাঁটছে, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেই তাকে দেখতে পেলো যাবে । পলে আর কি হবে, এগিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এই যা । তার মানে কেণ্ট ঠাকুরকে আর ধরা যাবে না । দূরত্বটা বাড়তে লাগলো নীরেন । তারপর হঠাৎ ও চমকে দেখলো, হাত বাড়িয়ে রেণু একটা ট্যাক্সি থামালো । ব্যাপারটা বুঝবার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে । দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরবে ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সিটা চলে গেলো বাদিকে । হতাশ চোখে ব্যাপারটা দেখলো নীরেন । ওর পকেটে বেশ টাকা নেই এখন, ট্যাক্সিতে চেপে ফলো করা অসম্ভব । রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে নীরেন ঠোট

কামড়াতে লাগলো ।

দরজা খুলে বরেন দেখলো রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে । ও যে এত তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে বোধ হয় ভাবতে পারেনি রেণু । বরেন দেখলো রেণুর মূখে গলায় ঘাম । যদিও এখন ভয় পেয়েছে তবু চোখ দুটোতে ক্রোশ করি না ভাব । আজ দুপুরে নীরেনের ফোন পেয়ে প্রথমে ভাই-এর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলো ও । মনে হয়েছিলো নীরেন যেন বেশী রকমের বাড়াবাড়ি করছে । ও ভুলে গিয়েছে, বরেনের থেকে বয়েসে ও অনেক ছোট এবং রেণু বরেনের স্ত্রী । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলো, নীরেন যেটা করেছে সেটা অপব্যয়সী উত্তেজনায় করেছে, কিন্তু রেণু কেন যাবে তার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও । খানিক আগে নীরেন ফিরে এসেছে । রেণু নাকি টের পেয়েছিলো যে নীরেন ওকে ফলো করছে, তাই পাকা ক্রিমিনালের মতো নীরেনকে এড়াতে চট করে বাস থেকে নেমে ট্যাকসি ধরেছিলো । এটা থেকেই বোঝা যায়, রেণু এমন কোন কাজ করতে যাচ্ছিলো যা সে চাইছিলো না নীরেন বা আর কেউ জানুক । আর এই সময় বরেনের চোখে পড়লো রেণুর হাতে শাঁখা নেই । প্রথম যখন বাড়িতে এলো, তখন মা ওর সামনে রেণুকে বলছিলেন, ‘আজকাল তো মেয়েরা শাঁখা পরতে চায় না দেখেছি, কিন্তু তুমি তা করো না । এটা একটা গল্পনার মতো, দেখতেও বেশ ভালো লাগে । তাছাড়া এবাড়ির এটাই নিয়ম ।’

মাথা গরম হয়ে গেলো বরেনের । এতক্ষণ ভেবেছিলো খুব ভদ্রভাবে মেজাজ ঠান্ডা রেখে রেণুর সঙ্গে কথা বলবে । কিন্তু রেণুর হাতের ওপর চোখ রেখে ও চিৎকার করে উঠলো ‘কোথায় গিয়েছিলে ?’

এখন বিকেল । আশেপাশের ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দায় মেয়েরা বাচ্চারা বসে আছে । রেণু তখন বাইরে দাঁড়িয়ে, মাথাটা নীচু করলো ।

‘আমি জানতে চাই, কোথায় গিয়েছিলে ?’ বরেন আবার বললো, ‘তোমাকে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বেরোও, এতো সাহস ।’

রেণু কোন কথা বললো না । যেন ওর কানে কোন কথাই ঢুকছে না । বরেন দেখলো, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে । রাগে ওর শরীর জ্বলে গেলো, হাত বাড়িয়ে ও রেণুকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল । রেণুর হাত এখনো বরেনের মস্তকের মধ্যে থরা, ‘কোথায় গিয়েছিলে ?’ চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করলো বরেন । অবাক হয়ে তাকালো রেণু, যেন বরেনের এই গলার স্বরে ওকে বদ্বতে পারছে না ।

‘কাজ ছিলো ।’ শেষ পর্যন্ত রেণু বললো ।

‘কি কাজ ?’

‘ব্যক্তিগত ।’

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের উল্টোপিঠে চড় মারলো বরেন । সটান গিয়ে গালে লাগলো হাতটা, ছিটকে পড়তে গিয়ে রেণু পড়লো না, ওর হাত তখনো বরেনের ডান হাতের মৃঠায় থরা ।

‘তুমি আমার স্ত্রী। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু থাকতে পারে না। যার কাছে গিয়েছিলে তার নাম বলে!’

অশ্রুতভাবে হাসলো রেণু, ‘আমি অক্ষম। নিজের স্ত্রী পরিচর দিয়ে দাবী জানাচ্ছেন, আবার হাত তুলতেও পারছেন তার গায়ে, বাঃ।

রেণুর এই হাসিটা আরো জ্বালা ধরিয়ে দিলো ওর মনে। এলোপাথাড়ি চড় মারতে লাগলো ও; তোমার মতো বেশ্যার গায়ে হাত তুললে কোন অপরাধ হয় না, এটা জেনে রাখো রাখো রাখো।’

শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো রেণু। কান্না মেশানো ‘ও মাগো’ শব্দ দুটো বোধ হয় আশেপাশের সব ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলো। হাঁপিয়ে পড়েছিলো বরেন, চেয়ে দেখলো মা দরজায় দাঁড়িয়ে। বরেন তাকালো মায়ের দিকে। রেণু হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পাশেই মেঝেতে ওর ব্যাগ পড়ে। ব্যাগের মুখটা খোলা। চুলের কাঁটা, পাউডারের কোটো, একটা ছোট পাস’ আর দুটো শাদা শাঁখা বেরিয়ে এসেছে ব্যাগ থেকে। নিচু হয়ে শাখা দুটো তুলে নিলো বরেন, ‘এগুলো হাতে পরে যাওনি কেন? তার সেন্টিমেন্টে লাগবে বলে?’

ফর্দিয়ে ফর্দিয়ে কাঁদছিলো রেণু। চোখ তুলে শাঁখা দুটো দেখে মাথা নিচু করলো আবার, ‘আপনার মাকে অসম্মান করা হতো।’

পাগলের মতো বলে ফেললো বরেন, ‘দ্যাখো মা দ্যাখো, তোমাদের বাড়ির বৌ তোমাকে কত সম্মান করে! তার মানে তুমি স্বীকার করছো তুমি সেই ছেলেটির কাছে গিয়েছিলে! বলতে বলতে আবার ছুটে যাচ্ছিলো বরেন রেণুর দিকে, হঠাৎ মায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো ও। মা বললেন ‘খোকা!’ শব্দটার মধ্যে এমন কিছু ছিলো, বরেন মুখ ফিরিয়ে তাকালো, কিন্তু ততক্ষণে মা ভিতরে চলে যাচ্ছেন আবার। মায়ের এই উপস্থিতি, কিছু না বলে সব দেখা, তারপর ওর নাম ধরে চাপা ডাক—বরেন কেমন অসহায়ের মতো শূন্য দরজার দিকে তাকালো। তারপর কোন কথা না বলে ও নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো। ভিতরের বারান্দায় নীরেন দাঁড়িয়ে আছে তখন, বরেন দেখলো নীরেনের মুখটা বেশ তৃপ্ত। চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো বরেন ভাইকে, তারপর হঠাৎই নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলো। ওর মনে হলো এখন আর কিছু করার নেই, কিছু না।

এখন রেণুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। বলে দেওয়া যায় ওকে আর দরকার নেই। কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? জিজ্ঞাস্য যদি পাঠিয়ে দেবার পরে রেণু বলে ওর পেটে সন্তান এসেছে আর তার পিতা বরেন, তাহলে ও কি করবে? যার জন্যে রেণু মুখ বঁজে মার খাচ্ছে, নিজের এবং বরেনের ভবিষ্যৎ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে বাধ্য হতে, তার জন্যে এবং তার সঙ্গে রেণু যা খুঁশি তাই করতে পারে। আর বাপের বাড়ি যাবার পথতো ও পুরোন প্রেম নতুন করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। এবং হয়তো বলা যায় না, তার ফলভোগ করতে হবে বরেনকে! আর এক হয় বিচ্ছেদের জন্যে আদালতে যাওয়া। সেখানে কি

প্রমাণ দেবে নিজের পক্ষে। বলবে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী, কিন্তু মদুখের কথাই তো সব নয়। রেগু যদি আদালতে আপত্তি না জানায়, তাহলে ভরতুকির ব্যাপার আছে। যদিও রেগু বিয়ে না করবে তবুও ওকে মোটা খরচ দিয়ে যেতেই হবে নিশ্চয়ই। শুধু প্রমাণ চাই এখন। ওকে ভ্রষ্টা প্রমাণ করার রসদ দরকার। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এখানেই চোখে চোখে থাক। আর তখনি ওর মনে পড়ে গেলো বোসদার কথা। বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন এককালে। রিটায়ার করে এখন একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খুলেছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া ভালো কেস বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, একদিন দেখা হতেই আফশোষ করে বলেছিলেন। বোসদাকে তার দিলে কেমন হয়! যদি কিছু খরচাপাতি হয় হোক। অন্তত সারাজীবন (যতদিন না রেগু বিয়ে করে বা মারা যায়) ততদিন তো টাকা দিয়ে যেতে হবে না। আর সে টাকার যা যোগফল তা ভাবাও যায় না। রেগু কি ডিভোর্স পেয়ে গেলেই বিয়ে করবে? তখন যদি সেই ছেলোটিকে কেটে পড়ে? তাহলে তো সর্বনাশ। চিরকাল কাঁধে বোঝা নিয়ে চলা। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদ মানে লোক জানাজানি, সবাই বলবে বড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাওয়ার ফলভোগ করতে হলো। আর বিচ্ছেদ চাইলেই তো পাওয়া যাবে না। যতদূর মনে হয়, তার জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে কতকগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। উপায় না থাকলে তা করতেই হবে। কি করা যাবে। আর একটা উপায় হলো—সমস্ত শরীর শির শির করে উঠলো বরেনের। ঠান্ডা মাথায় ও কি করে রেগুকে খুন করবে? খুন করে যদি ধরা না পড়ে তাহলে বিনা কামেলায় মৃত্যু পেয়ে যেতে পারে ও! আমি আমার বোকে খুন করবো—ভাবতে গিয়েই মনে মনে বলে ফেললো, অসম্ভব। ওর এতো দিনের শিক্ষা, রুচি ওকে কি করে খুন করতে সাহায্য করবে। অবশ্য রেগুর ওপর কোন দয়ামায়া আর নেই ওর। হাত থেকে শাখা খুলে নিয়ে রেগু গিয়েছিলো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। রাগে আবার জ্বলুনি ধরলো বরেনের। ঠিক আছে, আগে বোসদার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক, বোসদা যদি কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারেন, তাহলে তো হয়েই গেল। হঠাৎ ওর মনে পড়লো গ্র্যান্ড হোটেলের তলায় ইংরেজী বই-এর দোকানে ডিসপ্লে করা একটা বই দেখেছিলো কদিন আগে। মলাটটা খুব সুন্দর। বইটার নাম ‘পয়েজড ফর দ্য কিল’। একবার পড়তে হবে বইটা মনে মনে ভাবলো বরেন।

বোসদার নতুন অফিস লর্ড সিনহা রোডে। লাগের ফাঁকে এক দুপুরে গিয়ে সব খুলে বললো বরেন। অসবার আগে ও অনেক চিন্তা করেছে। এসব কথা, নিজের অসহায়তার কথা চট করে আর একজনকে বলার জন্যে সতর্ক হচ্ছিলো ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে নিয়েছে, না বলাই ভালো। ডাক্তার এবং গোয়েন্দার কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই। বোসদার অফিস বেশ ছিমছাম। লম্বা চুরট মদুখে রেখে বোসদা সব শুনলেন। বরেন ভেবেছিলো হয়তো বোসদা মদুখ প্রকাশ করবেন। তা না করে সরাসরি কাজের কথায় এসে গেলেন বলে মনে মনে হাঁফ

ছাড়লো বরেন ।

বোসদা বললেন, ‘যদি কোন ছেলে এর পেছনে থাকে তবে যে সে স্নানভাসি’টিতেই পড়তো এটা মনে করার কি কারণ আছে ? একটি মেয়ে তার উনিশ কুড়ি বছর অবধি তো নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কাটিয়েছে । আর সেরকম জেদের কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে দীর্ঘকালের জানশোনা ।’

বরেন চট করে কিছু বললো না । এটাও তো হতে পারে । রেগদর কোন বাল্য প্রেমিক থাকতে পারে । দ্ব-এক বছরের স্নানভাসি’টিতে জানাশুনায় কোনো মেয়ে কি এতোটা রিস্ক নিতে পারে ? বরেন মাথা নাড়লো ।

‘আমার মনে হয় আরো পাঁচ ছয় বছর আগের থেকে খোঁজ করা দরকার । তেমন যদি কোন ব্যর্থ-প্রেমিক থেকে থাকে, তবে প্রমাণ ট্রমান হয়তো পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু মদুখাজী, মদুশকিলের ব্যাপার হলো আমার যে তিনজন এজেন্ট আছে তারা ভীষণ ব্যস্ত । এখন ওদের দিয়ে নতুন কাজ করাতেই পারবো না । মাসখানেক পরে হলে হয় না ?’

বরেন বললো, ‘আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করা যায়— ।

আরো একমাস অপেক্ষা করতে ভালো লাগছিলো না বরেনের ।

চোখ বন্ধ করে কিছু চিন্তা করে নিলেন বোসদা, ‘এক কাজ করুন । মাঝে মাঝে আমি বাইরের কিছু লোককে দিয়ে কাজ করাই । আমি একটি লোককে জানি, সে এসব ঘরোয়া ব্যাপারে এফিসিয়েন্ট । একটু বাজে বকে তবে দারুণ কাজের । কাছিমের মতো গোঁ, কাজ হাসিল করবেই । আমি ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো ।’

চেষ্টার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বরেন, ‘ঠিক আছে, আপনি ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন । আর হ্যাঁ, কি রকম খরচ লাগবে যদি জানতাম ।’

হেসে ফেললেন বোস, ‘আমার এজেন্সি মারফৎ কাজ করলে অনেক পড়বে । কিন্তু আপনি আমার পরিচিত আর এই লোকটিও আমার এজেন্সির নয় । তাই সরাসরি ওকেই দেবেন কাজ হয়ে গেলে । শ’দুয়েক দিলেই হবে ।’

শেয়ার বাজারের দালাল, বিয়ের ঘটক, সরস্বতী পুজোর পুরুত অথবা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার রজবিলাসকে দেখলে এর যে কোন একটা ছবিয়া যায় । প্রথম দর্শনে ভরসা পায়নি বরেন । কিন্তু বোসদা এখন পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ফালতু হবে না । তাছাড়া লোকটা নতুন কিছু জিজ্ঞাসা করলো না ওকে, সবই যেন জেনে বসে আছে বোসদার কাছে । রেগদুর ঠিকানা নিয়ে চলে গেলো । বললো, ‘নিশ্চিত থাকুন কাজ হবেই আগে কাজ তবে পুরস্কা । শুধু মাঝে মাঝে একটু খরচ যদি কিছু হয়— ।’ হাতের তাবিজ ধরেছিলো লোকটা ।

রজবিলাস প্রথম দিন যে খবর নিয়ে এলো তাতে অবাক হয়ে গেলেও একটু মুষড়ে পড়লো বরেন । কি করে খবর পেয়েছে কিছুতেই বলছে না, বলে ট্রেড সিক্রেট, সোর্স বলতে নেই । কিন্তু মদুশকিল হলো এই ভদ্রলোক এখন বিবাহিত, একটি

ছেলের বাবা। রজবিলাস হলপ করে বললো, ‘আমি স্যার সিওর ওর সঙ্গে উনি, মনে মনে, বন্ধুতেই পারছেন, গাড়িতে করে বেড়াতে যেতেন এখানে ওখানে। পাইলট অফিসার, তবে ইদানিং খুব অসুস্থ মালফাল খেয়ে লিভারের কিছু বাকী রাখেন নি আর। তবে স্যার উনি যে লাস্ট ছয় মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছেন। একদম বাইরে বেরোন না। এটাই যে মর্শকিল।’

রজবিলাস চলে গেলো আরো খবর আনতে। কি খেয়াল হলো, রেগ্নর ঘরে এলো বরেন। ইদানিং ও এই ঘরেই থাকে। দুই আলমারী বোঝাই বই এখন ওর সঙ্গী। রেগ্ন তাকাতেই বরেন বললো, ‘বিভূতিবাবু, এসেছিলেন।’

রেগ্নর মুখ দেখে মনে হলো ও বন্ধুতে পারছে না কথাটা বরেন আবার বললো, ‘বিভূতি গান্ধী। পাইলট। চিনতে পারো?’

একটু চমকে গেল যেন রেগ্ন। তারপর মুখ নামিয়ে নিলো।

‘অনেক কথা বললো।’ বরেন খোঁচাতে চাইলো।

‘ভালোই তো।’ বরেনের মনে হলো রেগ্ন যেন হাসছে। ও যে মিথ্যে কথা বলছে তা যেন রেগ্ন বন্ধুতে পারছে। অথবা বিভূতি গান্ধীকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না রেগ্ন। নিশ্চিত বসে আছে। অথচ এর সঙ্গে রেগ্ন ঘুরে বেড়াতো কেন? নিশ্চয়ই একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো ওদের। সেই সম্পর্কটা এতদিন কি বাঁচিয়ে রেখেছে। রজবিলাস বলেছে লোকটা গত ছয় মাস বাড়িতে আছে তাছাড়া, বাচ্চা বোঁ সমেত একটা লোকের জন্যে কোন মেয়ে বিবাহিত জীবন নষ্ট করে না এইভাবে।

কয়েকদিন পর আবার এসে হাজির রজবিলাস। ও আসতো একটু রাত করে। বাইরের বারান্দায় বসে দরজা ভেজিয়ে দিতো বরেন। রজবিলাস এসে তাবিজ আঁকড়ে দাঁড়ালো, ‘স্যার একটু মর্শকিল হয়ে গেছে যে!’

‘কি হলো?’ বরেন খুব উৎসুক।

‘পাইলটের সঙ্গে তো ইদানিং কোন যোগাযোগ পেলাম না। তবে স্যার, পাইলট ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কাল আগেই কাটান ছাড়ান হয়ে গিয়েছিলো নিশ্চয়ই।’ রজবিলাস উসখুস করছিলো।

‘কি করে বুঝলেন?’

‘নাহলে ঐ সময়ের পরই একজন অধ্যাপকের সঙ্গে নাকি ওর অনেক ইয়ে টিয়ে ছিলো।’ রজবিলাস বলে ফেললো।

সোজা হয়ে বসলো বরেন। অধ্যাপক! এটাই ঠিক হতে পারে। রেগ্নর মেটালিটির সঙ্গে একজন অধ্যাপককে খুব মানিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক বলতে তো চট করে ইচ্ছাকৃত বা স্বভাবজ গম্ভীর, অনেক গুঁড়ানো করে নিজের রুচিবোধ শানিয়ে নেওয়া এক শ্রেণীর মানুষকে মনে পড়ে যায়, যাঁরা কতকগুলো শাসনের প্রাচীরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। তবে ইদানিং এইসব সংজ্ঞা পাশেট যাচ্ছে দ্রুত। এখন এই অধ্যাপকটি কোন শ্রেণীর? রেগ্ন যখন—।

মাথা নাড়লো রজবিলাস, 'ওনার সঙ্গে খুব থিকথিকে ভাব ছিলো স্যার। একই পাড়ায় থাকতো তো, ব্যাচিলার লোক, রাত বিরেতেও পড়াশুনা বন্ধতে যেতেন উনি।'

'গুড গুড' খুশি হলো বরেন, 'আরো ডিটেলস চাই।'

'পাওয়া গেলো না স্যার।' আফশোষের ভঙ্গী করলো রজবিলাস, 'বছর চারেক আগে অধ্যাপক আমেরিকায় চলে গিয়েছেন পার্মানেন্টলি। ওখানেই বিয়ে থাকেছেন। সম্প্রতি সমাজ বাচ্চা নিয়ে দেশে এসেছিলেন দিন দশেকের জন্যে।'

অধ্যাপকের নাম জেনে নিয়ে রেগ্নুকে বললো বরেন। এমন ভাব করে বললো, যেন ও রেগ্নুর সব কথা জেনে যাচ্ছে। অথচ রেগ্নুর কাছ থেকে শুধু অবাধ হওয়া ছাড়া অন্য কোন অভিব্যক্তি পেলো না বরেন। যেন অনেকদিন আগে ওর একবার বিকোলাই হলেছিলো, বরেন রেগ্নুকে তা মনে করিয়ে দিলো—এই পর্যন্ত।

রজবিলাস এর পরে যার কথা বললো, বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো বরেন। রেগ্নু সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই যেন মিলছিলো না আর। ছেলোট নৈহাংই লপেটা-মাক'া, ইদানিং পার্টি' কালারে ঢোকার চেষ্টায় ছিলো, ওয়াগন ব্রেকারের দলে পাওয়া গেছে বলে মিসা হয়ে গেছে ওর। এইরকম একাটি ছেলের সঙ্গে রেগ্নু নাকি প্রেম করতো। হা ঈশ্বর!

আর একজনের খবর আনলো রজবিলাস, সে নাকি রোজ গাড়িয়াহাটা মোড় থেকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত রেগ্নুর বডিগার্ড হয়ে যেতো। এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না রজবিলাস। তবে এটাও নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলছিলো!

মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হলো বরেনের। রেগ্নু করেছোটা কি! একটার পর একটা ছেলের সঙ্গে পিরীত করে গেছে ঐ বয়স থেকে? কিন্তু মনশিকল হলো এইসব চরিত্ররা এখন কেউ রেগ্নুর সঙ্গে জড়িয়ে নেই। রজবিলাসের কথামত এরা নানা সময়ে ওর সঙ্গে থিকথিকে প্রেম করে কেটে পড়েছে। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো বরেনের। সেদিন রাগের মাথায় রেগ্নুকে ও বেশ্যা বলেছিলো, কথাটা এখন কি রকম সত্যি সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহলে, এইসব প্রেমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে রেগ্নু এখন কার ওপর ভরসা করে এসব কান্ড করছে?

এই সময় রজবিলাস আবার খবর আনলো রেগ্নু নাকি বিয়ের ঠিক আগে একাটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতো। রুনিভার্সিটির বন্ধু। সে এখন কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। যেখান থেকে শুরুর সেখানেই যেন ফিরে এসে বরেন। এখন একটার পর একটা চরিত্রের এইসব পরিণতিতে ওর ভয় ছিলো, হয়তো দেখবে এই ছেলোটও আর নেই রেগ্নুর সঙ্গে জড়িয়ে—বলা যায় না কিছুর। বরেনের মনে হলো, এই মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেও অন্য ছেলের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যেতে পারে।

এই রকম একটা দিনে ও গ্র্যান্ড হোটেলের নিচ থেকে 'পয়েন্ড ফর দ্য কিল' বইটা কিনে আনলো। একটা বাঘ অনেক অনুসরণ করে কোন জলা জায়গায়

ঝোপের আড়ালে এসে ওৎ পেতে বসেছে, অদূরেই তার শিকার ! এবার সামনের পা দুটো গুঁটিয়ে নিয়ে লাফ দেবার ভঙ্গী করছে বাঘটা, যে কোন মূহুর্তেই । কি করে খুন করতে হয় । এই ভাবেও ভাবা যায় ব্যাপারটা । পৃথিবীর জটিলতম কিছু খুনের ঘটনা, যেকোন খুনীরা ধরা পড়েছে কি কি ভুল করে, অথবা ধরা পড়েনি কোন কৃতিত্বে—বিস্তারিত লেখা আছে বইটায় । কেউ যদি চায় স্বচ্ছন্দে ঘটনাগুলো থেকে একটা ফর্মুলা তৈরী করে নিতে পারে যার নাম দেওয়া যায় কি করে খুন করতে হয় ।

রজবিলাস কতদূর কাজ করতে পারবে—এখন সন্দেহ হচ্ছে বরেনের । ও যেমন একটার পর একটা নাম এনে হাজির করছে তাতে কতদূর কি করা যায় । কয়েকটা নাম কখনো প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না । তার জন্যে সলিড কিছু চাই । আর সেটা না হলে রজবিলাসের পেছনে টাকা ঢালা পণ্ডশ্রম হবে । এক এক সময় মনে হচ্ছে, রেগদুর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিচ্ছেদটা করে নেওয়াই ভালো । না হয় প্রাতি মাসে মোটা টাকা রেগদুকে দিয়ে যাবে ও । এই ব্যামেলা, এই মানসিক অশান্তি থেকে তো নিস্তার পাবে । কিন্তু পরস্পরই মনে হচ্ছে, কেন সে অতগুলো টাকা দিয়ে যাবে একজন ভ্রষ্টা মেয়েছেলেকে ! কোন যুক্তি নেই এর । টাকাটা তাকে শ্রম দিয়ে রোজগার করতে হচ্ছে, আর তার অংশ রেগদু মজাসে ভোগ করবে স্নেহ আইনের সুবাদে ? না, প্রমাণ চাই একটা কিছু, যা রেগদুকে ভ্রষ্টা বলে চিহ্নিত করবে । আর তা যদি না পাওয়া যায় ?

রেগদুকে নিয়ে ও যদি সানরাইজ দেখতে টাইগার হিলে যায়, অথবা গোপালপুরে সমুদ্র স্নানে ? সবচেয়ে নিরাপদ এটা । কিছুই না, ওর অন্যান্যনস্কতার সুযোগ নিয়ে সময় বদলে একটু ঠেলে দেওয়া । তারপর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে ওঠা । কেউ সন্দেহ অবধি করতে পারবে না । বইটাতে তো এরকম খুনের কথা বলা আছে । আজকাল খুন করতে কেউ ছুরি বা বিষ ব্যবহার করে না । এক ভদ্রমহিলার পেটে আলসার মতো ছিলো । মাঝে মাঝে যন্ত্রণা পেতো খুব । চিকিৎসা চলছিলো । একদিন ভদ্রলোক শুনলেন স্ত্রীর মাথা ধরেছে । এ্যাসপিরিন খেতে বললেন । কাজ হলো । তারপর আবার একদিন হতেই মাথা বাড়াতে বললেন । গোটা আটেক এ্যাসপিরিন গুঁড়ো করে কাগজে ঢেলে স্ত্রীকে দিলেন । খেয়ে বেশ আরাম হলো । তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে পেটে যন্ত্রণা । শেষে রক্ত বমি । অনেক চেষ্টাতেও বাঁচানো গেলো না শেষ পর্যন্ত । পেটের ঘা সহ্য করিনি এ্যাসপিরিনকে । ব্যাপারটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে গণ্য হলো । ডাক্তারের কাছে উনি বলেছিলেন মাথা ধরার জন্যে এ্যাসপিরিন খেয়েছিলেন । সে তো খেয়েই থাকেন, নতুন কিছু নয় । কোন সন্দেহ নেই তাঁর মনে । স্বচ্ছন্দে করে গেলেন । স্বামী বেচারীকে ছুরি বা গুলি ছুঁড়তে হলো না ।

কিন্তু রেগদু কি ওর সঙ্গে বাইরে যেতে চাইবে ? যদি না বলে দেয় মৃত্যুর ওপর । বিয়ের পর হিনিমুনে যাচ্ছি এটা এখন বলতে গেলে কেমন হাস্যকর শোনাবে

না ? একটা কিছ্ৰু মতহল বের করার চিন্তায় পেয়ে বসলো ওকে ।

দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছিলো এমন সময় ঝড়ের মতো নীরেন দরজা ঠেলে ঢুকলো । তখন ওর কাছে লোক বসে । নীরেনকে একবার দেখে ও বাইরে অপেক্ষা করতে বললো । কাজের সময় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে অবাস্তিত বলে মনে করে । তাছাড়া নীরেনকে এই সময় ওর অফিসে আসতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেলো ও । কোন সীমারেখা মানছে না ছেলেটা । ইদানিং ভীষণ বেপরোয়া হয়ে গেছে নীরেন । অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মদুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস হতো না নীরেনের । রেগু এসে ওর সর্বনাশ সর্বাঙ্গ দিয়েই করে দিলো । বাকী রাখলো না কিছু ।

কাজে মন বসলো না । নীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দাদার মদুখের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে এখন । কিন্তু ওর উত্তেজিত মদুখ বরেন দেখেছে, মদুখে ঘাম, বোঝাই যায় খুব জোর কিছু জানতে পেরেছে ও । এবং সেটা যে রেগুর বিষয়ে তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায় । নিজের পড়াশুনার চেয়ে আড্ডা আর এই সব ব্যাপারে আগ্রহ ওর বেশী ।

মিনিট দশেক পরে সামনের ভদ্রলোক উঠে গেলে ভাইকে ডাকলো বরেন । নীরেন এসে চেষ্টার টেনে বসলো । এখন একটু শান্ত হয়েছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।

বরেন বললো, ‘কি ব্যাপার অফিসে আসতে হলো কেন ?’

নীরেন হাসলো, ‘উনি আজ বাপের বাড়িতে চিঠি লিখেছেন ।’

বরেন চুপ করে ভাইকে দেখলো । এই একটা কথা বলতে ও এখানে ছুটে এসেছে ? অবশ্যই রেগুকে বারণ করে দেওয়া ছিলো ও কোন চিঠিপত্র যেন না লেখে । তবে এ খবরটা তো বাড়িতে গেলেও দেওয়া যেতো । বরেন মনে মনে ঠিক করে নিলো, নীরেনকে সরাসরি বলবে যাতে এইসব ব্যাপারে ও নাক না গলায় । কিন্তু তার আগেই নীরেন পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রেখে দিলো ।

খামটা তুলে নিলো বরেন । ওপরে দীপকের ঠিকানা লেখা । অর্থাৎ হয়ে ও ভাইকে বললো, ‘এ চিঠি তুই কোথায় পেলি ?’

এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে নীরেন ঘটনাটা বললো । শেখ একটা দারুণ এ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে । বাড়ির সামনে একটা রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলো ওরা । এগারটা নাগাদ পাড়া ফাঁকা । এমন সময় ও ওদের বাড়ির ঝিকে নেমে আসতে দেখলো । বড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে লেটার বক্সের মধ্যে কিছু ফেলে তর তর করে উঠে গেলো সিঁড়ি দিয়ে । প্রথমটা কিছু ভাবেনি নীরেন, কিন্তু বড়ি ঝি-এর ফিরে যাওয়া দেখে ওর কেমন লাগলো । ওদের বাড়িতে চিঠিপত্র আসা যাওয়া করে খুবই কম । এখন বাড়িতে মা আর উনি আছেন । মা তো চিঠিপত্র লেখেন না ।

ও অবশ্য বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতো কে দিয়েছে, কিন্তু তাতে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর পোস্ট অফিসের লোক এসে যখন তালা খুলে চিঠি বের করছে, তখন ও মিথ্যে করে তাকে বলেছে যে চিঠিটা ভুল করে ফেলে দিয়েছে লেটার বক্সে। পিয়ন কিছতেই দিতে চাইছিলো না। পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট মাস্টারকে বলতে বলোঁছিলো। শেষ পর্যন্ত কান্দা কৌশল করে ও এই চিঠিটা উদ্ধার করেছে। ওর সন্দেহ, নিশ্চয়ই একটা দামী চিঠি। কারণ যতদূর মনে হয় উনি এখানে এসে কোন চিঠি লেখেন নি, এটাতে তাই মনের কথা লিখতে পারেন। ওর অবশ্য ভয় ছিলো, লেটার বক্সের অনেক চিঠির মধ্যে কোনটা ওদের ঝি ফেলেছে ঠাওর করে উঠতে পারবে না। এটাও তো হতে পারতো, উনি সেই ছেলোটাকে লিখেছেন। তবে ওনার হাতের লেখা নিশ্চয়ই ভালো হবে, আর বক্সে কত চিঠিই বা থাকতে পারে—এইসব থেকে রিস্ক নিয়েছিলো নীরেন। বাপের বাড়ির ঠিকানা থাকায় অবশ্য কোন অসুবিধে হয়নি খামটাকে চিনে ফেলতে।

কথাগুলো শুনে চোখের কোণে ভাই-এর দিকে তাকালো বরেন। বেশ কৃতিত্বের হাসি ওর মুখে। এটা অন্তত আশার কথা যে ও খামটা উৎসাহের আতিশয্যে খুলে বসেন। মদুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলো বরেন। ‘আমার অবস্থা বুঝতেই পারছো। বৈঁচে আছি কি করে জানি না। এখন প্রতিদিন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অনেক রকম। দাদা, তুমি আমার একটা কাজ করবে? তোমাকে যে ছেলোটির কথা বলতাম তার কাছ থেকে আমার একটা চিঠি তুমি ফেরৎ নিয়ে এসো। কেন ওকে লিখেছিলাম জানি না, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রীতি মদুহর্তে কত বোকামি না আমি করে চলছি। চিঠিটা অনেক বড়, বিয়ের ক’দিন আগে লেখা। আগে হস্টেলে থাকতো সন্মিত, এখন পাশেই আর একটা মেসে। সবাই চেনে। কাজটা দ্রুত করতে হবে তোমাকে। নইলে এ পক্ষ খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।’ তারপর অনেকটা ফাঁক ‘আমাকে একদিন এসে নিয়ে যাও না, দাদা।’

চিঠিটা পড়ে চোখ বন্ধ করলো বরেন, ‘ঠিক আছে, তুই যা।’

‘কি লিখেছে?’ নীরেন ঝুঁকি বসলো।

‘আমি তোকে চলে যেতে বলছি, যা’ চাপা গলায় বললো বরেন। ওর মনে হলো নীরেনকে কি ও এখন চড় মারতে পারবে না? দাদার মদুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো নীরেন। তারপর কেমন একটা ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে ঘর থেকে বোঁচিয়ে গেলো।

চিঠিটা সামনে রাখলো বরেন, বিডন স্ট্রীটের মেসবাড়িতে থাকে সেই ছেলোটি, যার নাম সন্মিত। আর তার কাছেই একটা চিঠি আছে, যার জন্যে রেগেই ভয়। খুশীতে উঠে দাঁড়ালো ও। এখনই যদি ব্রজবিলাসকে পাওয়া যেতো। ওর ভাই, ব্রজবিলাস যা পারেন তাই করেছে। আর হাওয়ার ওপর বসে নেই বরেন, এখন আসল দরজা সামনে। হঠাৎ ওর মনে হলো নীরেনকে ওভাবে না বললেই হতো। এতো বড় একটা উপকার করলো ছেলোট। বরং ওকে কিছ্ টাকা দিয়ে বললে

হতো ইচ্ছে মতন খরচ করতে। শেষে নিজেই হেসে ফেললো বলেন। টিপ্স ? নিজের ভাইকে ? বাইরে বেরিয়ে ও ফাঁকা করিডোর দেখলো। নীরেন চলে গেছে।

রেণু এবং নিজের ছবিটা এবার দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখা দরকার, মনে মনে বললো বলেন। এতো দিন ধরে এতো সব ঘটে যাচ্ছে, অথচ ছবিটার কথা মনে হয়নি একবারও। এখন নিজেদের যা সম্পর্ক তাতে এই ছবিটা বিশ্রী রকমের বেমানান।

রেণু এখন বাপের বাড়িতে। ঐ ছোট বোকামিটা যদি ও না করতো তাহলে সন্মিত নামের এই ছেলেটার কথা জানতে কত সময় লেগে যেতো। আর কি আশ্চর্য, বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়েই ও চিঠিটা পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। চিঠিতে কি লেখা আছে কে জানে। নিশ্চয়ই এমন কিছুর গোপন কলঙ্কের কথা যা প্রকাশ হতে দিতে চায় না রেণু। আর তার জন্যে এই ছেলোটর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে পারছে সহজেই। সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কি ! ওর ভাই যখন লোকজন নিয়ে ছেলোটকে মারধোর করেছে, তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে রেণুর সম্মতি ছিলো। আর এরপর কি ছেলেটা রেণুকে সহজ হয়ে গ্রহণ করবে ? অসম্ভব। তাহলে রেণু নিজের বিবাহিত জীবন এভাবে নষ্ট করলো কেন ? এতে তো দুকূলই হারিয়ে ফেললো। চিঠিতে ও কি এমন কথা লিখেছে ? রেণু কি কখনো কনসিভ করেছিলো ? সেসব কথা কি চিঠিতে লেখা আছে ? আর তা যদি লেখা থাকে তাহলে ছেলোট সেসব ক্ষমাঘোষা করে নিতে পারবে বলে রেণুর ধারণা ছিলো ? বুঝতে পারি না আমি, মাথা নাড়লো বলেন, অল্প বয়সের প্রেম বোধ হয় সবকিছুর ক্ষমা করে দিতে পারে। এবং এই প্রথম বলেন, সন্মিতকে হিংসে করতে লাগলো।

যাক, যা হবার তা হয়েছে। এখন আরো কিছুর খরচ করে যদি চিঠিটা হাতে এসে যায়, তাহলে একটানে রেণুকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে ও। তারপর নিশ্চিত জীবন। যেভাবে এতদিন কেটে গেছে ওর, অন্তত অশান্তি হয়নি।

বারান্দায় বেরিয়ে বলেন দেখলো, একটা ট্যাক্সি হেডলাইট জেলে এসে ওদের বাড়ির নিচে দাঁড়ালো। অলস চোখে ও দেখলো, একজন মহিলা দরজা খুলে নেমে ভাড়া দিচ্ছেন ড্রাইভারকে। এতো ওপর থেকে আবছা আলোয় মহিলার মাথা আর ঘাড় দেখতে পেলো ও। বিয়ে করেও আমি একটি মহিলার শরীর ভোগ করতে পারলাম না, হেসে উঠলো বলেন। মানুষ, কি আশ্চর্য এবং বিশ্বাসে নিজের কাছে সং হয়ে থাকে। ওদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো, সে নাকি ঐ বয়সেই নিয়মিত শব্দের ছিলো। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'কেন ঘাস ?'

'মজা করতে' ছেলোট বলেছিলো, 'রোজ রোজ নিত্যনতুন জিনিস, মনে হয়

‘আমারই হারেম। যা আনন্দ হয় না—!’ বরেন লক্ষ্য করেছিলো, কথাটা বলার সময় ওর কোন লজ্জা বা পাপবোধ ছিলো না। কিন্তু কি আশ্চর্য, সংস্কারে ওর নিজেরই গা ঘিনঘিন করছিলো তখন।

বাইরের দরজায় কেউ শব্দ করলো। কে এসেছে? এখন কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। বোধ হয় ঐ দরজা খুলে দিলো। ছোট ছোট আওয়াজ উঠছে চট্টর, মেয়েলি। বারান্দার চেয়ারে বসে ঘাড় ঘোরালো বরেন। দরজায় রেণু দাঁড়িয়ে।

চমকে উঠলো বরেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। রেণু দাঁড়িয়ে আছে দরজায় একটা হাত রেখে। পেছনে ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। তাই এখান থেকে ওর মূখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে শরীরের বাহির-রেখায় আলো চকচক করছে। ওরতো আসার কথা ছিলো না। এবং যাবার সময় বরেন বলে দিয়েছিলো এটা শেষবারের জন্যে যাওয়া, তবু কি সাহসে ও ফিরে এলো। এখন কোন কিছুর পরোয়া করে না বরেন। রেণু মূখ নামিয়ে আছে এখনো। ওর হাত কি কাঁপছে?’

‘কি ব্যাপার?’ তিস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলো বরেন।

‘আমি ফিরে এলাম।’ রেণুর মাথা এখনো নিচের দিকে।

‘কেন?’ বরেন কথা খুঁজছিলো।

‘আর ফিরে যাবো না বলে।’ রেণু এবার মূখ তুললো।

‘না!’ চিৎকার করে উঠলো বরেন, ‘তা আর হয় না। তুমি চলে যাও।’ হঠাৎ ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। দ্রুত ঘরে ঢুকে ও দেওয়াল থেকে ছবিটা টেনে নামিয়ে ছুঁড়ে দিলো রেণুর পায়ের কাছে। বনবন শব্দ করে কাঁচ ভেঙ্গে ছাড়িয়ে পড়লো চারপাশে। চমকে সরে দাঁড়ালো রেণু। বরেন দেখলো, অজস্র কুঁচি কুঁচি ভাঙ্গা দাগ ওর মূখের ওপর চেপে বসেছে। একটা হাত বাড়িয়ে ছবি দেখিয়ে বরেন বললো, ‘ওটার মতন তোমাকেও যদি ফেলে দিতে পারতাম।’ অন্তত একটা যন্ত্রণায় বরেনের গলার স্বর বন্ধে আসছিলো।

কয়েক পা হেঁটে ঘরের ভিতরে এলো রেণু, ‘আমি, আমি পারছি না।’

‘কি পারছে না, কি মতলব তোমার, বলো? আবার কোন প্র্যান কল্পে এসেছে নিশ্চয়ই। তুমি চলে যাও, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই; আই হেট ইউ।’ বরেন হাঁপাচ্ছিলো।

‘আমি ক্ষমা চাইছি, আমি আর অবাধ্য হবো না, আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তাই করুন, আমি, আমি সেই জন্যেই এসেছি—।’ হোঁচট চোটে চেপে একটা কান্না সামলালো রেণু।

‘কেন? তোমার সুমিতবাবু কি বলছে? এতো পিরীত দুদিনেই শেষ হয়ে গেলো? পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করবে না? এখন বোধ হয় লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে? চিঠিটার জন্যে এতো প্রেম উড়ে গেলো এক নিমেষেই, হ্যাঁ!’

‘আপনি যা বলার বলুন, আমি সব শুনবো, শূন্য—।’

‘না তা হতে পারে না। তুমি আমার জীবন বিধ্বস্ত করেছো। তোমাকে মেরে ফেললেও আমার সুখ হবে না। আমি, আমার দিকে লোকে তাকিয়ে হাসে। একবারও তুমি ভাবোনি যে, আমি তোমার কাছে কোন অন্যায় করিনি। এটা বদ্ব্যভিচারে পারছো না কেন, আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি। তুমি—তোমার চেয়ে স্বাভাবিকের একটা মেয়ে অনেক ভালো, তার প্রফেসরে সে সং থাকে। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে—গেট আউট।’

মাথার ওপর আলো, রেণু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। বরেন কথা বলতে বলতে ওর দিকে তাকালো। এরকম মূখের দিকে তাকালে বন্ধুর ভিতর কেমন করে। মাথা নাড়ালো বরেন, না, আর কোন ভুল করতে পারে না ও।

‘তোমার চিঠি আমি পাবোই। তুমি কি বোকামি করেছো রেণু, সন্মিত করে মারধোর না করলে বোধ হয় চিঠিটা পাওয়া এতো সহজ হতো না।’

চমকে উঠলো রেণু। বরেন বদ্ব্যভিচারে পারলো মারধোরের খবরটা যে ও পেয়ে যাবে, রেণু ভাবতে পারেনি। হা হা হা। প্রাণপণে হাসতে ইচ্ছে করছে এখন। ওর মনে পড়লো সেদিন রেণুর ঘরে গিয়ে ও খুশীতে চিবিরে চিবিয়ে কি সুন্দর করে কথাগুলো বলেছিলো। আর অন্য নাম শুনেনি, সন্মিতের নাম শুনেনিই দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিলো রেণু। বরেন যখন বলেছিলো ‘সন্মিত বলে কোন ছোঁড়াকে চেনো? সে নাকি খুব অর্থকষ্টে কাটাচ্ছে? তাই আমার কাছে একটা মূল্যবান জিনিস বিক্রি করবে—খুব, খুব দামী। এখন মুখ ঢাকছো কেন? কি লিখেছো সেই চিঠিতে?’ নীরেনের চিঠি পাওয়ার ঘটনাটা বলেনি ও, ওটা বললে মজা কমে যেতো।

আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লো রেণু, তারপর দু’হাতের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদে ফেললো। ‘কেন ন্যাকামো করছো, তোমার তো এলেম আছে অনেক, আর একজনকে ধরো। এতোদিন ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখন আমার কাছে এসেছো মলম বোলাতে? কেন এসেছো? হঠাৎ মতিগতি বদলে গেলো যে! বরেন তাকিয়ে তাকিয়ে বললো, রেণু কোন উত্তর দিলো না। ওর পিঠ কাঁপছিলো। আর এই সময় বরেন লক্ষ্য করলো ও বিয়ের বেনারসীটা পরে এসেছে, গাউনটি সেই গয়নাগুলো; হাতে শাখা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালো বরেন, ‘আজ সন্মিত হয়েছে, কাল সকালেই চলে যাবে। আমি একটা বেশিয়ার মুখ সকালবেলায় দেখতে চাই না।’

বারান্দা দিয়ে ওঘরে যেতে যেতে বরেন থমকে দাঁড়ালো। আশে পাশের ফ্ল্যাটের লোক মুখ বাড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। রেণু এসেছে সবাই যেন টের পেয়ে গেছে। সবাই একটা নাটক দেখার জন্যে সারিয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের উত্তেজিত কথাগুলো কি ওরা শুনতে পেয়েছে। আঃ, মানুষ কেন এতো কৌতূহলী হয়। বরেন শুনতে পেলো, বাইরের ঘরে ফোনটা বাজছে। মানুষ এতো কথা বলে কেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুমিত । দরজায় অনেক শব্দ হবার পর ও চোখ মেললো । তখনো গায়ে ব্যথা । কখন যে সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি একদম । দরজায় শব্দটা একনাগাড়ে হয়ে যাচ্ছে । অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কপালে হাত রাখলো ও, না জ্বর আসেনি ।

দরজা খুলতেই ও অবাক হয়ে গেলো । দীপক দাঁড়িয়ে ।

‘কি ব্যাপার !’

‘মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম । কাল রাতে কি রোগ আপনার কাছে এসেছিলো ? অনেক রাতে ?’

‘না তো ! কেন ?’ ব্যাপার বুঝতে পারছিলো না সুমিত ।

‘আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না । আপনার এখান থেকে বাড়ি ফিরে ওকে সব বললাম । দেখলাম মূখ গম্ভীর করে বসে আছে । বললাম, আপনি কোন ক্ষতি করবেন না । ও শুধু চোখ তুলে আমাকে দেখলো । বুঝতে পারলাম, আপনাকে মারার ব্যাপারটা ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না । হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, ‘কেমন আছে ?’ আমি যা বলার বললাম ! তারপর ও কেঁদে ফেললো, আর বার বার বলতে লাগলো, ‘কেন মারলে, কেন মারলে ?’ ওকে একা থাকতে দিয়ে আমি চলে এলাম অন্য ঘরে । তারপর একসময় মা বললেন ‘ও নেই !’ সব জায়গায় খুঁজে দেখতে পেলাম না ওকে । একটা কাগজে লিখে গিয়েছিলো, ‘আমার অতীতকে ভুলতে চাই, দাদা !’ শুনলাম ও নাকি মোড় থেকে একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে গেছে । ভাবলাম নিশ্চয়ই বরেনের বাড়ি গিয়েছে, ওকে ফোন করলাম । দশ মিনিট ধরে রিং হলো, কেউ ধরলো না । অত রাতে আর বেরুলাম না । যাওয়ার পথে এখন আপনার কাছে এলাম, যদি এখানে এসে থাকে ।’

‘না, কেউ আসেনি !’ সুমিত বললো ।

‘তাহলে বরেনের কাছেই ফিরে গেছে । অথচ ওখান থেকে চলে আসার সময় বেরেছিলো, ওখানে থাকলে ও মরে যাবে । আর ফিরে যাবে না কোনদিন ।

অথচ কি তাড়াতাড়ি বদলে ফেললো মতটা । আচ্ছা চলি, বরেনের ওখানেই ওকে পাবো নিশ্চয়ই !’

চলে গেলো দীপক । দীপকের মূখ চোখ দেখে সুমিতের মনে হলো, রোগ যে রাতে এখানে আসেনি এবং নিশ্চয়ই বরেনের কাছে ফিরে গেছে, এতে ও খুশি হয়েছে । রোগ যদি রাতে এখানে আসতো ? বুকের মধ্যে কি একটা টনটন করে উঠলো । যদি ও বলতো, আমাকে নাও, আমি আর পারছি না । ভাবতে ভাবতে একটা শীতল জলস্রোত ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেলো । অন্যের স্বীকে নিয়ে বসবাস করা—আইন অষ্টোপাশের মতো ওকে অকিঞ্চিৎ ধরবে । ভগবানের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে ছাড় পাওয়া নিতান্তই হাস্যকর । কিন্তু রোগ ফিরে গেলো কেন ? ও তো বরেনের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্ক কাটিয়ে চলে এসেছিলো

বাপের বাড়ি। চিঠিটা পেলো না বলে, নাকি (মনটা কেমন ভার হয়ে যায়) সন্মিতের ওপর মারধোর করা হয়েছে বলে! মনের মধ্যে আর একটা মন কি যে সন্মিতের চিন্তা করে!

টুক করে একটা মেয়ে কতদূর চলে যায়। যে ছিলো রাতের নাগালে, যে ছিলো ছায়ার মতো—কেমন করে এক ফোঁটা সিঁদুর চারপাশে অনেক লোহার গারদ সাজিয়ে দেয়। সেদিন ভর দুপুরে রেণু এসে হাজির অফিসে। কাজ করছিলো সন্মিত। নিচের রিসেপশন থেকে ওকে বললো, একজন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কোন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এটা ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু কে আসতে পারে? ওর কোন পরিচিতা এই অফিসে নিশ্চয়ই আসবে না। লিফটে নেমে এসে থমকে গেলো সন্মিত। রেণু বসে আছে ভিজিটর্সদের চেয়ারে। চোখে কালো চশমা। ওকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো। একটু রোগা হয়ে গেছে, মুখ যেন চৈত্র মাসের দুপুরবেলা। রেণুকে দেখেই বন্ধুর মধ্যে, এতদিন কোথায় ছিলো কে জানে, অজস্র কিঁ কিঁ পোকা একসঙ্গে ডেকে উঠলো। পায়ের তলা শিরশির করছিলো। ও হাঁটতে পারছিলো না যেন। কোন রকমে কাছে গিয়ে বললো, ‘তুমি!’ নিজের গলার স্বর কেমন করে যে অচেনা হয়ে যায়! রেণুর চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝাই যায় কালো কাঁচের আড়ালে ও সন্মিতের দিকেই তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বললো, ‘চলে এলাম।’

সন্মিত ওদের রিসেপশনিস্টের দিকে একবার তাকিয়ে বললো, ‘চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।’ ও অফিসের এই পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছিলো, ওর ভয় হাচ্ছিলো বোমানান কিছুর একটা করে ফেলতে পারে।

বাইরের রোশদুরে দাঁড়িয়ে সন্মিত বললো, ‘তুমি কি করে জানলে এই অফিসে আমি আছি।’

‘আমি জানি, সব জানি।’ রেণু বললো। বললো না, ট্যাকসি নিয়ে ও সন্মিতের হোস্টেলে গিয়েছে, সেখান থেকে নতুন মেসের ঠিকানা আর নতুন মেস থেকে এই অফিস। এবং এতোটা করতে এখন ওর পরিশ্রম হয়েছে অনেক।

‘কোথাও বসবে, চা খাবে?’ সন্মিত তাকালো। এখন রেণুর সিঁথিতে আলজিভের মতো সিঁদুরের আভা হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে। মাথা নাড়লো রেণু, ‘বড় দেবী হয়ে গেছে যে, আচ্ছা, একটুখানি।’

টিফিনের ভীড়টা একটু হালকা হয়ে গেছে বলে ট্রামরাষ্টার ওপর ছোট্ট রেস্টুরেন্টের ঘেরা ঘরটা পেয়ে গেলো ওরা। রেণুর সঙ্গে এই স্ট্রটের দুই হাটে হাটে এসে ওর মনে হয়েছে একটু দূরত্ব রেখে হাটছে রেণু যেন, ও কার সঙ্গে যাচ্ছে কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। ঘেরাঘরে ঢুকে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। চেয়ারে বসতে বসতে সন্মিত বললো, ‘তুমি কেমন আছো রেণু?’

চোখ থেকে চশমা খুলতে যাচ্ছিলো রেণু, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো। তারপর দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। ছটফট করে উঠল সন্মিত। এখন ও কি

করবে ! এই প্রশ্নটা না করলেই ভালো হতো । যেন খুব জানা একটা ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়েছে ও । হাত বাড়িয়ে টেবিলের উষ্টোদিকে বসা রেণুদর মাথা ছুঁলো ও, 'রেণু, রেণু !'

বয় এসে দেখলো রেণু কাঁদছে । ও কি কিছুর মনে করলো ! বয়ের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে থাকলো সন্মিত । দুটো চা দিতে বললো ।

শেষ পৰ্ব্বন্ত রেণু বললো, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ, না ?'

এতোদিন বন্ধুর মধ্যে যতো রাগ ছিলো, যতো জ্বালা তিল তিল করে বেড়ে মজা পুরুরের মতো শ্যাওলায় ঢাকা ছিলো এক নিমেষেই তাকে সরিয়ে দিলো গিয়ে রেণু । কোন্‌দিন দেখা হলে রেণুকে যেসব কটু কথা বলবে বলে একসময় ঠিক করেছিলো সন্মিত, তার একটাকেও এখন খুঁজে পেলো না । কি কথা বলবে ও, বন্ধুর মধ্যে এতো কথা একসঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্যে লুকিয়ে আছে, কোনটা দিয়ে শূন্য করবে !

'আমাকে ঘেন্না করছো না তো !' রেণু চোখ তুললো । দু'হাত বাড়িয়ে রেণুর মৃদু স্পর্শ করার লোভ হলো সন্মিতের । হাতের তালুতে রেণুর নরম গাল মনে মনে অনুভব করলো ও । মৃদু বললো ছিঃ !'

'আমি কিন্তু এখনো তোমার আছি ।' অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের মনে যেন কথা বললো রেণু, 'এখনো ওকে স্পর্শ করতে দিইনি । আমি তোমার কাছে কোন কথা পাইনি, তবু—'

এই প্রথম সেই কথাটা বলে ফেললো সন্মিত, 'তুমি কেন বিয়ে করলে রেণু ! আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছতেই বন্ধুতে পারিনি । তোমার অতীতকে আমি সহজেই ভুলে যেতে পারতাম, যেমন তোমার এই বর্তমানকে একদিন ভুলে যাবো । কেন এরকম করলে ?'

'আমি নিজেকে বন্ধুতে পারি না গো । একটা কিছুর করার পর বন্ধুতে পারি এটা ভুল হলো । ভেবেছিলাম বাবা-মাকে সন্ধানী করে যাবো । ভেবেছিলাম আমার অতীত যদি জানতে পারো তুমি হাত গুটিয়ে নেবে । আমি চট করে ভুলটা করে ফেললাম ।' রেণু ওর দিকে তাকালো, 'এই, তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসোনি আর ?'

কেউ যেন কুঁচি কুঁচি করে দুটো চোখ কেটে দিতে চাইছে, সন্মিত চোখ বন্ধ করলো, 'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি রেণু, জানি না কি আশায়, তবু অপেক্ষা করে আছি ।'

'আঃ,' কি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো রেণু । তারপর বললো, 'জানো, ও আমার অতীত খুঁজে বেড়াচ্ছে । আমি যা যা করেছি সব জেনে যাচ্ছে ও । তোমার কথা জানে না এখনো । তোমার কাছে যদি আসে কখনো—তুমি ফিরিয়ে দেবে তো ?'

সন্মিত কোন কথা বললো না । এ কথার কি জবাব দেবে ও ।

হঠাৎ রেণু বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক দূর না?'

সুদমিত হাসলো, 'আবার কবে আসবে?'

মাথা নাড়লো ও, জানি না। হয়তো একেবারে আসবো, হয়তো—। এই তুমি ভুলে যেতে পারো না আমাকে! বড় বড় চোখ তুলে দেখলো ও সুদমিতকে 'তুমি খুব ভালো, খুব!'

'তোমাকে ও কি কষ্ট দেয়?' সুদমিত জিজ্ঞাসা করলো।

মাথা নাড়লো রেণু, 'এসব জিজ্ঞাসা করো না তুমি, প্লিজ। আমার ব্যাপার আমি তোমাকে ভাবতে দিতে চাই না। এই তোমার অফিসের ফোন নম্বর আমাকে দেবে?'

দিয়েছিলো সুদমিত। তারপর রেণু চলে গেলো। যাওয়ার সময় খুব ভীত এবং দেরী হয়ে যাওয়ায় বাচ্চা ছেলের মতো ছটফট করছিলো ও। সুদমিত বন্ধুতে পারলো ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ও এমন করছে। কোন কথা বলা হলো না, অথচ কত কথা যে বলার ছিলো।

না, রেণু আর ফোন করেনি। কোন যোগাযোগ রাখেনি রেণু। এক সময় মনে হয়েছে কি ছেলেমানুষী করছে ও। একটা মেয়ে তার বিবাহিত জীবন ছেড়েছড়ে কি করে বোরিয়ে আসতে পারে? মনে মনে কতদিন অপেক্ষা করতে পারে ও। আর সেটা কেমন অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে না? কখন কেমন করে মনের মধ্যে দপদপ করা সেই উত্তেজনাটা কমে এলো একসময়, তলানির মতো কোন কোণে চুপচাপ পড়েছিলো! হঠাৎ, হঠাৎ কোন মেয়েকে যার মুখের কোথাও বা হাসির ভাঁজে একটা চেনা চেনা ভঙ্গী এসে রেণুকে মনে করিয়ে দিয়ে যায়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, রেণু যদি সামনে এসে বলে, আমাকে নাও, সুদমিতের সাধ্য নেই তা অস্বীকার করে। বন্ধুর মধ্যে ভীষণ তৃষ্ণাত কেউ একজন আশায় বসে থাকে কেন এমন করে!

অথচ চিঠিটা পাবার পর নিজেকে কেমন নিঃস্ব মনে হয়েছিলো। একদম বিশ্বাস হয়নি দশপাতার শব্দগুলোকে। মনে হয়েছে নিজেকে আড়াল করার জন্যে এভাবে কথার বর্ম পরেছে রেণু। বিয়ে করার সাফাই গাইবার জন্যে এত কলঙ্কের অবতারণা। এগুলোকে মিথ্যে প্রমাণ করতে, চিঠির নামগুলো যাচাই করতে বাবে বলে ঠিক করেছিলো ও। মনের মধ্যে অবশ্য একটা ভয় উঁকি দিতো, যদি ঘটনাগুলো সত্যি হয়ে যায়! কেমন অসহায় লাগতো তখন। এক এক সময় মনে হয়েছে, এইসব ঘটনা ভুলে গিয়ে ও স্বচ্ছন্দে রেণুকে গ্রহণ করতে পারে। রেণুর সঙ্গে দেখা করবে ও একাই, এইরকম যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তখন এক সম্ভাষ্য হোস্টেলে ওর ফোন এলো। ফোন ধরতেই শুনলো, খুব স্পষ্ট এবং চাপা গলা, 'এই, আমি রেণু!'

খুশীতে ফোনটা আঁকড়ে ধরলো ও, শোন, তোমাকে খুঁজছিলাম আমি, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমার খুব দরকার!'

‘তুমি এসো, এখনই, সাতটার মধ্যে।’ রেণুদর গলাটা এমন কেন ?

‘কোথায় ?’ ভালো লাগছিলো সন্মিতের।

‘গড়িয়াহাটের মোড়ে যে বাটার দোকান আছে সেখানে।’ রেণু কি ট্রাঙ্ককলে কথা বলছে ? গলাটা এতো দূরের কেন ?

‘তুমি কোথেকে বলছো ?’

‘গড়িয়াহাট থেকে।’ তারপর শব্দগুলো উচ্চারণ করলো ও, ‘আজ আমার বিয়ে।’

প্রায় চৌঁচিলে উঠেছিলো সন্মিত, ‘কি বলছ ?’

‘হু, লগ্ন সেই ভোর রাতে। আমি চূপচাপ বেরিয়ে এসেছি। তুমি এসো, প্লিজ একবার এসো।’ ফোনটা নামিয়ে রেখেছিলো রেণু।

মহুতেরই ওপাশে সব থেমে গেলো, শব্দ শব্দ যান্ত্রিক শব্দ তুলে ফোনটা কেমন নিঃশব্দ হয়ে গেলো। টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলো সন্মিত। রেণুদর আজ বিয়ে। না, এ হতে দিতে পারে না ও। রেণুকে যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আজকের রাতটা যদি বাড়িতে ফিরতে না দেয়—বিয়ে ভেঙ্গে যাবে নিশ্চয়ই। জমানো টাকাগুলো পকেটে নিয়ে রাস্তায় নামলো ও। এখন ঘাড়তে ছয়টা। একটা বাস পেলে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু বাস নয়, ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলো সন্মিত। আরো দ্রুত যাবে, সময় নেই।

অনেক কষ্টে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠে বসেই হুকুম করলো ঝড়ের মতো চলতে। যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া ডানা মেলে উড়ুক—সন্মিত সিঁটিয়ে বসে থাকলো। কিন্তু সামনে এতো গাড়ি কেন ? কলেজ স্ট্রীট ছেয়ে আছে গাড়িতে গাড়িতে। ড্রাইভার বললো ‘জলদুস হ্যায়।’ পাগলের মতো উসখুস করতে লাগলো ও। কারা দাবী জানাচ্ছে ? কিসের দাবী ? এখন ওদের চাহিদা নিশ্চয়ই সন্মিতের চেয়ে বেশী নয়—হতে পারে না।

গড়িয়াহাটার বাটার দোকান যখন ও দেখতে পেলো, তখন পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে সাতটা বেজে। আর খুব স্বাভাবিক ঘটনার মতো রেণু দাঁড়িয়ে নেই। বরং আর একটা মেয়েকে দেখলো ও। ওকে কি জিজ্ঞাসা করবে রেণু কোথায় গেছে ? ও কি রেণুকে দেখেছে ? রেণু নিশ্চয়ই হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে যাবে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে কি এমন ক্ষতি হতো রেণু। তোমার জন্যে আমি সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারি, তুমি সামান্য পনেরো মিনিট পারলে না। একটুকু ভরা বন্ধ বাতাস নিয়ে সন্মিত ট্যাক্সি ঘোরাতে বললো। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের দিকে যেতে যেতে রাস্তায় প্রতিটি মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও দেখছিলো। এর যে কোন একজন রেণু হয়ে যেতে পারে। আর তখন দরজা খুলে সন্মিত বলবে, ‘এসো !’ আচ্ছা, আজ বিয়ের দিনে রেণু কোন শাড়ি পরে এসেছিলো ? রেণু রেণু রেণু। মনে মনে ডাকাছিলো সন্মিত। ডাকার মতো ডাকিলে নাকি সব পাওয়া যায়। ঐ রাস্তায় এতো মেয়ে আছে, তবে তারা রেণু নয় কেন ? শেষ পর্যন্ত বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে গাড়িটা চলে এলো। আর হঠাৎ ও দেখলো এক লক্ষ দেওয়ালী নেমে গেছে

বাড়িটায়। শানাই বাজছে। আশ্বে আশ্বে ট্যাকসিটা বিয়ে বাড়ির সামনে দিলে পার হয়ে এলো। শানাই-এর চড়া সুর যেন হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে ছুঁড়ে দিলো দূরে—অস্পষ্ট হলে গেলো বিয়ে বাড়ি।

দুহাতে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলো সন্মিত। এখন কোথায় যাবে। যদি সোজা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে যায়! অসম্ভব। রেণুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না কিছুর্তেই। কিন্তু রেণুকে কি করে বাড়ির বাইরে আনা যায়। বিয়ের কনকে! হঠাৎ ওর মনে পড়লো ঝুমার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসি ঘোরালো ও। এখন যদি ঝুমার কাছে গিয়ে ভিক্ষে করে, ওকে যদি অনুরোধ করে রেণুর বাড়িতে যেতে। একটি মেয়ে এবং রেণুর বন্ধু হিসেবে ঝুমা সহজেই ভেতরে যেতে পারে। গিয়ে বলতে পারে, ট্যাকসি নিয়ে সন্মিত ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, ও চলে আসুক।

ছুটে যাওয়া কোলকাতার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সন্মিত বসে থাকলো ট্যাকসির জানালায়।

ট্যাকসির ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিলো ও। একগাদা টাকা উঠেছিলো মিটারে। কিন্তু সন্মিত সে সব খেয়াল করলো না। গ্রে স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করলো ঝুমার বাড়িটা কোন দিকে! আবছা আবছা মনে পড়ছে। অশোক বলিছিলো হাতিবাগানে একটা ব্যাংকের ওপর ওদের ফ্ল্যাট। মোড় থেকে একটু এগোতেই ও ব্যাংকটা দেখতে পেলো। বাড়িটা দোতলা তাই অসুবিধে হলো না কিছুর্ত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেলো আঙ্গুল রাখলো ও। হঠাৎ ওর মনে হলো এখানে আর কোন ব্যাংক নেই তো! যদি ঝুমাদের ফ্ল্যাট এটা না হয়! খুব অসহায়ের মতো সন্মিত বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। ভেতরে মৃদু জলতরঙ্গের আওয়াজ উঠেছিলো বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর শব্দ না করে দরজা খুলে গেলো।

সন্মিত দেখলো একজন মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর খুব জোরালো আলো জ্বলছে। চম্পিশের ওপাশে বয়স তবু মহিলাকে দারুণ দেখাচ্ছে। সুন্দর করে আটসাঁট শাড়ি পরেছেন উনি। নীলচে কাঁচের স্টাইলিশ ফ্রেমের চশমা গালের ফরসা চামড়ায় একটা আভা ছড়িয়েছে। স্মিলভলেশ জামা থেকে বেরিয়ে আসা দুটো ডাটো হাত দরজা ধরে রেখেছিলো। খুব মৃদু স্বরে উনি বললেন, ‘কাকে খুঁজছেন?’

সামান্য হাসবার চেষ্টা করলো ও, ‘আমি সন্মিত, ঝুমা আছে’

‘সন্মিত!’ টেনে টেনে বললো মহিলা। তারপর মাথা নেড়ে ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিলেন ‘আসুন।’

সন্মিত ঘরে ঢুকতেই দরজা ভেজিয়ে বাঁ হাতে সোফাটা দেখিয়ে দিলে ভেতরে যেতে যেতে বললেন, ‘একটু বসুন।’

উনি চলে গেলে সন্মিত সারা ঘরে ইন্টিমেন্টের গন্ধ পেলো। আঃ, এই গন্ধটা ওর দারুণ লাগে। রেণু ইন্টিমেন্ট মাখে না।

ঘরটা ছিমছাম। পরসা এবং রুচি থাকলে মানুষ এইভাবে ঘর সাজাতে পারে।
পায়ের তলায় ভাঁজ করা পদ্রু কাপেট। হাটলে আরাম লাগে। এই মহিলা কে?
ঝুমার দিদি! যেই হোন না কেন, বেশ একটা এয়ার নিয়ে ঘোরেন মহিলা।

পায়ের শব্দে মুখ ঘোরালো ও। এক মুখ হাসি নিয়ে ঝুমা ঘরে এলো, 'এই,
তুমি! কি সৌভাগ্য আমার, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি!' উঠে দাঁড়িয়েছিলো
সুদৃশিত ঝুমাকে দেখে ও একটু চমকে গিয়েছিলো। হালকা লাল রঙের হাটু
অবধি ঝোলা নাইটি পরে আছে ও। মাথার খোলা চুল ফুলে ফেঁপে ঝরনার মতো
কাঁধ পিঠ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। শাড়ি পরলে ওকে যে রকম লম্বা দেখায় এখন তা
দেখাচ্ছে না। খুব বড় ফুলের তোড়ার মতো ওর জামার হাতা দুটো ডানার
কাছে চেপে বসেছে। আর কি আশ্চর্য, ঝুমা ওকে তুমি বললো। এরকম অস্তরঙ্গ-
ভাবে কোন্‌দিন কথা বলেনি ও। নাকি বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছে বলে খুশির
ঘোরে তুমি বললো। ঝুমার শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিলে সুদৃশিত, নিজেকে
কেমন পাপী পাপী মনে হয়। ও শুনলো ঝুমা বলছে, 'মণি, এ হলো সুদৃশিত
আমাদের সঙ্গে পড়ে—খুব লাভজক ছেলে, খুব।'

হেসে ফেললো সুদৃশিত। ওকে কেউ লাভজক ছেলে বলেনি কখনো আর ঝুমা,
পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বোধ হয় ওর সম্বন্ধে এই কথাটাই খুঁজে পেলো। হাত
জোড় করে ঝুমার পেছনে দাঁড়ানো মহিলাকে নমস্কার করলো সুদৃশিত। ওঁকে ঝুমা
মণি বলে ডাকলো। মণি মানে?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। দাঁতের গড়ন ভালো—সুদৃশিত দেখলো। ঝুমা ওর দিকে
তাকিয়ে বললো 'আমার বন্ধু এবং মা, বন্ধু বলে?'

ঝুমার মা বললেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'না না এখানে বসবো না, চলো আমার ঘরে চলো।' এক হাতে দরজার পর্দা
ধরে সুদৃশিতকে ডাকলো ঝুমা। ঝুমার ঘরে যাওয়া কি শোভনীয় হবে! কিন্তু ও
যে সহজ ভঙ্গীতে ডাকছে—সুদৃশিত ওর পেছন পেছন চলে এলো। ছোট্ট করিডোর,
দুপাশে ঘর। ঝুমার ঘর শেষ প্রান্তে।

ঘরে ঢুকে ঝুমা বললো, 'এখন বলো কি খবর?'

'একটু প্রয়োজন ছিলো।' সুদৃশিত সোফা-কাম-বেডে হেলান দিয়ে বসলো,
'তুমি কেমন আছো?'

'আমি আজ ভীষণ টায়ার্ড! খুব ঘুরেছি। দুপুরে বেরিয়েছিলাম ব্যাংক
চার্চ দেখতে, ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে যেতে হলো অগ্নিকণ্ঠে সি-অফ করতে।'
খাটের ওপর বসে দুটো হাতে দু'দিকে ভর দিয়ে মুখ ওপরে তুলে বললো ঝুমা।

'অশোক, অশোক আজ চলে গেলো।' কথাটা বলেই মনটা খারাপ হয়ে
গেলো সুদৃশিতের। ইস, একদম খেয়াল ছিলো না। অশোক চলে যাচ্ছে এটা
কেমন করে ভুলে গেলো ও। ঝুমার দিকে তাকালো সুদৃশিত। অশোকের চলে যাওয়া
ওর মনের ওপর কোন ছাপ ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে না। কি সহজে ও সি-অফ

করতে স্টেশনে গিয়েছিলো। ব্যাণ্ডেল চার্চে কি ও একা যেতে পারে। পাগল। মাথা পেছনে হেলানো কাঁধ দুটো সামান্য উঁচু, হাতের ওপর শরীরের ভর—হালকা নাইটিং মধ্য দিয়ে ওর ভারী বুদ্ধ পতাকার মতো নড়ছে। ওখানে তো অশোকের জন্যে কোন কণ্ট নেই। নেই ?

মাথা নামালো সন্মিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলো ঝুমা, ‘এই তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো এতে ?’ সন্মিত দেখলো ঝুমা দু আঙ্গুলে কোমরের কাছ থেকে জামাটা তুলে ধরে ওকে জিজ্ঞাসা করছে।

‘না।’ বলে সন্মিত হাসলো ! কি বলা যায় আর !

‘গুড।’ বলো প্রয়োজনটা কি !

একটু উসখুস করলো সন্মিত। কি ভাবে বলা যায় কথাটা। ঘড়ির দিকে তাকালো নটা বাজে। ঝুমা বলছে খুব টায়ার্ড। কথাটা ও কিভাবে নেবে। সন্মিতের মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করে ঝুমা খাট থেকে নেমে সে ধাপাস করে ওর পাশে বসে পড়লো। একটা পা ভাঁজ করে সোফার ওপর তুলে ওর দিকে ফিরলো ঝুমা ‘সিরিয়াস কিছু ?’

সন্মিত দেখলো নাইটি থেকে বেরোনো ঝুমার পুরু পায়ের গোছা কি শাদা আর তাতে নরম সিল্কের মতো ছোট ছোট লোম শূন্যে আছে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। বুদ্ধের মধ্যে কেমন করে উঠলো তাড়াতাড়ি বলে ফেললো ও ‘তুমি জানো আজ রেগুর বিয়ে ?’ কথাটা বলার পর খেয়াল হলো ও ঝুমাকে তুমি বললো। বলে ফেললো।

‘বিয়ে, ওঃ, তাই নাকি !’ কেমন চমকে ওঠা গলায় বললো ঝুমা।

‘হুঁ। আমাকে আজ সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ফোন করে দেখা করতে বললো রেগু। আমার দোর হয়েছিল—দেখা পাইনি। আমি কি করবো বুদ্ধতে পারছি না ঝুমা। তুমি একবার যাবে ? যদি এখনো হয়—আমি বাইরে অপেক্ষা করবো—আমি—’ কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো সন্মিত।

‘লগ্ন কখন ?’ ঝুমা জিজ্ঞাসা করলো।

মাথা নাড়লো সন্মিত ‘বোধ হয় ভোরের দিকে।’

হঠাৎ ঝুমা হাত বাড়িয়ে সন্মিতের চুলে আঙ্গুল রাখলো। ‘তুমি খুব দুঃখ পেয়েছো না ? এখন ওখানে যাওয়াটা নেহাতই ছেলেমানুষী, এটা বুদ্ধতে পারছো না ?’

‘আমি পারছি না।’ সন্মিতের বুদ্ধের মধ্যে সন্ধ্যার পর এই প্রথম একটা কান্না চুপিচুপি বড় হয়ে উঠছিলো।

‘এই, ছেলেমানুষী করো না। দেখছো না, রেগু তোমাকে কি সহজে ভুলে গেলো। তুমি কেন পারবে না। আর তুমি ছেলেমানুষের প্রথম নও। বোকার মতন মন খারাপ করো না। হিঃ, তুমি তো পুরুষমানুষ।’ ঝুমার আঙ্গুলগুলো সন্মিতের চুলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। অন্য হাতে ঝুমা ওর কাঁধ ধরলো, ‘একদম বাচ্চা ছেলে তুমি। স্পোর্টসম্যান হও। ভাবো না, একটা ম্যাচ হেরে গেলে। এই

সন্মিত—আবার চোখ থেকে জল ফেলছো—ছিঃ । এই বোকা !’

ঝুমার বলার মধ্যে এমন একটা মমতা ছিলো, এমন একটা স্নেহ ছিল যাকে মা মা মনে হয়, সন্মিত নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না আর । ছোট্ট ছেলের মতো ও ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললো । এতদিন ঝুমার মধ্যে তিল তিল করে জমা পড়ছিলো, যা এক নিমেষে কেমন করে তার বাঁধ ভেঙ্গে গেলো । ঝুমার ঝুকে মৃদু রেখে ও পবিত্র নদীর মতো ময়লাগুলো ধুয়ে ধুয়ে নিচ্ছিলো । দু’হাতে সন্মিতের মাথাটা ঝুকে চেপে ধরে ঝুমা ফিসফিস করে বলছিলো, ‘এই তুমি কাঁদবে না, কেন চোখের জল ফেলছো । আমাকে দ্যাখো না, আমি তো একবারও কাঁদিনি, আমি তো কেমন হাসি মৃদুখে বিদায় দিয়ে এলাম । এই বোকা, তুমি একদম বোকা— আমাকে দ্যাখো না । আমি তো একটা মেয়ে— আমি যদি পারি, তবে তুমি পারবে না কেন ?’ ঝুমার গলাটা কেমন করে এক সময় বৃজে গেলো, ওর ঠোঁট নড়ছিলো, সন্মিতের মাথার ওপর গাল রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো ঝুমা ।

ঝুমার ওখানে আর যাওয়া হয়নি । এক একবার মনে হয়েছে গিয়ে দেখা করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পা আড়চট হয়েছে, মনের মধ্যে কি সত্কেচ চেপে ধরেছে হঠাৎই । আর আশ্চর্যের ব্যাপার ঝুমাও কোন যোগাযোগ করেনি । যেন সেই রাত্রে হঠাৎই একটা কিছুর ঘটে গেলো, যা তারপর আর মনে রাখার কোন প্রয়োজন নেই । দীপক-বাবু কাল রাত্রে বললেন, ঝুমা নাকি রেণুকে কি সব বলেছে । কি বলতে পারে ঝুমা । সেই রাত্রে ও তো কোন অন্যান্য করেনি যা ঝুমাকে কিছুর বলতে পারে । রেণু কি ঝুমাকে ফোন করেছিলো ! ওকে ফোনে না পেয়ে ঝুমার সঙ্গে কথা বলেছিলো ? আর সে কথা শুনে রেণু ফিরে গেলো বরেনের কাছে ? কেমন অসম্ভব লাগছে এইরকম ভাবতে—কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না । অবশ্য সব কিছুরই কি যুক্তিমতন চলে ? ঝুমার সঙ্গে কি ও দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে ? কোন মানে হয় না ।

রেণুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সন্মিত ভেবেছিলো ওর ছবি এবং চিঠিগুলো রাখার কোন যুক্তি নেই—নেহাতই ভার বয়ে বেড়ানো । ঠিক সেই সময় ওর হঠাৎ মনে হলো রেণুর চিঠিটা কতদূর সত্যি একবার খোঁজ নিলে হয় । এমন ভাবে লিখেছে রেণু, খোঁজ পেতে কোন অসুবিধে হবে না । ‘অশোক তখন হস্তিাবাদে ও সঙ্গে থাকলো ভালো হতো । শেষ পর্যন্ত একাই যাওয়া ঠিক করলো সন্মিত ।

প্রথম নাম রমেন রায় । বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে এক বিকেলে গিয়ে বিপ্লবের দেখা পেয়ে গেলো সন্মিত সেই চায়ের দোকানে । সন্মিত খুশি হলো, ছেলেটা ওকে চিনতে পেরেছে । অশোকের কথা বললো সন্মিত । তারপর এলোমেলা কথা হওয়ার পর বিপ্লব বললো, ‘আপনাদের সেই ক্যান্ডিডেটের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জানেন নিশ্চয়ই ।’

সন্মিত ঘাড় নাড়লো ।

‘কিন্তু মনে হয় কিছুর একটা ঝামেলা হয়েছে বিয়ের পর । খবর টবর তো ও বাড়ি

থেকে বেরোয় না। তবে আমরা আর মেয়েটাকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে দেখিনি।' বিপ্লব বললো।

শেষ পর্যন্ত সন্মিত জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, এখানে রমেন রায় বলে কেউ থাকে?'

'রমেন?' চোখ ছোট করলো বিপ্লব, 'ওকে চিনলেন কি করে?'

অস্বাভিভূতে পড়লো সন্মিত, শেষ পর্যন্ত বললো, 'শুনছি রেন্ডার সঙ্গে নাকি কিসব ছিলো ওর।'

হেসে ফেললো বিপ্লব, কি মশাই, খুব ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে আপনাকে। রমেনের এখন মিসা হয়ে গেছে।'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো সন্মিতের, কথাটা হুবহু মিলে গেলো।

বিপ্লব বললো, 'শুনছি আগে নাকি খুব সোস্যাল ছিলো, পাড়ায় ফাংশন টাংশন করতো। রেন্ডার সঙ্গে বোধ হয় বাচ্চাদের আসর করতে গিয়ে ভাবটা ব হয়েছিলো। একটা ব্যান্ড পার্টি' হয়েছিলো ক্লাব থেকে। রমেন তার চার্জ' ছিলো। তারপর একদিন বেপাক্তা হয়ে গেলো ও। আমি এ পাড়ায় আসার পর ও আবার ফিরে এলো। সে কি ডাট তখন রমেনের। মোটর বাইকে করে ঘোরে, জামাকাপড় দেখলে চোখ বড় হয়ে যাবে আপনার। শেষ পর্যন্ত আমরা খবর পেলাম, ও ওয়াগন ব্রেকার পার্টি' করেছে। পলিটিক্যাল পার্টি'তেও ভিড়েছে। কিন্তু সামলাতে পারেনি, একদিন পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেলো, শুনছি মিসায় আছে।'

আর কিছুর দরকার নেই। বিপ্লবের বর্ণনা হুবহু না হোক রমেন রায়ের চরিত্রটা রেন্ডার চিঠির পাতায় এরকমই হয়ে আছে। রেন্ডার এক ফোটা বাড়িয়ে বলেনি। এই ছেলেটিকে কল্পনা করে রেন্ডার মিথ্যে কুৎসার কাদা নিজের গায়ে মেখে চিঠি লেখেনি। ওর পেছনে সবটাই সত্যি হয়ে আছে।

কিন্তু এতো কথা জানার পরও রেন্ডার সম্পর্কে কেন খারাপ ভাবনা মনে আসছে না। 'সব পেয়েছির আসর' করতে গিয়ে যে কোন বাচ্চা তো তাদের নেতাকে নায়ক বলে ভাবতে পারে। অবশ্য তখন কি রেন্ডার বাচ্চা ছিলো। রেন্ডার তো স্পষ্ট করেই লিখেছে, যদিও ও ব্লক পরতো তবে ও মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের কথা মতন এটাও তো ঠিক, ওয়াগন ব্রেকার রমেন রায়ের সঙ্গে রেন্ডার কোন সম্পর্ক' ছিলো না! তবে?

রমেন রায়ের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে না ফেলতেই সন্মিত সেই উড্ডোজাহাজ কোম্পানীর অফিসটায় গিয়ে হাজির হলো। যেসব প্রাইভেট সংস্থা দেশের অভ্যন্তরে যাত্রী পরিবহন করে, এদের অবস্থা তাদের মধ্যে সবচেয়ে রমরমে। বিভূতি গান্ধীর খবর পেতে অসুবিধে হলো না কিছুর। বাড়ির ফোন নম্বরটাও পেয়ে গেলো অফিস থেকেই। বিয়ের জন্যে মাসখানেক ছুটি নিয়েছে বিভূতি।

অফিস থেকে বেরিয়েই সন্মিত একটা পাবলিক বুথে ঢুকে ফোন করলো। এখন দুপুর। ওপাশে ফোন বাজছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো, কারের ধরার নাম

নেই। বিরক্ত হয়ে রেখে দেবে ভাবছিলো, এমন সময় ওপাশে একটা ঘুম জড়ানো গলা শুনতে পেলো।

‘হু ইজ দেয়ার?’

নম্বরটা যাচাই করে নিলো সন্মিত। হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় ফোন করেছে ও।

‘বিভূতি গাঙ্গুলী আছেন?’

‘স্পিকিং।’ গলার স্বর কি ঘুমজড়ানো—না মাতাল মাতাল?

‘আপনি আমায় চিনবেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।’ সন্মিতের গলা একটুও কাঁপলো না। সব মিলে যাচ্ছে যে—কি আশ্চর্য!

‘বলুন।’

‘আপনি রেগনকে চেনেন?’

‘কোন রেগন? হু ইজ শি?’ ওপাশের গলায় বিস্ময়।

‘রেগন রায়!’

খানিক চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন হলো, ‘আপনি কে?’

‘ওর বন্ধু।’

‘কি হয়েছে রেগন?’

‘তেনে কিছু নয়। আমি নেহাতই কৌতূহলে আপনাকে ফোন করছি। আপনি ওকে কতটা চেনেন!’

‘ভাই, একথার উত্তর দেবো কি করে! আপনাকে আমি চিনি না জানি না, প্লাস আপনার মন্থ দেখতে পাচ্ছি না আমি। ইয়েস ওকে আমি চিনতাম। আর ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে। তার বেশী জানবার আগ্রহ যদি থাকে সরাসরি চলে আসুন এখানে। দ্রুপদ্রবেলায় নয়—এই সময় আমি এবং আমার স্ত্রী খুব ব্যস্ত থাকি, আজ যেমন ছিলাম।’

কিছু বলতে যাচ্ছিলো সন্মিত, শুনলো একটি নারীকণ্ঠ কেমন আবদারে গলায় বললো, ‘উম্, প্লিজ বি কুইফ!’ আর সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।

ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে। কথাটা মনে মনে বললো সন্মিত। অর্থাৎ জ্বলজ্যান্ত বিভূতি গাঙ্গুলী, চিঠির পাতায় নন, বাস্তবেও বেঁচে বর্ত্তে আছেন এবং এই মন্থদেবে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যস্ত। ওর মনে হলো, বিভূতি গাঙ্গুলীর কথা বলার মধ্যে কোন সঙ্কোচ ছিলো না, হয়তো ওর স্ত্রী পাশেই বিছানায় শুয়ে সব শুনছিলো, কিন্তু তার জন্যে ও এক ফোঁটা বিরত হয়নি। অশ্রুত ওর গলায় তা মনে হয়নি। অথচ একদিন দিনের পর দিন ও রেগনকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরেছে (রেগন চিঠি যদি সত্যি হয়)। এবং এখন সন্মিতের মনে হচ্ছে, তা না হবার কোন কারণ নেই। এইসব লোক নিজেদের অতীতের কথা বলতে বোধ হয় কোন শ্বিধা করে না। সন্মিতের ভয় হলো, ও যদি বিভূতি গাঙ্গুলীর বাড়িতে কখনো যায় তাহলে বিভূতি নিজের বোঁ-এর পাশে বসে রেগনর সবকথা বলে যাবে। আর হয়তো সেইসব

কথাগুলো সহজ হবে না, এমনকি রেণু যা লিখেছে তার বাইরের কথাও তো থাকতে পারে যা আরো মারাত্মক চেহারার? অতএব সে সবে না গিয়ে ওর মতো করে বলাই ভালো, ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভালো মেয়ে।

পরপর দুটো চরিত্র মিলে যাবার পর সন্মিত হাল ছেড়ে দিলো। ওর মন এখন বলছে রেণুর চিঠিটা সত্যি, ভীষণ রকমের সত্যি। এই বড় রকমের সত্যি চিঠি রেণু কেন লিখলো? নিজেকে এভাবে নশ্বন করে দিতে কোন মেয়ে চায় কি? বৃকের মধ্যে রেণুকে জড়িয়ে ধরে সন্মিত একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলো, এই, আমি তোমার কে? মদুখ নামিয়ে চোখ বন্ধ করে রেণু বলিছিলো, পতি দেবতা গো! সেই মনের টানে কি চিঠিটা লিখে ফেলিছিলো রেণু?

এখন চিঠিটা নিয়ে ও কি করবে? সত্যি কি এর কোন মূল্য আছে ওর কাছে? না নেই। যাকে ও ভালোবাসতো (তো?) তার চেহারা তো ওর কাছে এক এক রকমের হতে পারে না। এ চিঠি নিয়ে ও রেণুর সামনে দাঁড়াতে পারবে না, বলতে পারবে না দ্যাখো, আমি তোমার সব জানি, তুমি যদি আমার কাছে না ফিরে আসো আমি তোমার সর্বনাশ করবো। এ চিঠি দিয়ে রেণুর স্বামীকে খুঁশি করতে পারবে দু-হাত না, ভরে সেই ভালোবাসার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে না! শুধু কিছুর বিশ্রী রকমের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকা চিঠিটাকে বয়ে বেড়িয়ে লাভ কি!

রেণু আজ ফিরে গেছে বরেনের কাছে। অথচ ওর স্বামী নিশ্চই ওর ওপর অত্যাচার করেছে। প্রশ্নটা সেদিন যদিও এড়িয়ে গেছে রেণু, কিন্তু বৃদ্ধিতে অসুবিধে হয়নি একটুও। তবু ফিরে গেলো! ওর কি মনে হয়েছিলো সন্মিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না হলে ও ভাইদের পাঠিয়েছিলো কেন এই চিঠি আদায় করতে? কেন বৃদ্ধাকে ফোন করতে গেলো? কই, একবারও তো বাপের বাড়ি ফিরে এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলো না। বিশ্বাসের ভিতটা এতো সহজে নড়ে গেলো কি করে! আবার দীপকের কথা মতন সন্মিতের মার খাওয়ার কথা শুনলে কেঁদে ফেলিছিলো রেণু। কেন?

রেণু তোমাকে আমি আজও বৃদ্ধিতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমি আমার মনকেও বৃদ্ধিতে পারি না, তবু তুমি যখনই যেভাবেই হোক আমার কাছে যদি ফিরে আসো তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। রেণু তুমি আমার রক্তের মধ্যে মিশে গেছো—রক্ত কি করে ধুয়ে ফেলতে হয়? আমি জানি না।

ছবির ফ্রেমের চৌহিন্দিতে সন্মিত নিজেকে হাসতে দেখলো। হাত বাড়িয়ে ছবিটা দেয়াল থেকে খুলে নিলো সন্মিত। ছবির পেছনে সেই খামটা। যার মূল্য কারো কাছে কানাকাড়িও নয়। এই চিঠিটাও তো রেণুর বিয়ের দিনেই ও ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারতো। ও যে ছেঁড়েনি সেটাই বা রেণু বৃদ্ধলো কি করে! মেয়েরা কি করে এইসব গোপন ইচ্ছার কথা জানতে পারে যা ছেলেরা খুব অবচেতন ভাবে করে যায়। কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে কি না, না দেখেই একটি মেয়ে বলে দিতে

পারে। ওর অনর্ভূতি সে কথা বলতে সাহায্য করে। একটা ছেলেকে এক পলক দেখেই ওরা তার মনের গভীরে সব কিছু ডুবুরীর মতো আঁতর্পাতি করে খুঁজে ফেলে তাহলে আমাকে তুমি বন্ধুতে পারলে না কেন রেগে ?

খাম থেকে ফটো আর চিঠিটা বের করলো সুমিত। ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলো ও। চোখের পাতায় এখন রেগে। প্রতি রেখা স্পষ্ট, সকালের পুজো পুজো রোদ্দুর, স্নিগ্ধতার মাখামাখি।

এতদিনের চিঠি, ভাঁজ খুললেই যেন রেগে হাতের গন্ধ পাওয়া যায়।

‘আমার বিশ্বের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো এতক্ষণে, দিনটা এসে গেলো বলে। এখন আমার বাড়ির সব ঘরে ব্যস্ততা, যাকে ঘিরে এতো আয়োজন তার দিকে তাকাবার সময় নেই কারো। বিশ্বের কনে নাকি আমি, এই অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ। (দ্যাখো, কি সহজে এই কথাগুলো লিখে ফেললাম আমি। অথচ তোমরা চলে যাওয়ার পর কতবার শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি !)

‘কি ভাবছো ? আমার সেই কথাগুলো এতদিনে সত্যি হলো ?’ সেই যে আমি তোমাকে বলতাম আমি খারাপ, খুব খারাপ ! তখন তো তুমি এমন করে তাকাতে যেন খুব ছেলেমানুষ। কি, এখন তো কথাগুলো সত্যি হলো ? তোমার বিশ্বাস ভুল প্রমাণ করার জন্যে কেমন সত্যি করে ফেললাম।

সুমি, তুমি খুব ভালো। প্রথম দিনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে তুমি খুব ভালো। তোমার জীবনে আমার মতন করে কেউ আসেনি। ভয় হতে লাগলো, সেই সঙ্গে লোভ। নিজেকে সামলাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো তোমাকে সব বলি, খোলামেলা কথা বলে ফেলি, তারপর যা হবার হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হতো, তোমাকে হারাবার ভয়। বিশ্বাস করো, তোমাকে একদিন না দেখলে আমার সবকিছু মিথ্যে হয়ে যেতো। আর এখন তো, দ্যাখো কত সহজে তোমাকে যাতে কোনদিন না দেখতে হয় তার ব্যবস্থায় হাত মিলিয়েছি। বল, আমি কেমন মেয়ে ?

‘ভালোবাসার কাণ্ডাল ছিলাম আমি। এক একজন মানুষের রক্তই বোধহয় এরকম হয়। তুমি বলতে আমি নাকি সুন্দর। একথা তো অনেকেই বলতো। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনতে আসছি কথাটা। শুনতে শুনতে, জানো, বড় অহংকার হতো। আমি যা চাই তাই পাবো। তাই রমেনদা যখন সব মেয়ের মধ্যে আমাকে বিশেষ রকমের খাতির করতে লাগলো, তখন মনে হয়েছিলো এটাই আমার পাওনা এবং ন্যায্য। রমেনদা আমাকে ভালোবাসুক।

‘অথচ তখন আমার কত বয়সই বা ছিলো ? এগারো কিংবা বারো। না তার বেশী নয় ! (কারণ একটা ব্যাপারে এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখনই আমি ছোট্ট মেয়ে থেকে নারী হয়ে গেলাম একদিন, আচমকা।)

‘আমাদের পাড়ায় একটা সব পেয়েছিরা আসর ছিল ! বাচ্চাদের খেলাধুলো, ডিল, এসব হতো। একদিন আমি নাম লেখালাম তাতে। আমার দাদাই বাবার

সম্মতি নিয়ে কাণ্ডটা করেছিলো। তখন তো আমি নেহাতই বাচ্চা। কিন্তু ঐ বয়সেই যে ব্যাপারটা বন্ধে গিয়েছিলাম সেটা হলো ছেলেদের চোখ। কোন ছেলে একবারের বেশী দ্ব'বার তাকালে আমরা মেয়েরা তা নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আর আমার মনে হতো আমাকে দেখছে। আমি যে একটা দেখার মতো জিনিস (শব্দটা খুব খারাপ) এটুকু জানতে পেয়ে খুব আনন্দ হতো গোপনে গোপনে। সব তো পরিষ্কার বন্ধতাম না, তবু মনে হতো আমি বেশ দামী ফ্রক পরতাম তখন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, অল্প বয়সী ছেলেরা যখন তাকাতো তখন ওরা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। খারাপ লাগতো না আমার। না দেখার ভান করতাম। কিন্তু বড়রা, বিশ্বাস করো, তাদের আমার মতো ছেলে মেয়ে ছিলো, আমার পায়ের দিকে কেমন চোখে তাকাতো। স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভালো বেশী রকমের। দশ বারো বছরের পা দুটো কেমন ভারী ভারী লাগতো। ফ্রক পরতাম হাঁটু অবধি। কিন্তু ঐ বড়ো চোখগুলো সেদিকেই তাকিয়ে থাকতো। এমন বিদ্রী লাগতো না!

আর সেই সময়েই রমেনদাকে দেখলাম। রমেন রায় বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে। দূর থেকে দেখছি। কৌতূহল হয়নি কিছু। সে বয়সই আমার ছিলো না। আসরের দায়িত্ব নিয়ে এলো ও। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স হবে। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বেশী লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে যখন আমাদের এক্সারসাইজ শেখাতো তখন কি ভালোই না লাগতো। সেই রমেনদা প্রথমদিন আমাকে বলেছিলো, 'তুমি কি বাঁশি বাজাতে পারবে? অত সুন্দর ঠোঁট।' কিছু না বন্ধে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। রমেনদার ব্যান্ড পার্টিতে আমি থাকবো না, ভাবতেই শরীরটা কেমন করে উঠেছিলো! ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, পারবো। 'গুড'। হেসে বলেছিল রমেনদা। কথাটা অন্য কোন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেনি, শুধু আমাকে। মনে মনে আঙড়াছিলাম, কি সুন্দর ঠোঁট, কি সুন্দর ঠোঁট। সত্যি এরকম করে তো জানতাম না। বাঁড়ি ফিরে আসনায় দেখলাম নিজে। মনে হলো, সত্যি তো আমার ঠোঁটটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে! ছেলেরা এমন করে বললে যে সব কিছু অন্যরকম হয়ে যায়, সেই প্রথম টের পেলাম।

'আমি বেশী কথা বলতাম না। কেমন লজ্জা করতো। কিন্তু রমেনদা যখনই আমাদের কিছু বোঝাতো তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো। সে, কি করে বিউগল বাজাতে হবে তা থেকে শব্দ করে সব কিছু। যেন আর কেউ সামনে নেই আমি ছাড়া। এমন লজ্জা লাগতো না। রাগও হতো! সবার সামনে আমার দিকে তাকাবার কি আছে! দু-একজন বন্ধু টের পেয়ে গিয়েছিলো বোধহয়। একজন বললো, 'রমেনদা তোর লজ্জা শুষেছে।' বিশ্বাস করো কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। লভে পড়লে বন্ধি ওরকম করে তাকাতো হয়! তারপর সেই বন্ধু বললো, 'মীরাদি যদি শোনে না তোকে খেয়ে ফেলবে!' আমি বললাম, 'কেন?'

ও বললো,—‘মীরাদি তো অনেকদিন রমেনদার লভে পড়ে আছে। রমেনদা যে পাত্তা দেয় না।’ মীরাদিকে আমি চিনতাম। আমার চেয়ে অনেক বড়। শাড়ি পরে। মদুখটা এখন মনে পড়ে না, তবে তোমরা ছেলেরা যা চাও (এই, তোমার কথা বলছি না) সেই বন্ধ ছিল খুব ভারী। বাড়ির লোহার গিলে বন্ধ চেপে রমেনদার ড্রিল করানো দেখতো মীরাদি। মীরাদির বন্ধের দিকে চাইতে আমাদের লজ্জা করতো।

না, মীরাদি আমাকে কোনদিন কিছুর বলেনি। বোধ হয় শোনেনি কিছুর। আমি কিন্তু সেই বন্ধুর কথা শুনলে মনে মনে এগিয়ে গেলাম অনেক। অত বড় মীরাদিকে হারিয়ে দিয়ে রমেনদার দৃষ্টি আমার দিকে টানতে পেরেছি বলে একটা অবোধ আনন্দ হচ্ছিলো। সেই সময় একদিন আমি নারী হয়ে গেলাম। লজ্জায় ভয়ে সে আমার কি কান্না। মা যত বোঝায় এ কিছুর নয়, প্রত্যেক মেয়ের এটা হবেই, এটা না হলেই বরং মেয়ে হওয়া যায় না—তত কাঁদি। আসলে বোধহয়, এখন মনে হয় সেই সময় আমি বন্ধু গিয়েছিলাম এখন আমার সব কিছুর পালটে যাবে। এখন আমি আর দৌড়ে গিয়ে রমেনদার ড্রিল পার্টিতে দাঁড়াতে পারবো না। নিষেধের প্রাচীরটা আচমকা তুলে দিলো খানিকটা রক্তপাত। আমাকে বাড়ির জানলায় লোহার শিকে গাল চেপে ওদের দেখতে হবে মীরাদির মতো। আর ব্যাপারটাও হলো তাই। আমার আসরে যাওয়া বন্ধ হলো। কিন্তু মনে মনে ভীষণ ছটফট করতাম। ভাবতাম রমেনদা নিশ্চয়ই আসবে আমার খোঁজ নিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আসরের বিকেলবেলায় ড্রিল, ব্যান্ড বাজানো বন্ধ হয়ে গেলো কেন? বন্ধুরা খবর দিলো, রমেনদার অসুখ হয়েছে। খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করলো, শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। কেমন যেন একটা ভূত আমাকে টেনে নিয়ে গেলো ওখানে। রমেনদার দাদা সন্ধ্যাসী-গোছের মানদু, বিয়ে করেনি, আর আছে বড়ি মা। অতএব আমার অসুবিধে হলো না কিছুর। গিয়ে দেখি শূন্যে আছে ও, তিন চারদিনের দাড়ি গাল ভর্তি, আর কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে হাসলো, বন্ধুলাম খুশী হয়েছে, দরজার দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ‘কি হয়েছে?’

ও আস্তে আস্তে বললো, ‘সুখ।’

‘সুখ?’ আমি বন্ধুতে পারলাম না।

ও বললো ‘তুমি এলে, তাই।’

বিশ্বাস করো, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। জীবনে সেই প্রথম শরীর কেমন করে কদমফুল হয়ে যায় বুঝতে পেরেছিলাম। কাছে ডাকলো রমেনদা, ‘এতোদিন কোথায় ছিলে? আসরে আর আসবে না?’

আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

‘কেন?’ প্রশ্নটা করেই যেন বন্ধুতে পেরেছিলো রমেনদা ‘পাগল! তাতে কি হয়েছে? তুমি না এলে আমার খারাপ লাগে।’ আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে। রোগা

হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে মদুখের সামনে ধরলো। তখনো ওর জ্বর ছিলো গায়ে, আমার হাতে গরম ভাব লাগলো। হঠাৎ আমার হাত নিজের মদুখের ওপর চেপে ধরে চুমু খেলো রমেনদা। আর তক্ষুদুনি আমার মনে হলো আমার শরীরের ভিতরে এমন একটা ঘর ছিলো যার খবর আমি জানতাম না, এখন এই তৃপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ মদুহুতেই তার দরজা খুলে দিলো। আমি কি সদুখে চোখ বন্ধ করে সেই ঘরটাকে দেখাছিলাম হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ খুলে দেখি মীরাদি দরজায় দাঁড়িয়ে কেমন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি, এক দৌড়ে চলে এলাম ওখান থেকে, একেবারে বাড়িতে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম, কিন্তু স্বাস্থ্য পেলাম না। নিজের কাছেই নিজের কেমন লজ্জা হতে লাগলো।

তারপর একদিন শুনলাম পাড়ার একটা বাজে ছেলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, বালিকা জানে না ও মরে গেছে। সদুর করে বলতো। কিন্তু এতদিনে আমার শৈশব যে সত্যি সত্যি মরে গেছে, জ্ঞানবৃক্ষের আপেলটা খেয়ে ফেললাম যে। কিন্তু আমাদের আসর আর জমলো না। অসুখ সারার পর রমেনদাকে একদিন মাত্র দেখেছিলাম জানালায় বসে। কেমন মায়্যা লেগেছিল, কথা বলতে পারিনি। তারপর শুনলাম রমেনদা হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। দৃষ্টি পেয়েছিলাম কি? জানি না। তবে কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জানো, এই ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারিনি। জানি, এটা খুব সাধারণ হস্তোত্তর রমেনদার কোন টান ছিলো না আমার ওপর, আমি তো তখন একদম ছেলেমানুষ, তবু ভুলতে পারা গেলো না যে কিছুর্তেই। সেই রমেনদা যখন আমি একদম পদুপদুরী যুবতী মেয়ে, ফিরে এলো মোটর সাইকেলে চেপে। সাজগোজে চেনা যায় না। দূ-একদিন রাত্তায় দেখা হলে হেসেছে ওই পর্যন্ত। আমি কিন্তু কোন আকর্ষণ বোধ করিনি ওকে দেখে। সেই চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছিলো রমেনদা। শুনলাম পদুর্লিখ নাকি ধরে নিয়ে গেছে ওকে, ওয়াগন ভাঙতো। আমার একবিন্দু খারাপ লাগেনি, সত্যি বলছি।

স্কুলে যখন ওপরের ক্লাসে পড়াছি, তখন অনেকের মদুখ দৃষ্টি যাতায়াতের পথে আমি লক্ষ্য করতাম। কেমন মজা লাগতো। নিজেকে অন্য মেয়ের থেকে আলাদা ভাবতে আরম্ভ করলাম। ক্লাসের বন্ধুরা তাদের দাদাদের চিঠি এনে দিতো আমার কাছে। একটারও উত্তর দিইনি। ঐ বয়সেই কেমন করে বন্ধু নিয়েছিলাম আমি খুব দামী।

পড়াশুনায় ভালো ছিলাম চিরকালই। কলেজে উঠে স্বাধীনতা মিললো একা যাওয়া-আসার। আর এমন সময় বিভূতি গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমাদের সঙ্গে পড়তো একটি মেয়ে, গোলপাকে থাকে, তাকে লিফট দিতে এসেছিলো কলেজের দরজায়। সম্পর্কে ওর আত্মীয় হয়। বন্ধু আমাকে মুগ্ধ করলো, একই দিকে থাকে বলে উঠে বসলাম গাড়িতে। আলাপ হলো। পাইলট অফিসার, চার অঙ্কের মোটা মাইনের মানুস। অথচ বয়স গ্রিশের নিচেই। স্বতীয়বার ডুবলাম।

যেদিন ওর ডিউটি থাকতো না সেদিন রাসবিহারীর মোড় থেকে গাড়িতে উঠতাম

আমি। ব্যবস্থাটা হচ্ছে করেই করেছিলাম। গাড়িহাটার মোড় অবধি পরিচিত ছেলেদের আনাগোনা বেশি। খবরটা রাষ্ট্র হতে সময় লাগবে না। তার ওপর আর এক উৎপাত শূন্য হলো। পাড়ার একটা ছেলে সঙ্গ নিতো রোজ। আমি হাঁটতে হাঁটতে মোড় অবধি এসে বাসে উঠতাম। সেও আসতো ঐ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে। প্রথম প্রথম ভেবেছি তাড়িয়ে দেবো দাদাকে বলবো বিরক্ত করছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম এ এক রকম ভালোই হলো, ও সঙ্গে থাকলে আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। কলকাতার রাস্তায় আমার মতো সুন্দরী মেয়েদের বিপদ অনেক যে। সেই ছেলেটার জন্যে যে আমার মায়া হতো। ও আমাকে রোজ বলতো সিনেমা দেখার কথা, রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। তা ধৈর্য ছিল বটে ওর, অনেকদিন আমার প্রহরীর কাজ করে গেছে।

প্রত্যেক মেয়ের একটা এমন বয়স থাকে যখন সে খুব চাকচিক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে যে জীবন আমি কাটিয়েছি, তাকে আর যা ইচ্ছা বলি বৈচিত্র্যপূর্ণ বলতে পারবো না। সেদিক দিয়ে বিভূতির পাশে বসে ওর গাড়িতে কলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূর দূর যাওয়ার মধ্যে অশ্রুত একটা আনন্দ পেতাম। গাড়িহাটার বাসে চেপে রাসবিহারীর মোড়ে নেমে পড়তাম। কোনদিনই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। সময়ের ব্যাপারে ও ছিলো খুব ঠিকঠাক। গাড়িতে উঠে খাতাপত্র ছুঁড়ে দিতাম পেছনের সিটে। তারপর কখনো ডায়মন্ড হারবারের রাস্তায়, কখনো বি-টি রোড, কখনো হাওড়া ছাড়িয়ে খজপুরের দিকে এক হাতে গাড়ি চালাতো বিভূতি, আর অন্য হাতে আমার কোমর চেপে রাখতো। গান গাইতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু মনুষিকল হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত ও একদম পছন্দ করতো না। ফলে মনুষিকলে পড়ে যেতাম আমি, কাঁহাতক চুপ করে বসে থাকা যায়। মনে মনে গান গেয়ে যেতাম।

আমাদের একটা মজার খেলা ছিল। অনেকদূরে কোন ফাঁকা মাঠ বা ধানক্ষেতের পাশে গাড়ি দাঁড় করাতো বিভূতি। তারপর কাঁচ তুলে দিয়ে ও আমাকে আদর করতো। দূ-পাশের ধু-ধু মাঠ বা ধানের গাছ, আমরা কি নিজর্নে আদর করে যাচ্ছি নিজেকে। চুমু খাওয়ার সময় অতবড় মানুষের মন্থ কি বাচ্চা দেখান (রাগ করোনা, তোমাকে ঠিক সেরকম দেখাতো)। রাস্তায় যেসব গাড়ি চলাচল করতো তারা দৃশ্যটা ষেটুকু দেখতে পেতো হর্ন বাজিয়ে আমাদের জ্ঞানিয়ে দিয়ে যেতো। কেয়ার করতো না বিভূতি। একদিন দেখি দূরটো জায়গায় চোখ গাড়ির কাঁচে সঁটে আছে। যেন এতো বিস্ময় ও কোনদিন বোধ করেনি। সরে এসে দেখি একটা বছর সাতকের বাচ্চা প্রায় উদোম চেহারায়, ছোট জিরাজিরে বুক নিয়ে হাঁপাচ্ছে। দূ-পাশের ফাঁকা মাঠে ও কেন এসেছিল কে জানে। খুব লজ্জা লেগেছিলো। এখানে একটা কথা বলে নিই, যেহেতু আমি মানুষ, বিভূতির শারীরিক সংস্পর্শে এসে অনেক সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। আদর করতে জানতো ও, আর সেই সময় নিজের যা কিছু একটা মেয়ের থাকতে পারে আমি

অন্যাসে ওকে দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ও তা নেয়নি। বলেছে, ‘এটা থাক। বিয়ের পর তোমার একটা জিনিস একদম নতুন পেতে চাই।’ আমার বিশ্বাস, বিভূতি এসব ব্যাপারে অনেক আগেই অভিজ্ঞ ছিলো। মেয়েদের সবরকম গোপনতা ও আবিস্কার করে ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। ওভাবে আদর কোন মানুষ অভিজ্ঞতা না থাকলে করতে পারে না। যেমন তোমাকে আনাড়ি দেখেছি। তা সেইজন্যে হয়তো আমার সবটুকু ও নিয়ে নিতে চায়নি তখনই।

তারপর একদিন ঘটে গেলো ব্যাপারটা। একদিন ওর আসার কথা ছিলো না, কিন্তু সকাল থেকেই আমার ইচ্ছে হাছিলো বোরিয়ে পড়ি। কলেজ যাবার নাম করে সময়টা কোথাও কাটিয়ে আসি। দুবার ফোন করলাম ওর অফিসে। ওদের অফিসটা ছিলো মিশন রোতে। একদিন দেখেছিলাম। দুবার ফোন করে ওকে পেলাম না, আজ ওর ফ্লাইং নেই তবে খুব ব্যস্ত। কিছুতেই শুনলাম না, জোর করতে লাগলাম খুব। অনেক আপত্তির পর শেষ পর্যন্ত ও রাজী হলো। বদললাম, গলার স্বরে টের পেলাম ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

ঠিক দুপুরবেলায় কলেজের সামনে এলো গাড়ি নিয়ে। উঠে বসে বললাম; ব্যাণ্ডলে যাবো। ও কোন কথা বললো না। গাড়ি চালাতে লাগলোচু পচাপ। এমনকি ফাঁকা জায়গায় এসে আমাকে একবারও আদর করলো না। অথচ এটুকুর জন্যে ও রোজ ছুটফুট করতো, কখন ফাঁকা জায়গা আসবে। রাগ হয়ে গেলো, ওকে গাড়ি থামাতে বললাম। চট করে ব্রেক কষে ও আমার দিকে তাকাতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আর তখনি আমি টের পেলাম। ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। বিশ্রী গা গুলোনো গন্ধ। ছিটকে সরে এলাম। ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, এই জন্যেই আজ আসতে চাইছিলাম না।’ এতক্ষণে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। গাড়ি ঘোরাতে বলতেই ও রাজী হলো। ভেবেছিলাম আমি ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক বার প্রবোধ দেবার ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলো, রাসবিহারীর মোড়ে আমায় নামিয়ে দিয়ে পরদিন আসবে বলে চলে গেলো, কিন্তু আমি আর যাইনি। সেই রাগ সেই গা ঘিন-ঘিন ভাবটা কিছুতেই গেলো না আমার। আমি যার সঙ্গে মিশবো আমি ছাড়া অন্য কিছু নেশা তার থাকবে ভাবতে গেলেই গা জ্বলে যাচ্ছিলো। মাতাল মানে তো আমার কাছে একটাই—ভালোবাসা যার নাম। অন্য কিছু আমি সহ্য করতে পারি না যে।

আর আমি ওর সঙ্গে দেখা করিনি। বারবার এসেছে কলেজে, ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কি অন্যায় করেছি? শুনছি, বন্ধু বলতো ওর মায়ের মদ খাচ্ছে। শুনলে ঘেন্নাটা বেড়ে যেতো। মাঝে মাঝে ভাবি, ওর কোন যুক্তি নেই, একটা পুরুষ মানুষ একদিন মদ খেলো কি না খেলো তা দিয়ে ভালোবাসার বিচার হয় না। এই আমিই তো ছেলেবেলায় দেবদাস পড়ে কেঁদেছিলাম। তাহলে? কি বলবো একে, এই অহঙ্কারকে? বলো? আমি খারাপ, খুব খারাপ, তাই এরকম করতে

পারলাম, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি নিজেকে।

এরপর অশ্রুতভাবে গদ্যটিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। কেমন করে বন্ধে নিয়েছিলাম, আমি কাউকে ভালোবেসে পেতে পারি না। বইয়ে পড়লাম একটা মেয়ে জীবনে একবারই ভালোবেসে মরে, মরে শহীদ হয়ে যায়। স্বিচারিণী বা বহুবল্লভা শব্দগুলো তো এই সংজ্ঞাকে যে মানে না তাদের জন্যেই রাখা হয়েছে। তাই না? রমেনদার পর বিভূতি, আমি অনেক ভেবেছি, একটি মেয়ে সত্যিকারের ভালোবাসা কবার বাসতে পারে! স্বীকার করছি, রমেনদার ব্যাপারে আমি ছেলোমানুষ ছিলাম। তবু এখনো রমেনদার সেই জ্বরো মদ্যুখটা মনে করলেই বন্ধের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। কেন? তাহলে আমি বিভূতিকে কি করে ভালোবাসলাম? না হলে ও যখন গাড়ির বন্ধ বাতাসে আমাকে আদর করতো আমি কেন বারবার সরে সরে যেতাম? কি সুখে? বেশ, বিভূতিকেই আমি আসল ভালোবাসা যাকে বলে তাই বেসেছিলাম যদি বলি, দুঃখ পাইনি কেন ছাড়াছাড়ি হবার পর। কেন পাগল হয়ে যাইনি। আমি কি স্বিচারিণী? জানো, সন্নি, আমার বিশ্বাস আমি নিজেকেই ভালোবাসতে পারিনি কখনো, আর নিজেকে ভালো না বাসলে অন্যকে ভালোবাসা যায় না। তাই না?

এখানেই সবকিছু থেমে থাকতে পারতো। বরেন মদ্যুখার মতো একজন অফিসার (যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি) আমার জীবনে এসে আমাকে গোটা তিনেক সন্তানের মা করে দিতে পারতো নিঃসন্দেহে। শরীর, আমার শরীর। এর সব চাহিদা আমি বৃষ্টি না। পুরুষ বন্ধু ছাড়া কলেজের দিনগুলো তো বেশ কেটে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন নতুন অধ্যাপক এলেন। আমাদের পড়াতে। রোগাটে চেহারা, ফরসা, চোখে চশমা। আমার তেমন কিছুই মনে হয়নি। উনি গল্প লেখেন। তরুণ লেখক। 'দেশে' ওর গল্প দেখলাম একদিন। আর এই প্রথম চাক্ষুষ একজন লেখককে দেখলাম। গল্পটার চরিত্রগুলো কেমন বানানো বানানো। ইচ্ছে হচ্ছিলো গিয়ে প্রশ্ন করি। তারপরই কোতুল বা উৎসাহ ফুরিয়ে যেতো আচমকা। ভালো লাগতো না কিছু। দেহবাদ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে একদিন হঠাৎ অধ্যাপক মশাই আধুনিক কবিতায় চলে এলেন। আজকালকার কবি এবং লেখকদের কথা অন্য অধ্যাপক সময়ে এড়িয়ে যেতেন। যেন উনিশশো চতুর্দশের পর আর কিছু লেখা হয়নি। কিন্তু সোদিন উনি যখন আবৃত্তি করলেন, 'আ-আলজিভ চুম্বন করো, শব্দ উঠুক, কাঁপুক ব্রহ্মাণ্ড।' তখন কি হলো জানিনা, আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো, ক্রাসের অন্য মেয়েরা লক্ষ্য পড়ে দেখলাম, আমি কিন্তু ভীষণভাবে শব্দগুলোয় ডুব দিয়ে স্নান করলাম। আমার সেটা অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন। আমি জানতাম, উনি যে কেন লাইন বলতে শুরু করে শেষ করতেন আমার দিকে তাকিয়ে। এদিন আমার মূর্খের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হলেন হয়তো। আমার কাছে ওর চেহারাটা একদম অন্যরকমের হয়ে গেলো। আমি আবার বোকামি করে ফেললাম।

আলাপ হবার পর জানতে পারলাম উনি আমাদের পাড়ার কাছাকাছি থাকেন। ব্যাচেলার লোক। একটা দৃ-ঘরের ফ্ল্যাটে, একদম একা। আমরা তিন-চারজন মেয়ে একদিন দল বেঁধে হানা দিলাম ওখানে, পড়া বন্ধতে। খুব সুন্দর বোঝাতেন উনি। এমনি যখন কথা বলতেন ভারী ভালো লাগতো। কথা বলা যে একটা আর্ট ওর কথা শুনে বন্ধলাম আমি। তারপর একা একা যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম প্রথম চেয়ারে বসে গল্প আর গল্প। রবীন্দ্রনাথের যে এতো ভালোবাসার জন ছিলো তা আমি জানতাম না। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যে মন নিলে নতুন বোঁঠানকে ভালোবাসতেন তা নিয়ে কি, মৃণালিনী দেবীকে ভালোবাসতেন? মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে যখন উনি দাম্পত্য জীবন পালন করতেন তখন কি নতুন বোঁঠানকে একবারও ভাবতেন? তারপর ওঁর বিজয়া? কিংবা আন্থা অথবা নীলিনী? এতো মানুষকে উনি ভালোবাসলেন আর তাঁর মধ্যে তো কোন খাদ ছিলো না! যখন যার কাছে গেছেন তাকে তো পুরো মনটাই দিয়েছেন। মন কি এঁটো হয়? নাকি, উনি বড়, এতো বড় যে ওঁর তৃপ্তি ছিলো না কিছুরেই। নাকি দুঃখ ওকে অতৃপ্ত করেছিলো? আমি তো সাধারণ মেয়ে (তবে সেই কবিতার মতো নয়), তবে কেন এতো সহজে বারবার ভালোবেসে ফেলি এমন করে।

কিন্তু কবিতায় যা সম্ভব বাস্তবে তো তা হয় না। অধ্যাপক আমাকে যখন চুম্বন করতেন তখন আমার শরীরে পদূলক জাগতো না কেন? শব্দ হতো কিন্তু কেন রম্মাণ্ড কাঁপতো না? কেন ওকে অক্ষম দুর্বল মনে হতো? ক্রমশ গা ঘিন ঘিন ভাবটা ফিরে এলো মনে। অনেকবার ভেবেছি এ আমারই অক্ষমতা। নিতে না পারার হীনতা। তারপর যেদিন উনি আমার সবটুকু চাইলেন, আমি পালালাম। কেন? আমি তো ওকে বিয়ে করে সংসার-জীবন যাপন করতে পারতাম এতোদিন! না, আফসোস হয় না একদম, মনে মনে জানি ঠিকই করেছি।

এই সব করে টরে চলে যাচ্ছিল আর কি।

য়ুনিভার্সিটিতে এলাম। আর এসেই তোমাকে দেখলাম। এবার কেউ এসে আমাকে বলেনি ভালোবাসি। শুধু চোখের দেখা বন্ধের মধ্যে এমন করে কিভাবে ঝড় তোলে। কেন বাড়িতে এসে শুতে বসতে পারি না? মনে মনে অনেক ভেবেছি আমি। আমার কাছে পুরুষ মানুষ নতুন নয়। যদিও আলাদা হয়ে কিন্তু তার পরিণতি তো একই মেয়ের হাত মধু থেকে যার যাত্রা শুরু, বন্ধ হয়ে উঠে-সন্ধিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই। তবে কেন বার বার সেখানেই ফিরে যাবো? তবু কেমন জেদের বসে তোমার সঙ্গে নির্লজ্জ মত আলাপ করলাম। করেই বন্ধলাম তুমি এইজন্যেই যেন জেগে আছো। আর তোমার জীবনে মেয়ে আসেনি আমার আগে। বাড়ি ফিরে এসে খুব কষ্ট হলো, ভাবলাম না, আর নয়। তোমার জীবন অশান্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো কিন্তু মনে মনে যে এতো লোভ আমার, ভালোবাসাতে আর ভালোবাসা পেতে, আমি পারলাম না। নিজের কাছেই হেরে গেলাম।

ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে গিয়ে তোমার বন্ধুরা যা করেছিলো আমরাও তো তা করতে পারতাম। তাহলে আজ আমাকে এমন করে জবাবদিহি দিতে হতো না। বিবেকের কাছ থেকে নিস্তার পেতাম। কিন্তু সেদিন বন্ধুলাম ভালোবাসা করে কল।

সোনা, অন্ধকারের যে এতো ভালপালা আছে আমি তা জানতাম না। তুমি বলতে, আমি গম্ভীর কেন এতো! আমার মনে হতো এই একুশ বছরেই আমি খরচ করে ফেলেছি নিজেকে। নিজের বলতে আর এক তিলও বাকী নেই আমার। তোমাকে আমি কি দেবো বলো?

বয়েসে তোমার সমান হবো আমি, কিন্তু তোমার চেয়ে অভিজ্ঞতায় আমি বয়স্ক। আমাকে এমন করে লোভ দেখিও না তুমি। তোমার সামনে গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। জানি একদিন তুমি অনেক বড় হবে। এখনি নিজেকে নষ্ট করবে কেন?

বাবা-মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজেকে বড় না বলেই এই প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। আমার ভয় ছিলো, যদি তোমার সঙ্গে আগের মত আমার বিচ্ছেদ হয়ে যায়—সে আমি সহিতে পারবো না তো।

তার চেয়ে এই ভালো। আমিই এগিয়েছিলাম, আমিই সরে যাচ্ছি। সব দোষটুকু আমার সঙ্গে থাকলো।

তুমি এ নিয়ে একদম ভাববে না। (কি বোকার মত বলছি)। সন্মিত, আমার, সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগের আঙুল উঁচিয়ে না, প্লিজ। অসাধারণ নাই বা হলে সাধারণের দলে ভীড় করো না, দোহাই।

একটা লোভ মনের মধ্যে মাথা কুটছে। জানতে ইচ্ছে হয় কতদিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারো, কতদিন? আচ্ছা ধর, পাঁচ বছর পরে যদি আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তুমি আমায় নিতে পারবে? অপেক্ষা করতে পারবে? ততদিন এই পৃথিবীতে যাই হোক না কেন?

কি জানি কি হয় আমার!

আমি জানি তুমি আমার থাকবে। আমি আমার অন্ধকার ধুলে মদুছে আসি, লক্ষ্মীটি। আমাকে সুযোগ দাও।

ভালো থেকে বলতে কান্না পাচ্ছে কেন গো?

তবু ভালো থেকে। 'এই আমি রেগে'।

ভালো আছি, আমি খুব ভালো আছি। হাসতে গিয়ে থমকে গেলো সন্মিত। ব্যবহারে সব কিছুই ধার কমে যায়। প্রথমদিন এই চিঠি পড়ে বন্ধুর মধ্যে পাক খেয়ে যায়।

কাল রেগে আবার ফিরে গেলো বরেনের কাছে। কেন?

এ চিঠি কেন রেখে দিয়েছিলাম আমি? একটা বাড়ি সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবার

পর তার প্ল্যানটা রেখে দিয়ে কি লাভ হয় ! বিছানায় উপড় হয়ে শুলে ফস করে দেশলাই-এর কাঠি জ্বাললো সন্মিত। কাগজের একটা কোণ ধরে ফেললো ছোট আগুনটা। তারপর অক্ষরগুলো দুমরে মদুছরে কেমন কালো কালো হয়ে যেতে লাগলো। মেঝেতে ফেলে দিলো ও পড়তে থাকা চিঠিটা। তারপর কি মনে হতে ছবিটাকেও আগুনের ওপর উপড় করে রাখলো, গন্ধ বেরুচ্ছে এখন। চোখ পড়লো ওর, জলের মতো বিড়বিড় করে কি উঠছে ছবিটা থেকে ? রেণুর মদুখ আগুনে উপড় করে রাখা। চোখ বন্ধ করে শব্দে গিয়েই ও কান খাড়া করলো। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এসে থামলো ওর দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কড়া নড়ে উঠলো। কে ?

উঠে দাঁড়ালো ও খাট থেকে। ধোঁয়া উঠছে পদুড়ে যাওয়া চিঠি আর ছবি থেকে। পা দিয়ে ছাইগুলো মাড়িয়ে দিতে লাগলো ও। না আগুন নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো ছবিটার একটা কোণ পুরোটা পোড়ে নি। হেঁট হয়ে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, ধোঁয়াটে কাগজে তিনটে কালো কালো অক্ষর অর্ধেক পোড়া। খুব অস্পষ্ট কিন্তু আন্দাজে পড়ে নেওয়া যায়—এই আমি রেণু।

হঠাৎ সন্মিতের মনে হলো যেন এইমাত্র একটি শব্দ দাহ হয়ে গেলো, আর ও তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিত্তের আগুন নিভে গেলে জল ঢেলে দেওয়া হয়ে গেলে যে অশ্রুত শূন্যতা চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে—সন্মিত যেন তা টের পাচ্ছিলো।

দরজায় আবার শব্দ হলো। ভারী পা টেনে টেনে সন্মিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখন ওর খেয়াল নেই যে ওর হাতের মদুঠোয় সেই আধপোড়া ছবির টুকরোটা ছাইমাখামাখি হয়ে রয়েছে।

খানিক বাদে বরেন বদুঝতে পারলো আজ রাত্রে ওর ঘুম আসবে না। এমনিতেই আজকাল ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু আজ অসম্ভব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ও কিছুক্ষণ পায়চারি করলো। এখন এ বাড়ি চুপচাপ, এমন কি পাড়াটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। পরিষ্কার একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া গেলো সম্পর্কের—বরেন ব্যাপারটা ভালো। এতো রাত্রে রেণু ফিরে এলো, একা কি ব্যাপার ? আর আজ প্রথম ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো, আত্মসমর্পণ করতে চাইলো। কেন ? এই ব্যাপারটা যদি ফুলশয্যার রাত্রে করতো ও, তাহলে এতদিন ধরে বরেনকে এভাবে জ্বলতে হতো না। সামনে পড়ে থাকা জীবনটাই অশ্রের মতো হাতড়াতে হতো না। হঠাৎ ওর মনে হল, মেয়েটা বোকা ও বোকা না হলে এরকম পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম করে ! জামশেদপুরে প্রথম সোদিন ওকে দেখেছিলো সোদিন যেভাবে রেণু হেঁটে এসেছিল, যেভাবে অন্যান্যনস্ক হয়ে পার্কের ফোয়ারাগুলো দেখেছিলো, বরেন হঠাৎ সেই রেণুকে ভেবে ফেললো।

আশ্চর্য রকমের একটা হার হয়ে গেল ওর। আজ অবধি জীবনের কোনো পরীক্ষাতে হারেনি ও, কর্মজগতে বাধা পায়নি কখনো কিন্তু একটা সামান্য ছেলের

কাছে হৈরে যেতে হচ্ছে ওকে। যে ছেলের কোন চালচুলো নেই, মেরদুদ নেই। মেরদুদ থাকলে ও এমন করে রেণুদর বিয়েটা হতে দিতো না। নাকি এখনও প্রতীক্ষা করে আছে, কবে রেণু ফিরে আসবে? না তা নিশ্চয়ই নয়—তাহলে রেণু আজ এভাবে আত্মসমর্পণ করতে আসতো না।

সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বরেন। বাতাসে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেলো সেটাকে, তারপর রাস্তায় পড়ে গাড়িয়ে যেতে লাগলো। এতো দূর থেকেও বরেন টুকরোটোর মধুখে আগুনের ফুলকি উড়তে দেখলো আগুনটা নিভিয়ে ফেললে হতো কিন্তু না, এখন আর ফুলকি উড়ছে না, যে কোন আগুন একসময় নিভে যায়।

আজ রেণুদর চলে যাওয়া মানে চিরকালের জন্য যাওয়া। সারাটা জীবন এখন একা একাকীকাটাতে হবে। যদি বিচ্ছেদ আইন মেনে নেয়, যদি রেণু কোন ক্ষতিপূরণ দাবী নাও করে তাহলে আবার কাউকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার কথা কল্পনা করতে হচ্ছে হয় না। অন্তত এই বয়সে। এইভাবে হেরে যেতে ওর ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু কি করতে পারে এখন, কি করা যায়।

খুঁট করে কোথাও একটা শব্দ হলো। কেউ যেন দরজার ছিটাকনি খুললো। এই নিস্তব্ধ রাত্রে শব্দটা বেশ জোরেই ওর কানে এলো। কিন্তু বোঝা যায় যেই দরজা খুলুক সে চেয়েছিলো খুব সন্তর্পণে করতে। সতর্কতার একটা ছাপ রয়েছে শব্দের মধ্যে। এতো রাগিতো আর কে জেগে আছে? রেণু এসেছে মা বা নীরেন নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ওরা কেউ একবারও সামনে আসেনি। নীরেনের সঙ্গে ও নিজেকে মেলাতে পারছে না আর। মায়ের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারিনি ও আজো। মা যেন কেমন একটা দরুণ রেখে গেছেন চিরটা কাল। ওর মনে মনে ভয় হয়, শেষ বয়সে এসে বাবা মাকে এমন করে আর একটা সন্তান দিলেন তা বোধহয় মা ক্ষমা করতে পারেনি কোনকালে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কেমন ছাড়াছাড়া ছিলো। বরেনও মাকে কোনদিন ঠিক কাছের করে পারিনি। বিয়ে করে স্বাক্ষর করে নিয়ে এলো সে তো অনেক দূরের মানুষ।

চাপা পায়ের আওয়াজ কানে এলো। কেউ যেন খুব সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। শব্দ না করে বাইরের বারান্দায় এলো বরেন। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। প্রায় শেষ রাত্রে কলকাতাকে কেমন ঘুমে কাদা বাচ্চা ছেলের মত দেখাচ্ছে। রেণুদর ঘরের এদিকের দরজা খোলাই ছিলো, এখনো বন্ধ করেনি। তবে আলো নেভানো। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো বাইরের আবছা আলোয় ঘরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আলো জ্বালালো বরেন। না, ঘরে কেউ নেই।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো বরেন। রেণু কোথায় গেলো? এতো রাত্রে? একটু আগে শোনা শব্দ এবং চাপা পায়ের আওয়াজ ওর মনে পড়লো। তাহলে রেণুই কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এই সময়ে ও কোথায় যাবে? প্রশ্নটা মনে হতেই ওর পায়ের তলা কেমন শিরশির করে উঠলো। রেণু যদি পরিচিত কারো

কাছে যেতো তাহলে নিশ্চয়ই ভোর অবধি অপেক্ষা করতো। তাহলে? রেণু কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

ব্যাপারটা ভাবতেই ওর মাথার মধ্যে একসঙ্গে কতগুলো চিন্তা হুড়মুড় করে এসে গেলো। রেণু যদি আত্মহত্যা করে তাহলে কি হবে? ওর চাকরী, ওর সম্মান? আঃ! এরকম বোকামি ও কি করবে? হঠাৎ সেই বইটার কথা মনে পড়ে গেলো ওর। গ্রান্ড হোটেলের তলা থেকে কেনা—পয়েজড্ ফর দ্য কিল্। রেণু যদি মারা যায় কেউ বিশ্বাস করবে? যদি ওর বিরুদ্ধে কেউ খুনের অভিযোগ আনে? আনতে পারে, খুব সহজেই পারে। ওদের সম্পর্কের কথা কারোর তো অজানা নেই। রেণুর বাড়ির লোক কি ছেড়ে দেবে? তাছাড়া এ পাড়ার লোকজন বলবে ওরা কি ভাবে দিন কাটাতো। বরেনের মনে হলো সেই বইটার ছবির মতো কেউ যেন ওর দিকে ওৎ পেতে বসে আছে, এখন যে কোন মূহুর্তেই লাফিয়ে পড়তে পারে।

কাল সকালে আমি একটা বেশ্যার মুখ দেখতে চাই না—এইভাবে কথাগুলো না বললেই হতো। অথচ তখন এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো ও, এতোটা ভাবনি। ব্যাপারটা তো অন্যভাবে ট্যাকল করা যেতো। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো বরেন। রেণুর ঘরের মধ্যে কোন চিহ্ন নেই। এ ঘরে কেউ ছিলো, এখন এই মূহুর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বসার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো বরেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্লকের মধ্যে ধক করে উঠলো। বাইরের দরজাটা হাওয়ায় নড়ছে, সামান্য খোলা।

দ্রুত পায়ে বাইরে এলো ও। দরজা খুলে দাঁড়াতেই নজর পড়লো, এপাশের ব্যালকনিতে যেখান থেকে সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচে, রেণু দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা ওকে পাথরের মূর্তির মত মনে হলো বরেনের। লোহার রেলিং-এ দুহাতের ভর দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে ঝুঁকে আছে ও যে কোন মূহুর্তে পড়ে যেতে পারে।

প্রায় পা টিপে টিপে বরেন রেণুর পেছনে এসে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো রেণু চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে যেন আঁতকে উঠলো, তারপর একটা হাতে মুখ চেপে বলে উঠলো, ‘না-না-না!’ ওর চোখ বড় হয়ে উঠেছিলো, মৃগী রোগীর মত গোঙাতে লাগলো ও। বরেন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলো, হঠাৎ দেখলো, রেণু পড়ে যাচ্ছে।

ওকে ধরে ফেলবার আগেই রেণু মেঝেতে পড়ে গেছে। চাপা গোঙানি বেরুচ্ছিলো মুখ থেকে প্রথমটায় তারপর অজ্ঞান হয়ে গেছিলো। কুলকুল করে ঘামতে লাগলো, দুপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো, না, কেউ নেই। তারপর চট করে রেণুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো ও।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর রেণুর শরীর থেকে অশুভ্রুত একটা মিষ্টি গন্ধ এসে ওর শরীরে মাখামাখি হয়ে গেছে। দুটো হাতে, ব্লকে, যেখানে রেণুর শরীরের ভার

ছিলো সেখানে অন্য কিছু বোধ করলো ও। চট করে বাইরের দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বরেন। রেণু তেমনি শব্দে আছে। মদুখটা উপদ্রব করা, লম্বা গলার নীল শিরাগুলো দপ দপ করছে। মদুখটা ঈষৎ হাঁ করা তাই দাঁতের সাদাটে অংশ চিক চিক করছে আলোয়।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে কপালের ঘাম মুছলো বরেন। ওকে দেখে রেণু ওরকম করে উঠলো কেন? ভয় পেয়েছিলো এটা ওর ভঙ্গীতে বোঝা গেছে স্পষ্ট। কেন? ও কি ভেবেছিল বরেন ওকে খুন করবে? রেণু কি নাভাস' অথবা ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি কিছু খেয়েছে? রেণুর বদকের ওপর হাত রাখলো বরেন। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক শব্দ করছে। সব মানদুষের হৃৎপিণ্ডই এক শব্দ করে তবে সবার সুখ দুঃখ সমান হয় না কেন? চোরের মত হাতটা সরিয়ে নিলো ও। এখন কি ডাক্তার ডাকা উচিত নয়? যদি জ্ঞান না ফেরে। ও অসহায়ের মতো রেণুর মদুখের দিকে তাকালো। স্মেলিং সল্ট নেই বাড়িতে। বরং জল ছিটিয়ে দিলে কাজ হবে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের টেবিলের ওপর বইটা খোলা। 'পয়েজড্ ফর দ্য কিল' শিরশির করে উঠল ওর শরীর। এই বই কোথা থেকে এল এখানে? কে আনল? দ্রুত এসে বইটা তুলে নিলো ও। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘরের কোণায়। বইটা কি রেণু পড়ছে? তাই কি ও এমন শিউরে উঠেছিল বরেনকে আচমকা পাশে দেখতে পেয়ে! রেণুর সেই চোখ, হাত চাপা দেওয়া মদুখের গোষ্ঠান—বরেন দুহাতে মদুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লো। ওর এতো দিনের সংঘম, ব্যেস ব্যেসে আনা অভিজ্ঞতা সব যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো আচমকা। দুহাতে মদুখ ঢেকে শিশুর মত কেঁদে উঠলো বরেন।

হঠাৎ ওর খেয়াল হলো কেউ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তারপরেই ও মাথায় হাতের স্পর্শ পেলো।

রেণু ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মদুখ পাথরের মত উদাস, বরেনকে তাকাতে দেখে হাত সরিয়ে নিলো। কখন ওর জ্ঞান ফিরেছে, কখন ও খাট থেকে উঠে ওকে দেখেছে, দেখে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একদম টের পায়নি বরেন।

রেণুর চোখের দিকে তাকালো বরেন। এখন ওর নিজের দুটি ক্রমেন আবছা, বড় ভারী লাগছে চোখের পাতা। চোখ সরালো না রেণু। কোন রকম রেখা ফুটলো না ওর মদুখে। বরেন শুনলো রেণু বলছে, 'এখন আচমকা করবো?'

আর এই সময় বরেনের মনে হলো ওর মত রেণু ভীষণ একা। কি নিঃসঙ্গ হয়ে ওরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে অথচ যার পরিণতি কারো কাছে মদুখের হবে না। না, আর ও হারতে পারে না। জেতার সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।

বরেন উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি কথা বলো না, তোমার শরীর ঠিক নেই।'

হাসতে চাইলো রেণু, ‘আমি ভয় পেয়েছিলাম। এতো ভয় নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি মৃত্যু দেখাতে চাইনি।’

বরেন কোন কথা বললো না। চোখ সরিয়ে নিলো রেণু, ‘এখন আমি কি করবো।’ নিজের মনে যেন কথাটা বললো ও।

‘তুমি আমার কাছে থাকবে। এছাড়া মুক্তি নেই,’ বরেন বলে ফেললো।

দুটো ঠোঁট চেপে থর থর করে কেঁপে উঠলো রেণু, তারপর ধরা গলায় বললো, ‘আমার যে একজনের কাছে দায় থেকে গেছে?’

দরজা খুলে সন্মিত বলতে যাচ্ছিলো কাকে চাই? ওর সামনে যে ভদ্রলোক পাজামা পাজাবী পরে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ও চেনে না, দ্যাখেওনি কোনদিন। এই কদিনে এতো নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে বাধ্য হচ্ছে ও, এখন বিরক্ত হলো। ও প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলো এমন সময় ভদ্রলোক দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। আর এই সময় ওর নজর পড়লো ভদ্রলোকের পেছনে একটু আড়ালে আর একজন দাঁড়িয়ে, যার পরণে হলুদ শাড়ি, চওড়া কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ পরা, সেই চিরকালের ভঙ্গিতে ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে সরাসরি ওর মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু কেঁপে উঠলো সন্মিত। বৃকের মধ্যে সেই রবারের বলটা হঠাৎ ভ্রূপ খেতে আরম্ভ করলো।

সন্মিত দেখলো ভদ্রলোক হাসছেন। লম্বা চেহারার চিল্লিশে এসে পড়া বয়েসটা পাকাপাকি জানান দিলেও ভঙ্গীতে একটা সহজ তারুণ্য আছে যা চট করে বোঝা যায়। এই তাহলে রেণুর স্বামী।

নমস্কার করে বরেন বললো, ‘আমার নাম বরেন মৃত্যুজী। আর একে তো চেনেন।’

কি বলবে বৃদ্ধিতে পারাছিলো না সন্মিত। রেণু ওর স্বামীকে কেন নিয়ে এসেছে? চিঠির জন্যে কি? না আরো কোন অপমান ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। রেণুর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো ও। বরেন পরিচয় দিয়ে মৃত্যু ফিরিয়েছিলো। দেখলো, রেণু কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘আমি কি এসে কোন অসুবিধে করলাম!’ দুটো হাত সামান্য তুলে অপরাধীর মত ভঙ্গী করলো বরেন। ‘আমি’ শব্দটা লক্ষ্য করলো সন্মিত। দুজনে এসেছে অথচ ও আমরা বললো না। সন্মিত ঘাড় নেড়ে বললো, ‘বলুন কি করতে পারি।’

‘করতে তো পারেন মশাই অনেক কিছু।’ তবু জেমে জেমে বললো বরেন, ‘কিন্তু তার আগে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন তো!’

এক নজর ওদের দেখে নিয়ে সন্মিত বললো, ‘আসুন।’

প্রায় ওর পেছন পেছন বরেন ঢুকে পড়লো ঘরে। সন্মিতের একটু অস্বস্তি হাচ্ছিলো, এমনিতে গোছালো নয়, তাছাড়া দুদিন ধরে ঘরের দিকে একদম নজর দেয়নি ও। জিনিষপত্র ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেডকভারটা পাষ্টানো উচিত ছিলো।

রেণু ঘরে এলো। এসে দরজার পাশে টেবিলটার ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। ওর দুটো হাত সামনে, তাতে একটা ব্যাগ ধরা। বরেন এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

‘খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?’ বরেন হাসিছিলো।

‘অবাক হবার মতো ব্যাপার নয় কি?’ স্দুমিত বললো।

‘না না, তেমন কিছু নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চলে এলাম। আপনি আমার শ্রীর বন্ধু। তাই আলাপ করতে চাওয়াটা অন্যায্য নয়, কি বলেন?’ পকেট থেকে সিগারেট বের করে বরেন স্দুমিতের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো, ঘাড় নেড়ে স্দুমিত না বলতে ও বেশ মেজাজ নিয়ে নিজেরটা ধরালো।

খানিকক্ষণ কেউ কথা বললো না। স্দুমিত টের পেলো আবহাওয়াটা কেমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। যদিও এই ভদ্রলোক রেণুর স্বামী, খুব হাসিখুসী ভাব করছেন তবু কথাগুলো যেন অম্পেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। রেণু কোন কথা বলেনি ঘরে এসে অবধি। এখন একদৃষ্টিতে দেওয়ালে টাঙানো স্দুমিতের ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। রেণুর মুখের দিকে ও ভালো করে তাকাতে পারাছিলো না, বরেন এখন ওকে দেখছে। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে বলে, কেন এসেছো রেণু? এভাবে তুমি আসবে আমি কল্পনাও করতে পারি না যে।

বরেন কেন এসেছে? ও কি কিছু একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়? রেণু এবং নিজের সম্পর্কটা স্দুমিতের সামনে রেখে ভেঙ্গে দিতে চায়? মনে মনে তৈরী হয়ে গেলো স্দুমিত, তেমনি হলে ও সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেবে। এই রেণু, সামনে যে মুখ তুলে ছবি দেখছে, বরেন সেরকম কিছু করতে চাইলে সানন্দে ওকে গ্রহণ করবে স্দুমিত। রেণুর কোন ভুল বা অন্যায্য ওর মনের কোথাও ছায়া ফেলাছিলো না এখন। রেণুর মুখের দিকে তাকালে নিজেকে সন্মত মনে হয় এখনো। ও ভাবলো রেণুকে বসতে বলবে, এখানে, এই খাটে।

‘আপনার আজ অফিস নেই?’ বরেন কথা বললো।

হাত দিয়ে, মুখের ব্যাণ্ডজগুলো দেখালো স্দুমিত, ‘এভাবে অফিসে যাওয়া কি শোভন হতো?’

সোজা হয়ে বসলো বরেন, ‘সত্যি, এভাবে আপনাকে জড়িয়ে পড়তে হলো বলে আমার খারাপ লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি আপনার ওপর শারীরিক টচার হবে। আমার বিশ্বাস, রেণুও জানতো না।’

স্দুমিত বললো, ‘এখন এসব ভেবে কি হবে। আমার পেছনে তো আপনিও লোক লাগিয়েছিলেন! টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন আমাকে। আপনি কি মনে করেছিলেন টাকা দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারেন?’

বরেন ওকে দেখলো, তারপর হেসে ফেললো, ‘আপনার অভিযোগ সত্যি।’

‘কি চান আপনি?’ স্দুমিত সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলো।

কথাটা একটু জোরে হয়ে গিয়েছিলো, রেণু মুখ তুলে ওকে দেখলো।

মাথা নাড়লো বরেন, ‘না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। জানিনা কি চিঠি

জ্ঞাপনার কাছে আছে—যাই থাক তার দাম নিশ্চয়ই আপনার কাছে অনেক । নইলে দ্বিতীয়া অল্প টাকায় সে চিঠি আপনি আমার লোককে দিয়ে দিতেন । তাই না ? আমি সেই চিঠি নিতে আপনার কাছে আসিনি ।’

‘তাহলে কেন এসেছেন ?’ স্দমিত বললো ।

‘স্দমিতবাবু, ও চিঠির কোন দাম আমার কাছে এখন নেই । রেণু আপনাকে যা লিখেছে সে ওর নিজস্ব ব্যাপার—অংশীদার আপনি । আমি আর এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না ।’ বরেন হাসল, ‘আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ।’

কি শুনছে ও ? স্দমিত ঠিক বদ্বতে পারাছিলো না । ‘চিঠিটা হঠাৎ এতো মূল্যহীন হয়ে গেলো কি করে ? ও মেঝেতে পড়ে থাকা ছাইগুলোর দিকে তাকালো । টুকরো টুকরো হয়ে সেগুলো হাওয়ায় ঘরময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে । বরেনের দিকে তাকালো ও, ‘বলুন ?’

‘আপনি কি এখনো রেণুকে ভালোবাসেন ?’ খুব ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করলো বরেন । করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ।

এরকম একটা প্রশ্ন বরেন করতে পারে ভাবতে পারেনি স্দমিত । রেণুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলো । রেণু কোনো কথা বলছে না কেন ? রেণু কি বদ্বতে পারছে না ওর কষ্ট হচ্ছে । এভাবে কিছুক্ষণ চললে ও বরেনকে মেঝে বসতে পারে । খাটের ওপর সোজা হয়ে বসলো স্দমিত, ‘কি বলতে চাইছেন ?’

‘বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি । রেণু আমার কাছে বলেছে ওর নাকি আপনার কাছে কি দায় কি থেকে গেছে । দেখুন, আমি কোন মেয়েকে ভালোবাসার স্দযোগ পাইনি । প্র্যাক্টিক্যালি আমি এই বয়সের আবেগ ঠিক বদ্বতেও পারি না । আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি ওকে দায়মুক্ত করুন ।’ বরেন উঠে দাঁড়ালো ।

‘না, ‘আমার কাছে কারো কোনো দায় নেই । এ আপনি কি বলছেন ? যেটা ছিলো, সেটাও একটু আগে নষ্ট করে ফেলেছি ।’ আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে ছাই-গুলো দেখালো স্দমিত, এখন আপনারা আমাকে একটু একলা থাকতে দিন ।’

কেন অস্বাভাবিক গলায় বরেন বললো, ‘আপনাকে ছাড়া যে আমার, আমাদের চলবে না ।’

‘মানে ?’ স্দমিত অবাক হয়ে তাকালো ।

‘আপনি তো রেণুর বন্ধু । বয়সে যদিও আপনি আমার অনেক ছোট, তবু, তবু আমি আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই আপনার অর্পিত আছে ?’

‘কেন ?’

‘সব কেনের কি জবাব দেওয়া যায় মশাই ! আমার ইচ্ছে আপনি আমাদের বন্ধু হোন । রেণুকে যদি আপনি ভালোবাসেন তাহলে ও যাতে সুখী হয় তা নিশ্চয়ই চাইবেন ? আমি চাই আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসুন । বন্ধুর মতো । রেণু খুশী হবে, আমি ওকে খুশী দেখতে চাই ।’

কি একটা বলতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো সন্মিত। ওর বুকের ভিতর থর থর করে কাঁপাছিলো। এই লোকটা হাসি হাসি মুখে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তা কি খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে? এর চাইতে যদি সরাসরি ঝগড়া হতো তাহলে ও বোঁচে যেতো। একটা নতুন ফাঁদে ওকে ফেলার আয়োজন তৈরী হয়ে গেছে।

‘কি ভাবছেন এতো! সন্ধি করতে হলে তো অনেক কিছু ছাড়তে হয় মশাই। আসন্ন, হাত বাড়ান।’ হাসতে হাসতে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো বরেন।

সন্মিত পাথরের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। রেণুর দিকে তাকালো এবার। উড়ে আসা ছাই পায়ে করে চেপে ধরেছে রেণু। গন্ধুড়ো হয়ে যাচ্ছে সেটা। সন্মিত দেখলো রেণু কাঁদছে। তারপর সেই কান্নামাখা মুখ তুলে অদ্ভুত প্রত্যাশা নিয়ে সন্মিতের চোখের ওপর চোখ রাখলো ও।

মুখ ফেরালো সন্মিত। ও দেখলো, একটা লোমশ বয়স্ক হাত তার পাঁচটা আঙ্গুল প্রসারিত করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়লো ওর নিজের ডান হাতের মূঠোয় সেই ছবির আধপোড়া টুকরোটা এখনো ধরা রয়েছে। অস্পষ্ট তবু যেটায় পড়া গিয়েছিলো—এই আমি রেণু।

এখন ও কি করবে? অসহায় চোখে ও আবার রেণুর দিকে তাকালো। আর এইসময় হঠাৎ ওর মনে হলো, রেণুর এই মুখ, এই চোখ, এই ভঙ্গী—এর আগে কখনো দ্যাখেনি ও।

ডান হাতের মূঠো আলাগা করলো সন্মিত।

মেয়েরা এত দ্রুত নিজেদের চেহারা বদলে ফেলে কি করে? কেমন করে!



বড়গল্প

টিনা

দূর থেকে বাংলাটাকে দেখলে মনে হয় যেন স্বপ্নের একটা জাহাজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু ওদের লাগোয়া বাংলাটা প্রায় সিকি মাইল দূরে এবং পুরো এলাকাটার চা-গাছ ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে তাই এই সন্ধ্যাবেলায় পাখির চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। শূদ্ধ ডাক শব্দে সেটা কোন্ পাখির গলা বলে দিতে পারে অনিল, টিনা তা পারে না। টিনা অনেক কিছুই পারে না।

অথচ পারি না বললে এই পৃথিবী শব্দে না। যেটা সহ্য করা অসম্ভব মনে হয়, যার সঙ্গে মানিয়ে চলতে প্রতিনিয়ত অস্বস্তি হচ্ছে তাকেও বহন করে যেতে হয়। কেউ মৃদু বুদ্ধি করে, কেউ প্রতিবাদ জানিয়ে। এই রকম না পারার তালিকা করলে টিনা সেটা কোথায় শেষ করবে এক পলকে ভাবতে পারবে না। শব্দেই অর্থাৎ একনম্বর আপত্তি, সপ্তাহের ছ' ছটা দিন এই নিজ'ন বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। নিজ'ন মানে কি জনহীন? তা নয়। বাড়িতে তো গোটাছয়েক মেয়ে পুরুষ আছেই, তারা হুকুম তামিল করে এবং হুকুম না করলেও খড়ির কাঁটার মতো সব কিছু ঠিকঠাক করে যায়। তারপর রেডিওগ্রাম আছে, টেপ-রেকর্ডার আছে। মাঝে মাঝে সেগুলোকে তারস্বরে খুলে দিলেও এ খড়ির বাইরে কেউ শব্দেতে পারে না। মদেিশিয়া এবং নেপালী ঝি চাকরদের সঙ্গে তো সারাদিন আশা মারা যায় না। অনিল সেই সাত-সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম প্রথম টিনা উঠে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে দাঁড়াত। পুরো পেরোলে এখানে ভীষণ শীত, সমস্ত শরীর শালে মূড়ে টিনা অনিলের ষাওয়া দেখত। এখন আর ওই সাত-সকালে বিছানা ছাড়ে না টিনা। খিমা নামের যে আদিবাসী মেয়েটা রান্না করে সে ঠিক সময় চা দেবে। কাজের চাপ না থাকলে নটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করতে ফেরে অনিল। তারপর দুপুরে একঘণ্টার জন্য লাগ। কাজ শেষে ফিরতে সন্ধ্যা তো বটেই, কখনো কখনো বেশ রাত হয়ে যায়। চা বাগানের চাকরিতে অনিল একদম বেমানান। এটা টিনা বোঝে। কিন্তু বেশ তো মানিয়ে যাচ্ছে। সিনিয়রিটির দিক দিয়ে ওর জায়গা ভরার পরেই। কিন্তু যে লোকটা জ্যোৎস্না দেখলে সারাদিন কান্না ঠেঙ্গিয়ে এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আদিগন্ত সবুজ গাছের মতো চা-গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দ পড়ে সে কি করে এই চাকরি মানিয়ে নেয় টিনা বোঝে না। সারাটা দিন টিনার যে কি ভাবে কেটে যায় অনিলের সঙ্গে আর জিজ্ঞাসা করে না। এটা কিছুতেই মানতে পারে না টিনা। কথা কবার লোক নেই একটাও, এটা অসহ্য। তালিকার দ্ব'নম্বর হল এখানকার পরিবেশ। বাংলা থেকে বেরিয়ে অন্তত সিকি মাইল গেলে অন্য ম্যানেজারের কোয়ার্টার। সমস্ত বাগানে ম্যানেজাররা

বিচ্ছিন্ন স্বাধীন মতো ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্টাফদের কোয়ার্টারগুলো পাশাপাশি, বাস রাস্তার পাশ ঘেঁষে বাজারের লাগোয়া। কুলিলাইন নদীর ওপারে। ওরা সবাই একসঙ্গে হাতে ধরাধারি করে থাকে। শব্দ ম্যানেজারদের আভিজাত্য রাখার জন্য এই রকম আলাদা ব্যবস্থা। কোন ম্যানেজার স্টাফদের সঙ্গে কাজের বাইরে সম্পর্ক রাখতে পারবে না—ব্রিটিশ আমলের এই রকম আদেশ এখন বজায় রয়েছে। অনিলের সঙ্গে গাড়িতে স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে দিলে যেতে যেতে টিনা ওদের দেখেছে। আপাত চোখে কোন পার্থক্য চোখে পড়েনি। ওদের কোয়ার্টারগুলোর সামনের মাঠে মেয়েরা গোল হয়ে বসে রুমাল চোর খেলে, ছেলেরা হাডুড়। গাড়ির জানালায় বসে শব্দ এক ঝলক দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই টিনার। আর স্টাফরা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ম্যানেজারের বাংলায় এসে আশা মারবে। অনিল বলে স্টাফদের সঙ্গে কুলিদের সম্পর্কও নাকি অনেকটা এই রকম অথচ টিনারও বাঙালী স্টাফরাও তাই।

তালিকার তিন নম্বর হল অনিলের সঙ্গে কাজ করা অন্য ম্যানেজারগুলো। এক একজন খুদে নবাব সব। চালচলন কথা বলার মধ্যে মনে হয় যেন পৃথিবীতে সেই সব আর কারো অস্তিত্ব নেই। ওদের বাংলায় বেড়াতে গিয়ে টিনা আরো 'বোর' হয়েছে। বড় সাহেব ভার্ভা এভারগ্রীন ব্যাচেলার। বাড়িতে তিনটে ডবকা মেই ডসার্ভেণ্ট নিয়ে আছেন, টিনার দিকে তাকালে যেন বুক ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না। এইসব পুরুষগুলোকে আগাপাশতলা চাবকাতে হয়। ভদ্রতা জিনিসটা লোকটার রকম নেই। নিজে প্রচণ্ড খাটে আর সেই রকম খাটায় সবাইকে। অফিসার্স ক্লাবেও প্রতাপ খুব। তবে ওই তাকানো ছাড়া টিনার সঙ্গে কোন রকম বদমায়েসী করেননি ভার্ভা। মাঝে মাঝে মনে হত যদি অনিলের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ ভার্ভা ওদের কোয়ার্টারে বেড়াতে আসে তাহলে টিনা কি করবে? কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভার্ভা সে-রকম কিছু কখনো করেনি। সোম সাহেবের বউয়ের সঙ্গে একটা পার্টটাইম ব্যাপার আছে ভার্ভার।

সোম সাহেবের বউয়ের বয়স চাষিশের ওপাশে। কিন্তু সাজগোজ একদম খুবকী সেজে থাকেন। আধুনিক সমাজে মিশেছে টিনা, কিন্তু তাই বলে অত ছোট ব্লাউজ কাউকে পরতে দ্যাখিনি কখনো। মহিলার শরীরে কখনো চর্বি জমেনি, একটু খেঁকুরে মার্কা চেহারা। ইন্দিরা গান্ধীর মতো চুল ছাঁটেন, কথা বলেন বারো বছরের খুবকীর মতো। নেকু! টিনা ওর চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট কিন্তু কিছুতেই ওকে দাঁদি বলতে দেবেন না। সোম সাহেবের কুমিল মাতার মাঝখান অবধি উঠে গেছে। পিছনের চুলগুলোয় পাকা চুল চিক চিক করে। বিশাল ভুঁড়ি ভদ্রলোকের, আশ্চর্য্যে কথা বলেন। টিনার দিকে একদম তাকান না। পণ্ডাশের কাছাকাছি বয়স কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা হয়নি। মিসেস সোম প্রথম আলাপেই নেক গলায় বলেছিলেন, কি করে হবে ভাই ও যে ইম্পোর্টেড। প্রথমে ভেবেছিলাম ডিভোর্স করব কিন্তু পরে দেখলাম না, এই ভালো। কার সঙ্গে আবার জুটবে আর সে

যদি গন্ডা গন্ডা বাচ্চা চায় তো গেছি, ফিগারের বারোটা বেজে যাবে। ভালো করে আলাপ হয়নি তখনো, শব্দে কান গরম হয়ে গিয়েছিল। এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড মূখ আলগা এই মহিলার। সোম সাহেব শনিবার মাঝে মাঝে ডুব দেন, ক্লাবে যেতে চান না। পনেরো মাইল দূরের অফিসার্স ক্লাবে মিসেস সোম ভার্মার গাড়িতে চলে যান।

তালিকার পরবর্তী কিন্তু শেষ নয়, সমস্যা হল অনিল। যেহেতু অনিল টিনার স্বামী তাই এটাকেও মেনে নিতে হবে। বিয়ের আগে অনিল ছিল হুজোড়ে, চোখে মুখে কথা বলত। তখন ও এই চা বাগানে আসেনি, টোকলাই-এ ট্রেনিং নেবার পর আসামের এক চা বাগানে ছিল ও। প্রায়ই চলে আসত শিলচরে। ওখানেই টিনাদের সঙ্গে আলাপ। এবং টিনার ওকে ভালো লেগে গেল। বিয়ের পরই লোকটার একটু একটু করে পরিবর্তন হতে শব্দ হল। সেই আমদে ভাবটা নেই, বরং একটু গম্ভীর, কথা বলে ওজন করে। বোঝা যায় এই চাকরি ওর ভালো লাগছে না কিন্তু সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছুর করার এলেন নেই বলে করতে পারছে না। যে লোকটা দিনের বেলায় নাসারী বেড তৈরি করতে ঠা ঠা রোদ্দুরে জঙ্গল কাটা জমিতে কুলিদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে সে-ই রাত দুপুরে কবিতার বই নিয়ে বসে এটা টিনা চট করে মেলাতে পারে না। এই অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি করে ওর অর্থে অভাব নেই। রাজার মতো বাংলা, গাড়ি, একগাদা কোম্পানির মাইনের চাকর-বাকর, সত্যি বলতে কি খরচ করার জায়গা নেই। অফিসার্স ক্লাবের চাঁদা আর কতটা কমাবে। আগে ড্রিংক করত না অনিল। ইদানিং একটু-আধটু খায়। সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ অন্যান্য মেসবাররা যা চেহারা দেখায় ওখানে সে তুলনায় অনিল যথেষ্ট ভদ্রলোক। তাহলে অনিলের এত দিনে মোটা টাকা ব্যাংক জমে যাওয়া উচিত। টিনা জানে না অনিলের সঞ্চয় কত। আজ অবধি কখনও কারো কাছে হাত পেতে টাকা নেয়নি সে, এমন কি বিয়ের আগে বাবার কাছেও প্রয়োজনে টাকা চায়নি। মাসের প্রথমে যে হাত খরচা পেত তাতেই চালিয়ে নিতে হত। অনিলকে টাকা পয়সার কথা জিজ্ঞাসা করতে অস্বস্তি হয় টিনার। কিন্তু কেউ যদি ওকে প্রশ্ন করে অনিলের সম্পর্কে তোমার নির্দিষ্ট অভিযোগ কি তাহলে চট করে জবাব দিতে পারবে না টিনা। এগুলো মুখে বলা যায় না। অনিল ওকে কখনো অপমান করেনি, ওর প্রয়োজনে কোন কিছুর অভাব রাখেনি। অনিল ওকে সন্দেহ করেনা এবং টিনা ওকে সন্দেহ করবে এমন কোন কাজ করে না। শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া। সেই ব্যাপারটাই ক্রমশ ব্যবধান বাড়ছে। যেটুকু সময় অনিল বাড়িতে থাকে ওর সামনেই বসে থাকে। কিন্তু সারা দিনে কটা কথা হয় সে গুণে বলি দিতে পারে। শনিবার এলেই ওর চাঞ্চল্য বৃদ্ধিতে পারে টিনা। বিকেলে ফ্রান্সিস থেকে ফিরে তাগাদা দেয় টিনাকে। শনিবারের রাতটা ওদের অফিসার্স ক্লাবে জড়ো হবার রাত। প্রথমে ভালো লাগত না টিনার। এখন হাতের কাছে কিছু না পেয়ে এটাই মন ভালো রাখার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে মেনে নিয়েছে। নাচ গানে হুজোড়, এর ওর কেছা

শব্দে দেখে প্রায় ভোর রাতে ওরা বাংলোর ফিরে আসে। টিনা জানে ক্লাবে ঢোকার পর ডিনার খাওয়ার শেষে অনিলকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অথচ ভোর হবার যথেষ্ট আগে সে ফিরে আসে। যখন আসে তখন টিনা স্পষ্ট ওর শারীরিক উত্তেজনাটা বুঝতে পারে। অস্বীকার করবে না, প্রথম প্রথম একটা সন্দেহ বন্ধুর মধ্যে পাক খেত। একদিন ভোর রাতে ওর পাশে গাড়িতে ফিরতে ফিরতে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দেখিনি, কোথায় ছিলে ?

স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে চমকে উঠেছিল অনিল, তারপর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, তুমি আমাকে খুঁজেছিলে নাকি ?

হ্যাঁ।

কেন ?

দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই।

আগে কখনও খোঁজনি ?

খেয়াল করিনি।

আর কেউ আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল নাকি ? প্রশ্নটা করার সময় অনিলের গলায় কাঁপুনি স্পষ্ট টের পেল টিনা।

না। অন্তত আমাকে বলেনি। টিনা নির্লিপ্তের মতো জবাব দিল।

আমি কোন অন্যায় অথবা অবৈধ কাজ করছি না টিনা। তবে এই সময় আমাকে ক্লাবে না পেলে চিন্তিত হবার কারণ নেই। কথাগুলো বলার সময় অনিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। টিনা খানিকক্ষণ চেয়ে রইল স্বামীর দিকে, অনিল ওর দিকে মৃদু ফেরাচ্ছে না। চোখাচোখি হতে চায় না সে।

তুমি কি করছ, কোথায় যাচ্ছ, আমি জানতে পারব না ? প্রশ্নটা করতে করতে টিনার মনে হল আর যা-ই হোক ওই সময় অনিল অন্য কোন মেয়ের কাছে যাবে না। যদি যেত তাহলে ডুয়ার্সের এই চা বাগানগুলোয় সে খবর চাপা থাকত না। সে রকম হচ্ছে যদি কারো থাকে তাহলে অফিসার্স ক্লাবই প্রকৃত জায়গা। রাত বারোটোর পর স্বামীর স্বচ্ছন্দ স্ত্রীদের গুলিয়ে ফেলতে পারে নেশার ঝোঁকে। এর বউ ওর স্বামীর সঙ্গে রাত দুপুরে ক্লাবের সামনের বিরাট বাগানে কোমর জড়াজড় করে ঘুরে এলেও কেউ কিছু বলবে না।

প্লিজ টিনা, এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না। আমার উত্তর তোমার ভালো লাগবে না। তুমি কেন, এ কথা শুনলে কোম্পানি হয়তো ডিসমিসনারি অ্যাকসন নেবে। কিন্তু টিনা তুমি নিশ্চিন্ত থাক তোমাকে অসম্মান করার মতো কাজ আমি করছি না। খুব আশ্চর্য আশ্চর্য টিনাকে আন্তরিক ভাবে বোঝাবার ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল অনিল। মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড আর তারপরেই সিদ্ধান্তের মতো টিনার মাথার ভেতরে সেই ব্যাপারটা চলকে উঠল। কিছু বুঝে নেই, কিছু না। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব ? এই চা বাগান থেকে জলপাইগাঁড়ি শহরের যে দূরত্ব সেটা অনিল কি করে ম্যানেজ করবে ? অসম্ভব, তা হতেই পারে না। কিন্তু অনিলের মনের

দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল সেই অসম্ভবটাকেই সে সম্ভব করার চেষ্টা করছে। সমস্ত হিসেব গুলিয়ে গেল টিনার। এই চা বাগানে ওরা এসেছে প্রায় দশ বছর। কখনও ঘৃণাক্ষরে সে টের পায়নি অনিল ভেতরে ভেতরে—। না, টিনা মাথা নাড়ল, সে নিশ্চয় ভুল সন্দেহ করছে। কিন্তু আর কি ব্যাপার তাহলে হতে পারে? সরাসরি অনিলকে প্রশ্ন করতে কোথায় ধেন ঠেকে যাচ্ছিল। কিন্তু ও তো এইমাত্র কোম্পানির কথাটা তুলল। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকসন আর কি কারণে ওরা নিতে পারে? যখন ওরা আসামে ছিল তখন এ সব কোন সমস্যা ছিল না। এই ডুয়ার্সের চা বাগানে আসবার পর অনিলের কেন পরিবর্তন হয়েছে একটু একটু করে অনুমান করতে পারছে সে। ফ্যাক্টরীর কাজে প্রায়ই রাতে ডিনার খেয়ে বোরিয়ে যায় অনিল। ও কি সত্যিই ফ্যাক্টরীতে যায়? কোন দিন যাচাই করতে যাবার কথা খেয়াল হয়নি টিনার। যাচাই করাটা যে বড় লজ্জার।

বিয়ের আগে টিনার বাবা অনিলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। স্মার্ট হাসিখুশি এবং হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যানকে দেখে ভদ্রলোকের ভালো লেগেছিল। মেয়ের পছন্দ মেনে নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু টিনার মা অতি সহজে গলে যায় নি। না হয় চা বাগানে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি করে কিন্তু তার সামাজিক পজিশনটাও জানা দরকার। হুট বলতে তিনি মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিতে পারেন না। এই সব ব্যাপার কখনো মাথায় আসেনি টিনার। প্রশ্ন শুনে থমকে গিয়েছিল অনিল। শিলচর শহরের বাইরে ন্যাশন্যাল হাইওয়ের ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা দুজন সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কথা বলেছিল। একটু একটু করে অনিলের সব কথা জেনেছিল টিনা। প্রথমে কি করবে বুঝতে পারেনি কিন্তু এটুকু জেনেছিল মা এই ব্যাপারটা মেনে নেবে না। একা লড়ে গিয়েছিল সে, অবশ্য বাবার সমর্থন ছিল। সেই লড়াইয়ে ভালোবাসার অহংকার ছিল। টিনার বাবা স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে অনিলের চাকরিতে প্রধান এবং জরুরী যে সত' সেটা মনে রাখলে কখনই তার পরিবারের সঙ্গে সে মাথামাথি করতে পারবে না। অনিল একটা বিচ্ছিন্ন স্বেপের মতো বাস করছে অতএব আপত্তির কোন কারণ নেই। মেনে নিয়েছিলেন টিনার মা, মনে নেননি। কিন্তু টিনা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল কোন দিন মায়ের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে না। বিয়ের পর কখনই সেরকম সমস্যা সামনে আসেনি। এতদিনে এখানে এসে নিজের সঙ্গে লড়াই শুরু হল। মূখে কোমদিন কিছুর না বললেও সেও কি মনে মনে চেয়েছিল অনিল ওর পরিবারের কাছ থেকে চিরকাল এই রকম বিচ্ছিন্ন থাকুক? ওর খেয়াল হল বিয়ের পর শাশুড়ীকে দেখবার ইচ্ছে একদিনের জন্যও ওর মনে আসেনি। অনিলের পরিবার-প্রসঙ্গ কেউ ভুল করেও আলোচনায় আনেনি কখনও।

অনিল এখন প্রায়ই বলে এইরকম ক্রীতদাসের মতো জীবন একদম ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করি লাথি মেরে বোরিয়ে যাই। কিন্তু গিয়ে কি করব, তোমাদের কি খাওয়াব? আর তখনই বৃকের ভেতরটা নড়বড়ে হয়ে যায় টিনার

একবার এই চিন্তা মাথায় আসা মানে আকাশের এককোণে মেঘটাকে জমিয়ে রেখে দেওয়া। টিনা জানে এই চা বাগানের অনিলের চাকরি মানে অশেষ নিশ্চয়তা। যতই এখানকার নির্জনতা ওর পক্ষে অসহ্য হোক, যতই কথা না বলার লোক না পাওয়া যাক, এই আরাম ওর অহংকারকে শালের মতো উষ্ণ রাখবে। মায়ের কাছে কখনো মাথা নীচু হবে না টিনার, নিজের পছন্দের অমর্যাদা হতে দেবে না টিনা।

তালিকাতে আরও আছে। যে সমস্যাটা ওর হাত বাড়ালেই সেটা হল মেয়ের। ওর একমাত্র কন্যার বয়স এখন আট। ফুটফুটে সুন্দর, মিষ্টি মুখের মেয়ে, হাসলেই গালে টোল পড়ে। এ রকম মেয়েকে ছেড়ে কেউ একটা দিনও থাকতে পারে? তবু টিনাকে থাকতে হচ্ছে। কারণ আশপাশে কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নেই। ডুরাসের এই তল্লাটে যা আছে সব বাংলা মিডিয়ামে চলে। স্টাফদের মেয়ে ছেলে থেকে শুরুর করে মেথর ফরাস অবধি সেখানে বাচ্চাদের পড়াতে পারে। কোম্পানির আইনে এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ আছে। এই সব স্কুলে কখনই কোন ম্যানেজার তার ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারবে না। প্রথম প্রথম টিনারও মনে হয়েছিল নিয়মটা একদিক দিয়ে ভালোই। স্টাফদের ছেলেমেয়েগুলোকে দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় ওরা কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা। অনিল নাকি জলপাই-গুড়িতে নিজে ও রকম স্কুলে পড়েছে। অবশ্য ওকে কেউ ক্যাবলা বলবে না। কিন্তু ব্যতিক্রমই তো নিয়ম নয়। ফলে মেয়েকে পড়াতে পাঠাতে হয়েছে সেই কার্শিয়াং-এ। মাইলের হিসাব করলে প্রায় একশো মাইল। মাসে একদিন যায় ওরা। প্রথম প্রথম খুব কান্নাকাটি করত ওদের সঙ্গে চলে আসবার জন্য ছটফট করত। মন শক্ত করে চলে আসতে হত টিনাদের। এখন ওইটুকুনি মেয়ে ওখানে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। মুখে ইংরেজির খই ফোটে। মায়ের জন্য কোন অভাববোধ নেই। আর সেটা জানার পর থেকেই টিনার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে পৃথিবীটা। এ বছর পাশের চা বাগানের বাংলা স্কুলের একটি ছেলে সারা বাংলার স্কুল ফাইন্যালে যখন থার্ড হওয়ায় ইংরেজি কাগজে ছবি বেরুল তখন অনিল সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অস্বীকার করবে না টিনা, তখন মনে হয়েছিল মেয়েটাকে অত দূরে না রেখে এই রকম স্কুলে যদি ভরতি করা হত তাহলে হয়তো খারাপ হত না। কিন্তু এখন আর সেটা হবার উপায় নেই। কোম্পানি যে রকমটা চাইছে মম্ম সে রকমই হয়ে গেছে। অনিল এটাকে বলে টবের মনিষ্টার্ট। বেশ তরতর করে বেড়ে ওঠে মার্টির সংযোগ ছাড়াই। ঘর সাজাতে দারুণ কাজে লাগে, ফুলফলের ধারে কাছে নেই। নিজের মেয়ের সম্পর্কে ওর কথা কোন মায়ের ভালো লাগে? অনিল যে এই সব কথা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে তা নয়। হয়তো বারান্দার চেয়ারে বসে দূরের চা বাগানগুলোর দিকে তাকিয়ে অন্য মনে বলে ফেলে কথাগুলো। তখন বাইরের লোক কেউ ধারে কাছে নেই, চাকরগুলো নেই। টিনা ওকে বলতে দেখ, মেনে নিতে হয়। প্রতিবাদ মানেই তো অশান্তি। গেস্টরা কেউ এলেই অনিলের চেহারা পাণ্টে যায়। তখন সে খুব কেতাদুরস্ত

চিবিয়ে চিবিয়ে মেপে মেপে হাসে, কথা বলে। বাড়িতে দু-তিন রকমের ড্রিংকস্ আছে, সেগুলোও ওসময় নামানো হয়। ভুলেও ও সব কথা তখন অনিলের মুখ থেকে কেউ শুনতে পাবে না। মনে মনে খুশি হয় টিনা। বেঁচে থাকতে হলে এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবেই। এই পৃথিবীতে কেউ তোমাকে তোমার পছন্দমত সব কিছ্ এনে দেবে না। এই যে সমস্যাগুলো টিনাকে চারপাশ থেকে অহরহ ছোবল মারে সেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়েই ওকে বেঁচে থাকতে হবে। টিনা মনে মনে চায় অনিলও এই সত্যটা বুঝুক। এক এক সময় সে অনিলের প্রতি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। মদুম এত বড় হল কিন্তু অনিল কখনো ওর কাছে আর একটা সন্তান চায়নি। এটা যে কত বড় নিশ্চিন্তি টিনা বোঝাতে পারবে না। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে লড়াই করার সময় আর একটা বোঝা কাঁধে চাপাতে চায় না টিনা।

অনিল

ব্রিটিশরা চলে গেছে অনেক দিন কিন্তু ওদের নিয়মকানুনগুলো নিয়ে যায়নি সঙ্গে। অন্তত চা বাগানের সাম্রাজ্যে সেগুলোকে পায়ে পায়ে চোখে পড়ে। সাম্রাজ্য কথাটা কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। এই কয়েক মাইল চা বাগান এবং ফরেস্টের বাসিন্দা যত মানুষ সব এই কোম্পানির মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। একদম তলায় যারা আছে তাদের সংখ্যাই বেশী। রাঁচী আর হাজারিবাগের যত মদেশিয়া আর ওঁরাও কুলিরা আড়কাঠির হাতফেরতা পাঁচ সাত দশক আগে এই সব জায়গায় বাগান তৈরির কাজে লেগেছিল। এই কুলিরা ওদেরই সন্তান সন্ততি। মুল্‌করাজ আলন্দের 'দুটি পাতা একটি কুড়ি' বইটা আমি পড়েছি। সে সব যুগ এখন কেউ কম্পনাও করতে পারি না। ষোড়ায় চেপে কুলিদের ওপর চাবুক চালানোর যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ওরা দাবী আদায় করার পথটা চিনে গিয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন কি জিনিস তা হয়তো সবাই জানে না তবে প্রয়োজন হলেই ধর্মঘট হয়। মাইনে পত্তর কয়েক বছরে চটপট বেড়ে গিয়েছে ওদের। চোখ রাগিয়ে সব সময় কাজ হয় না। বড়োরা শোনে, কিন্তু অঙ্গপন্থীদের গায়ে হাত বুলিয়ে কাজ করাতে হয়। লেবার ঝড়ানির সঙ্গে আশ্বস্ত না করে কোন ম্যানেজার বেশী দিন টিকতে পারে না। সাসপেন্স অফিসে ওদের হাঁড়িয়া খাওয়ানোর জন্য কিছ্ টাকা রাখা আছে। ওদের ওপরে যারা তারা আমাদের হুকুমমত ওদের চালায়। বেশীর ভাগ স্টাফ, যাদের চা বাগানে বাবু বলা হয়, বাঙালি। সম্প্রতি লেবার ঝড়ানির দাবী অনুযায়ী লেবারদের ছেলেরা কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে বাবু-চাকরিতে ঢুকছে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে বাবুদের অবস্থা কিন্তু খুব বদলায়নি। যদিও ওদেরও ঝড়ানি হয়েছে কিন্তু সংখ্যাগত

এবং মেরুদণ্ডহীনতা ওদের চিরকাল এ রকম করে রেখেছে। বাগানের সব খবরাখবর এই বাবুদের কেউ কেউ আমাদের দিয়ে যায় একটু খাতির পারার আশায়। এর ওপর হলাম আমরা অর্থাৎ এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার। চমৎকার কোয়ার্টার, গাড়ি এবং মোটামুটি ভালো মাইনে এই চাকরিতে যেমন আছে অনেক শহুরে পণ্ডিত এ সব চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। যদি কোন কুলি আমাদের অপমান করে যায় তাহলে আমাদের ম্যানেজারের স্বেচ্ছা হতে হবে। অথচ আমাদের এমন ঠাট-বাট করে যেতে হবে যাতে দেখে মনে হবে আমরা খুব ক্ষমতাবান। যেহেতু আমরা শ্রমিক কর্মচারী নই তাই আমাদের কোন মর্নিয়ন থাকতে পারে না। বরং প্রত্যেক এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের নামে একটা করে লাল খাতা গোপনে রাখা হয়। বিভিন্ন রীতিনীতিতে স্থলন হলেই কলকাতার অফিসে খবর চলে যাবে। আমাদের চাকরি খতম করতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। অথচ আমরা সাহেব। বড়ো কুলিরা আমাদের দেখলে সেলাম দেয়। আমাদের ওপরে যিনি আছেন তিনি সর্বময় কর্তা অর্থাৎ খোদ ম্যানেজার। এই সাম্রাজ্যের যিনি দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। ব্রিটিশরা চলে গেলেও এক সময় ওঁরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। কিন্তু ইদানিং যে কোন বেআইনি কাজের জন্য ডিরেক্টর বোর্ডের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয়। মাঝে মাঝে সরেজমিন তদন্তে ডিরেক্টররা আসেনও। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা চা বাগানের ম্যানেজার মানেই সেই এলাকার প্রভু। তবে তাদের চরিত্র এখন পালাচ্ছে। এখন শুধু গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে আর কাজ হবে না। এই সত্য বোঝার পরে ম্যানেজাররা কৌশল পাচ্ছেন। কুলি মর্নিয়নের নেতাদের সঙ্গে যে ম্যানেজারের যত গোপন আঁতাত থাকবে তিনি তত দক্ষ প্রশাসক। এই যেমন আমাদের ভার্মা সাহেব।

ভার্মা সাহেবের মতো এ রকম গোঁয়ার ও কৌশলী ম্যানেজার আমি দেখিনি। যেন তেন উপায়ে কাজ উদ্ধার করবেন এবং সেটা করার সময় কুলিরা যা যা প্রতিশ্রুতি চায় সব দিয়ে দেবেন। কিন্তু কাজ শেষ হলেই প্রতিশ্রুতি মেটাতে কি অসুভূত টালবাহানা শুরুর করেন। এই প্রথম আমি কোন ম্যানেজারের বাংলোর লনে বসে কুলি নেতাদের সাহেবের সঙ্গে জ্বিঙ্ক করার কথা শুনলাম। এতে কোম্পানীর শিফটচার ভঙ্গের অভিযোগ উঠবে না কারণ প্রশাসনের প্রয়োজনে তাকে এসব করতে হচ্ছে। কদিন আগে ভার্মা খুব বিরক্ত গলায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্রিকেটমির অভিযোগ তুলিছিলেন। ইদানিং আমার সঙ্গে ওর বেশ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এর আগে যে বাগানে ভার্মা সাহেব কাজ করেছেন সেখানে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে অন্তত বিশ হাজার টাকা থাকত। এই টাকা প্রশাসনের প্রয়োজনে ভার্মা সাহেব খরচা করতেন, কোন হিসেব রাখত না, কাউকে জবাবদিহির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাদের এই কোম্পানী নাকি সে রকম সুবিধে ভার্মা সাহেবকে দিতে রাজী নল্ল। বাঁকা পথে খরচের ব্যাপারটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ভার্মা সাহেব এখন অনবরত বলছেন, আমি তো আর গ্যাঁটের পরস্যা খরচ করে

য়ুনিয়ন লিডারদের ড্রিংক করাব না। হুজুজাত হলে কোম্পানি বন্ধবে। আমি বলতে চাইছিলাম যে কুলিদের অকারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওদের বণ্ডিত না করলেই হল, এতে বিক্ষোভের আশংকা থাকবে না। কিন্তু ভাৰ্মাকে বোঝানোর ক্ষমতা এ জন্মে আমার হবে না। লোকটা ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে এবং বৰ্বর।

বৰ্বর কথাটা বললাম ভেবে-চিন্তেই। বছরে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় কাজের চাপ কম থাকলে ছুটি নিতে পারি। ভাৰ্মা সচরাচর কাউকে ছুটি দিতে চান না কাজের অছিলায়, নিজেও নিতে চান না। এ বছরের গোড়ায় হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো ভাৰ্মার মা খুব অসুস্থ, ছেলেকে দেখতে চান। বাধ্য হয়ে ওকে দিন পনেরো ছুটি নিয়ে চণ্ডীগড় চলে যেতে হল। যাবার আগে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে সোমের বদলে আমাকে এই চা বাগানের চার্জ দিয়ে গেলেন। অর্থাৎ পনেরোটা দিন আমি এই বাগানের দায়িত্ব বহন করব। যে কোন ট্রাটি বিচ্যুতির জন্য আমাকেই দায়ী করা হবে। স্টাফদের সঙ্গে আমি কখনো অভদ্র ব্যবহার করিনি, ফলে এই সময়টায় ওরাই আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন। খাটতে হল আমাকে কিন্তু দেখলাম এই পনেরো দিনে বাগানে যা কাজ হয়েছে ভাৰ্মা সাহেবের আমলে তিন সপ্তাহে তাই হত। মা মারা যাওয়ার দুঃসংবাদ নিয়ে ভাৰ্মা সাহেব ফিরে এলেন। আমি ওকে বাগানের রিপোর্ট দিলাম। ওঁর অনুপস্থিতিতে বাগানের ওপর আমার কাজকর্মের এই রিপোর্টে তিনি তাঁর মন্তব্য সংযোজন করে কলকাতার অফিসে পাঠাবেন।

তখন বিকেল। ছুটি হয়ে গেছে অফিস। দু-একজন ছাড়া বেশীর ভাগ স্টাফই সাইকেল চেপে বাড়ি ফিরে গেছে। ভাৰ্মা সাহেব আমার রিপোর্টটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর ঘরের কাঁচের জানালা দিয়ে ছুটে যাওয়া পাহাড়ী অরণ্যটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। সৈদিকে খানিক তাকিয়ে তিনি আমাকে ওঁর বাংলাতে আমন্ত্রণ জানালেন। হাটতে হাটতে উদাস গলায় বললেন, চণ্ডীগড়ে গিয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল অনিল। আসলে এই পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমি বেশী দিন বাঁচতে পারব না! ভাবছি রিটারার করার পর আমি কি করব।

তখন আকাশ ছুঁয়ে অন্ধকার নেমে আসছিল চা বাগানের ওপর। রেগট্রিগুলোতে অজস্র পাখি চিৎকার শুরু করেছে। অস্বীকার করব না, ওই মনুহৃদে ভাৰ্মা সাহেবকে আমার খুব নিঃসঙ্গ মনে হিচ্ছিল।

বাংলার গেট খুলে অনেকটা যেতে হয় নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে। দু'পাশে বাগানজোড়া ফুলের বাহার, দু-দুটো মালি সারাদিন কাজ করে এখানে। চা বাগানের নিজস্ব জেনারেটর থেকে নেওয়া আলো জ্বলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। সোফায় বসতেই একজন নেপালি আয়া ছুটে এলো। ভাৰ্মা সাহেবের সামনে বাবু হয়ে বসে তাঁর বিশাল জুতোসুন্দ পুঙ্খিলের ওপর তুলে নিয়ে ফিতে খুলতে লাগল। খুব অস্বস্তি হিচ্ছিল আমার। এই বাংলায় তিন যুবতী আয়ার কথা এ তল্লাটের সবাই জানে। কিন্তু এ রকম স্বাস্থ্যবতী মেয়ের কাছে প্রকাশ্যে সেবা নেবার ধরণটার সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। জুতো খোলা

হতে ভার্মা সাহেব মেরেটের গাল টিপে ড্রিংক আনতে বললেন। এই সময় ওটা আমার একদম ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভার্মা কে না বলার সাহস আমার নেই। মিনিট দুয়েকের মধ্যে মিত্রীয় আয়া ড্রিংক নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুটো সরু গেলাস আর একটা স্কচের বোতল। জল নেই, কিছ্‌ আইস-কিউব একটা জারে রাখা আছে। ভার্মা সাহেব তখন আমার রিপোর্টটা পড়ছিলেন। হাত নেড়ে ড্রিংক সার্ভ করতে বললেন। মেরেট খুবই মিষ্টি চেহারার। ওপরে ছোট ভেলভেটের স্লিভলেশ ব্লাউজ আর তলায় ঘাগরার ওপরে একটা আংরা জড়ানো। নিপুণ হাতে স্কচ ঢেলে তাতে বরফ মিশিয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে ধরল গেলাসটা। ওর হাসির মধ্যে কিছ্‌টা কৌতূহল কিছ্‌টা প্রশ্ন। আমি গেলাসটা ধরতেই সে একটা ছোট পাখা নিয়ে ভার্মা সাহেবের পিছনে গিয়ে তাকে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগল। তৃতীয় আল্যাটিকে আমি দেখিনি। রিপোর্টটা পড়া শেষ হলে ভার্মা গোর্ফের তলায় অশ্রুত রকমের হেসে বললেন, তুমি তো দারুণ কাজ করেছ। কোম্পানি এই রিপোর্ট পেলে আমাকে ওয়ার্থলেস বলবে। গুড গুড, কেমন দেখছ আমার আল্যাদের? ডিলিসিয়াস, কি বল? তোমরা যে কি করে একটাই বউ নিয়ে সারাজীবন থাক! অল মিডল ক্লাস মেটালিটি!

আমি নীরবে চুমুক দিলাম গ্লাসে। ভার্মা সাহেবের কথার সুরটা আমার ভালো লাগল না। হঠাৎ ভার্মা সাহেব বললেন, বাই দ্য ওয়ে, মিরিল ওরাও কোন ক্যামেলা করেনি ওভারটাইম নিয়ে?

মাথা নাড়লাম আমি, না তো।

এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করলেন ভার্মা, বাস্টার্ড আমাকে জন্মানোর জন্য চুপচাপ বসে ছিল। ওয়েল, তোমার রিপোর্ট আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি হেড-কোয়ার্টারে। বলা যায় না এটা দেখে হয়তো বোর্ড অব ডিরেক্টরস তোমাকে অন্য কোন বাগানের ম্যানেজার করে দিতে পারেন। উইশ ইউ গুড লাক।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ভার্মার কথাবার্তা একদম ভালো লাগছে না। ওঁর অনুপস্থিতিতে ভালো কাজ দেখানোটা কি আমার অন্যান্য হয়ে গেল? কিন্তু লোকটাকে এভাবে কখনো চিন্তা করিনি। মনের মধ্যে অস্বাভাবিকতা পুরে নিয়ে হাঁটছি। ডানদিকে ঝরণার জল তোলপাড় করে নীচে ছুঁতে যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারের জাল পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে। পাখির ঐক্য চুপচাপ। কিছ্‌টা হেঁটে এসে মন হল বাংলায় ফিরে যাই। ফ্যান্টারীর শাশের রাস্তা দিয়ে নীচের জঙ্গলে পথটা ধরলে সটকাট হয়। এই সমস্ত কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ উঠল আকাশে। এ চাঁদের কোনো জোরালো আলো নেই। কিন্তু অন্ধকারটা ফিকে করে দেবার সামর্থ্য রাখে। কয়েক পা হাঁটতেই মনে হল কেউ যেন আসছে দ্রুত পায়ে। চোখের পলক ফেলার আগেই ওঁকে দেখতে পেলাম। বোধহয় আমরা একসঙ্গে পরস্পরকে দেখেছিলাম। মৃদুটা খুব স্পষ্ট নয় কিন্তু ওর একটু চমকে ওঠা ভাবটা আমার নজর এড়াল না। তবে সেটা মৃদুত্বের জন্য উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে

উনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন, আরে, মেজসাহেব যে, এই জঙ্গলে কার জন্য পদচারণা করছেন ?

হেসে বললাম, প্রশ্নটা তো আমিও করতে পারি ।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত রেখে অশ্রুত অসহায় ভঙ্গী করলেন মিসেস সোম, আর বলবেন না ভাই, সেই সন্ধ্যা থেকে এমন মাথা ধরেছে যে আর পারি না । ভাবলাম একটু বেড়িয়ে এলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে ।

কথাটা বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই । এই রাস্তায় কেউ পায়চারি করতে আসে না । এবং এই পথের শেষে যখন ভাঙ্গার বাংলা তখন উনি যে সেখানেই চলেছিলেন তা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না । মিস্টার সোমের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, উনি কোন ব্যাপারে নাক গলান না, কিন্তু ভাঙ্গা সাহেবের সেবা করবার জন্য যখন তিন তিনটে যুবতী আয়া বাংলায় বর্তমান তখন মিসেস সোম ওখানে গিয়ে করবেনটা কি ।

এখন কেমন বোধ করছেন ? চট করে নকল উদ্বেগ দেখলাম আমি ।

ভালো, কিন্তু কোথেকে আসা হচ্ছে সাহেবের ? মিসেস সোম আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন । এই মহিলা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনছি ক্লাবে, চল্লিশ-ছোঁয়া বয়স কিন্তু একদুশের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলছেন ; ভাঙ্গার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার । এর আগে আমার সঙ্গে যখনই কথা বলছেন সহজ গলাতেই বলছেন । আমি কখনো তেমন বেচাল দেখিনি এক ভাঙ্গার গাড়িতে ক্লাবে যাওয়া ছাড়া ।

ভাঙ্গা সাহেবের কাছ থেকে আসছি । বলেই মনে পড়ে গেল এঁর সঙ্গে ভাঙ্গার যে সম্পর্ক তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে । ভাঙ্গা যদি আমার সম্পর্কে বিরক্ত হন তাহলে সেটা এই মহিলার মারফৎ জানা যেতে পারে । তাই হেসে বললাম, ওঁকে আমার কাজের রিপোর্ট দিয়ে এলাম ।

শুধু কাজ আর কাজ । কাজ ছাড়া আপনারা আর কিছুর জানেন না, না ? অভিমান যেন টিকিটের মতো ওর মুখে সাঁটা হয়ে গেল ।

হাসলাম ।—কাজ না করলে পয়সা পাব কি করে ?

এ কথা আপনার মতো ইয়ংম্যানের মুখে মোটেই মানাচ্ছে না । সোম বললে বুঝতাম । আপনি একটা যাচ্ছেতাই, ক্লাবে যখন সব পুরুষগুলো হুইহুই করছে এর ওর বউ-এর সঙ্গে ফাটনশিট চলছে আপনি তখন সাধু হয়ে বসে আছেন, ওয়ার্থলেশ ! বলেই হেসে ফেললেন মিসেস সোম । তারপর চট করে আমার হাত ধরে বললেন, এই খুব রাগ হচ্ছে তো আমার উপর ?

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

এই যে আমি ওয়ার্থলেশ বললাম । চোখ দুটো বড় বড় করে আমার মুখের দিকে তাকালেন মহিলা ।

আপনি সত্যি মনে করেছেন তাই বলেছেন ।

এক পলক চুপ থেকে মহিলা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, উঃ, এইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন ? কোথাও বসলে হত না ?

শশব্যস্তে বললাম, নিশ্চয়ই, চলুন। আমার বাংলো এখান থেকে দূরে নয়। আপনি পায়ের ধুলো দিলে আমার ভালো লাগবে।

ঘাড় নাড়লেন উনি, না না, এখন আর ঘরের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর ভালো না-ও লাগতে পারে।

টিনার সম্পর্কে ঠিক বলছেন না। আমি প্রতিবাদ করলাম।

মেয়েরা কখন জেলাস হবে ভগবানও বলতে পারেন না, আপনি ! তার চেয়ে এখানেই বসা যাক, কি রকম রোম্যান্টিক হয়ে আছে আকাশটা, না ?

কিন্তু এই জঙ্গলে এবং পাশের চা বাগানে বসবার কোন জায়গা নেই। যেহেতু এখানে কোন পাক' নেই এ প্রশ্ন ওঠেও না। কিন্তু মিসেস সোমের চোখ একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বের করল। এখন ফিকে অশ্বকার চারধারে। দূরে কুলি লাইনে মাদল বাজছে। আমরা বসলাম।

মিস্টার সোম বাড়িতে ? কথা শুরু করলাম।

হ্যাঁ। একটু পরেই ডিনার খেয়ে শূয়ে পড়বেন।

এত তাড়াতাড়ি ?

জেগে থেকে কি করবেন ? বউয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন না, ড্রিংক হাতে নিলেই ঘুম আসে। অন্য পাঁচটা মেয়ের পিছনে ছুটবেন সে এলেম নেই।

হঠাৎ বলে বসলাম, আপনি খুব অসুখী, না ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তাকালেন মহিলা, ওর চোখ বড় হয়ে গেল তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, একদম না, অন্তত এই মূহুর্তে না, কারণ আপনি সঙ্গে আছেন। বলে আমি কিছুর বোঝার আগেই উনি দৃ'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার বুককে মৃদু ঘষতে লাগলেন।

মিসেস সোম আমার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু ওর শরীরের গন্ধ এবং এমন একটা নরম মাদকতা আছে যে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। নিজের অজান্তেই ওর কাঁধে হাত রেখেই কখন, ওর ঠোঁটের নানা রকম খেলা নিজের ঠোঁটের ওপর অনুভব করতে করতে খেয়াল করিনি কখন সেটা শুরু হল। সেই মূহুর্তে আমার সামনে থেকে টিনা, মূম্ ম্যাজকের মতো মিলিয়ে গিয়েছিল। টিনার সব রকম সহযোগিতা সত্ত্বেও বিবাহিতা জীবনে আমি এই রকম আনন্দ চুম্বনে পাইনি। আমি তখন কি করছি জানি না, ক্রমশ মহিলা আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিলেন। হয়তো সেদিন নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা আমি পেতাম না যদি ছোট্ট একটা ঘটনামাত্র ঘটত। পরে ভেবেছি, যৌনতা সব স্ত্রীলোকেই কমবিস্তর জানেন, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই সেটা দক্ষ হাতে ব্যবহার করতে পারেন। মিসেস সোম সে ক্ষেত্রে আগ্রাসী মহিলা। আমি যখন বোধের বাইরে চলে যাচ্ছি, মিসেস সোম যখন বিজয়ী সেনাপতির মতো মূ'ল লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন তখনই সামনের ঝোপে ঝটপট শব্দ শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি

চেতনা ফিরে পেলাম, মিসেস সোমও শব্দটা শুনিয়েছিলেন, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের শব্দ ?

অদ্ভুত ব্যাপার। যখন আচমকা বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায় তখন ভয়ের শীতলতা সমস্ত বৌদ্ধচেতনাকে পলকে সরিয়ে দেয়। উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য এগিয়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করে বিফল হলাম। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। মিসেস সোমও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ? আর তখনই একটা অদ্ভুত গা ঘিন্‌ঘিন ভাব আমার শরীরে প্রবেশ করল। নিজেকে ভীষণ খেলো এবং নোংরা বলে মনে হল আমার। টিনার কাছে আমি হেরে গেলাম।

আমি হাঁটছি দেখে মিসেস সোম আমার সঙ্গ ধরলেন, তোমার কাছে অস্বীকার করব না নীল, আজ রাত্রে আমি ভার্নার কাছে যাচ্ছিলাম।

আমি জানি। কি ভাবে মহিলাকে সরানো যায় সেই চিন্তা আমার মাথার ভেতর পাক খাচ্ছিল।

জানো ? হাসলেন উনি, কিন্তু এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। লোকটা পার্ভার্টেড ; তোমার মতো ইয়ংম্যান আমাকে যা দিতে পারে ও তার এক কণাও পারবে না। শব্দ শারীরিক বল প্রয়োগই তো এসবের শেষ কথা নয়। আই অ্যাম সিক উইথ ইম। কদিন ও ছিল না বলে আজ দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

তাহলে আপনার যাওয়াই উচিত। উনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

তুমি তো খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ শুনলাম, রিপোর্ট পেয়ে ভার্না কি বলল ? হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘোরালেন মহিলা।

আমি সেই ছিন্নমূল খুঁজে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেললাম আরামে, মনে হল খুশি হইনি। আমি এত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ওঁর অনুপস্থিতিতে বাগানটাকে চালু রাখলাম, মনে হচ্ছে উনি যেন সেটাকে মানতে পারছেন না। আমি জানতে চাই উনি আমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট হেড-কোয়ার্টারে পাঠান। মিসেস সোম, আমি জানি আপনারা পুরনো বন্ধু, আমি কি আপনার কাছ থেকে এটুকু উপকার আশা করতে পারি না ?

আবার খিল খিল করে হেসে উঠলেন মহিলা। এই অন্ধকারেই হাসি নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে যাচ্ছে—কি বোকা ছেলে রে বাবা ! আচ্ছা, তুমি আমাকে চুমু খাচ্ছ এটা দেখলে কি ভার্নার ভালো লাগত ? নিজের জিনিস অন্য কেউ যদি আরো ভালোভাবে ব্যবহার করে তাহলে ভার্নারা সহ্য করতে পারবে না। আমি জানি ও তোমার খুঁত বের করার চেষ্টা করবেই। তোমার কি একবারও খেয়াল হয় না, মিসেস সোম কেন এত নিজস্বের মতো পড়ে আছেন। কত মানদণ্ডই তো শারীরিক ভাবে বিকল হয়ে যায় কিন্তু তবুও মেজাজ তো থাকে। মিস্টার সোমের সে-সব ধূয়ে মূছে ভার্নার কাছে জমা দেওয়া আছে। কোন দিন চাকরি ঘাবার সম্ভাবনা নেই, প্রমোশনও হবে না। কিন্তু এটা ওর কাছে আক্ষেপের ব্যাপার।

নয়।

ব্রাক মেইল ! আমি মিসেস সোমের মূখ দেখার চেষ্টা করলাম। উনি বললেন, আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেতে চাই।

আমি মাথা নাড়লাম, কিন্তু কি ধরনের বন্ধু ?

চিমটি কাটলেন আমার হাতে, ন্যাকা ! বোঝ না ?

কিন্তু কি করে তা সম্ভব ?

কেউ টের পাবে না, আমি কথা দিচ্ছি, কাকপক্ষী জানতে পারবে না। আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

আমি এখন ওঁর ছুঁড়ে দেওয়া জালটায় ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। আমি মূখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেই শক্ত হয়ে দাঁড়লাম। একটা টর্চের আলো জঙ্গলের ওপর কাঁপতে কাঁপতে এদিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সোম আমার হাত ছেড়ে দিলেন— চটপট চলে যাও নীল। ভার্মা নিশ্চয়ই আমার খোঁজে ওর আয়াকে পাঠিয়েছে।

আয়াকে ? বিস্ময়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না।

হ্যাঁ। আয়াদুলো খুবই বাধ্য। ওদের শরীর আছে কিন্তু সেটা ব্যবহার করার বুদ্ধি নেই। ও যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে—বন্ধুতেই পারছ ওরা আমার ওপর ভীষণ জেলাস, কোন ছুতো পেয়ে গেলে লাফিয়ে উঠবে। তুমি যাও, আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে আসা টর্চের কাছে পৌঁছে গেলেন মিসেস সোম। এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এর আগে কখনো হয়নি। এই চা বাগানে এতগুলো বছর আছি অথচ আমারই চোখের সামনে দিয়ে প্রায় রাতে এ রকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা জানা ছিল না। মিসেস সোমকে নিয়ে টর্চটা ফিরে গেলে ক্রান্ত পায়ে হেঁটে এসে আমার বাংলোর গেটে দাঁড়লাম। অশ্বকারের মধ্যে যেন একটা আলোর জাহাজ ভাসছে। নিজেকে ভীষণ অপরিণত মনে হচ্ছে এখন। টিনাকে এখন থেকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি কি টিনাকে সব কথা খুলে বলব ? এই নকল রাজার চাকরি ভার্মার থাকা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মূখের মতো যোগ করলাম মিসেস সোমকে। এখন থেকে আর একটা সমস্যা বাড়ল আসার। সেটা মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমি আর ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না। কিন্তু কি করব ?

টিনাকে কিছুই বলতে পারলাম না। সোজা বাথরুমে চলে গিয়ে সাবান মেখে স্নান করলান। হয়তো এটা আমার মিডল ক্লাশ মেন্টালিটি, কিন্তু সেটাকে আমি ছাড়তে পারছি না। পরের কয়দিন মিসেস সোমের সঙ্গে দেখা হবার কোন সুযোগ ছিল না। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ভার্মা সম্পর্কে আমি অবস্থা ভয় পেয়েছি। লোকটা অফিসে কিংবা ফ্যান্টারীতে যখনই দেখা হয়েছে তখনই খুব হেসে আন্তরিক ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সেই রাত্রের ব্যাপারটা যেন আমারই দেখার ভুল। মনে মনে অনেক সহজ হয়ে গেলাম। সোম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল প্রথমে। ভদ্রলোক আমার চেয়ে অনেক বড়। যদি জানতে পারেন তাহলে

কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। ভামাকে না হয় অজ্ঞাত কারণে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার সমস্ত আশংকাকে অমূলক করে এ সব কিছুই ঘটল না। ভীষণ বোকা হয়ে গেলাম আমি।

শনিবার আমাদের ক্লাবে যাওয়ার দিন। টিনা সেজে গুঁজে আমার সঙ্গে বেরুল। অনেকটা রাস্তা গাড়িতে যেতে হয়। চা বাগান ছাড়িয়ে বাবু কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে মিনিট পনেরো গাড়ি চালালে অফিসার্স ক্লাবে পৌঁছানো যায়। গাড়িতে যেতে যেতে টিনা বলল, কাল রবিবার, তোমার সময় হবে ?

বললাম কেন ?

ভাবছি কাল মন্মকে দেখতে যাব। ভোর ভোর বেরুতে হবে।

আচ্ছা।

তাহলে আজ ক্লাব থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

আমি আড়গট হয়ে গেলাম। ক্লাব থেকে টিনা তাড়াতাড়ি ফিরলে আমার সবকিছু গুবলেট হয়ে যাবে। আমি হিসেব করে দেখলাম তিনটির আগে টিনাকে কিছুতেই ফেরানো চলবে না। মূখে কিছু বললাম না।

সেদিন ক্লাবে কি একটা ফাংশন ছিল। জমজমাট চারধার। কলকাতা থেকে কে একজন এসেছে, ক্যাবারে দেখাবে। অনুষ্টান শুরুর ডিনারের পর। বৃকে বল এলো। আমাদের এখানে এ সব কদাচিতই হয় তাই টিনা নিশ্চয় বাড়ি ফেরার জন্য খুঁজবে না। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা প্রাইভেট রোড ধরে ঢোকার পর ক্লাবের গেট। আশেপাশে কোন লোকালয় নেই। অনেকটা জমি নিয়ে লন, ফুলের বাগান, বিভিন্ন জঙ্গুলে গাছের কায়দা করা ঝোপ, পিছনের ঝরণার জল মাটি কেটে নিয়ে এসে একটা ছোট সুইমিং পুল করা হয়েছে। ক্লাব হাউসটা ব্রিটিশ আমলের, বিশাল প্রাসাদের মতো। শ্রদ্ধা ম্যানেজারেরাই এর পরিচালক সমিতির সদস্য, এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজাররা নয়। সাধারণত ডিনার অবধি গল্পগুঁজব আলাপ চলে। তারপরেই কে কার খবর রাখে। মাঝে মাঝে ক্লাবের চারপাশে ঝোপে ঝাড়ে নাটক অভিনয় হয়ে যায়। অবশ্য সপ্তাহের অন্য ক'টি দিন এর মেজাজ থাকে খুব শান্ত। পরদিন প্রত্যেককেই ভোরে বাগানের কাজে বেরুতে হবে বলে আটটার ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। অনেকের মতো আমারও রোজ যাওয়া সম্ভব হয় না।

ক্লাবে পৌঁছে টিনা মেয়েদের আড্ডার চলে গেল। কয়েকজন প্রোচা ম্যানেজারের স্ত্রী, যারা ঝামেলা একদম পছন্দ করেন না, তাঁদের একটা আড্ডা আছে। টিনা সেই আড্ডার সদস্য। হুটোপুটি, নাচগান ওর মাঝে ভালো লাগে না। আমি অবাক হই মাঝে মাঝে, ওর ছেলেবেলা যেভাবে যে পরিবেশে কেটেছে তার সঙ্গে এই মেজাজের কোন মিল নেই। মাঝে মাঝে ওর মাঝে ওর চেয়ে বেশী চণ্ডল বলে মনে হয়। টিনা যে কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে বউ হতে পারে শ্রদ্ধা নামটুকু বাদ

দিয়ে। তবু কেন যে শব্দ ওই একটা ব্যাপার ও মানিয়ে নিতে পারে না, এটা চিরকাল রহস্য থেকে গেল।

বিলিয়ার্ড টেবিলে কয়েকজন সিনিয়র ম্যানেজার খুব গম্ভীর মুখে ব্যস্ত রয়েছেন। পাশেই রামিবোর্ডে ভার্মাকে দেখতে পেলাম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওঁর কোরাম হয়নি। মূখ চোখ আমাশা রুগীর মতো! নিশ্চয়ই আমাদের অনেক আগেই এসেছেন। হোভি স্টেকে রামি খেলা হয় এখানে। পাশের ঘরে ব্রীজ এবং দাবা পাশাপাশি চলেছে। দুটো বিপরীত ধরনের খেলা এক ঘরে কি করে ওরা খেলে বুঝতে পারি না। ব্রীজের পার্টনারদের মধ্যে হৈ চৈ ঝগড়া দাবার শান্ত সমাহিত মানবগুলোকে বোধহয় বিচলিত করে না। দাবাড়ুদের দর্শক কম। কিন্তু মিস্টার সোমকে চোখে পড়ল। যাক, অনেক দিন পর ওঁকে ক্লাবে দেখছি।

আমার যে ছোট্ট আড্ডা আছে, এই আমি, হিলভ্যালির সান্যাল, কমলপুর টিয়ের সেনগুপ্ত, আমরা শব্দ আড্ডা মেরে কাটাই। ওদের খুঁজছিলাম বাইরের বারান্দায় এমন সময় মিসেস সোমের মন্থোমুখী হলাম। একদম পরীর সাজে সেজেছেন মহিলা। একটু রোগা কিন্তু কে বলবে ওর অত বয়স। এঁড়িয়ে যাব কিনা ভাবতে শব্দ করবার আগেই উনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।—কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?

আমি বিরত গলায় বললাম, আমি এইমাত্র এসেছি।

সে আমি দেখেছি। ক’দিন তোমার একদম দেখা পাইনি, এই বুঝি বন্ধুত্বের দাম? ভাবছিলাম হয়তো তুমি আমাদের বাংলায় চলে আসবে কিন্তু হা কপাল। একালের কেউ ঠাকুর ভীষণ বিশ্বাসঘাতক। যাক, আমি কিন্তু বন্ধুত্বের অমর্যাদা করব না, তোমার জন্যে খবর আছে।

কি খবর? আমি চট করে কিছুই স্মরণে আনতে পারলাম না।

উঁহু, এখানে নয়। চল, সুইমিং পুলটার পাশে গিয়ে বসি। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে মিসেস সোম বারান্দা থেকে বাগানে নেমে গেলেন। কৌতূহল এঁটুলির মন, পেট না ভরলে শব্দ শব্দেই যায়, ছাড়তে চায় না। সুইমিং পুলের কাছে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। এখানে সুবিধে এই যে চট করে কেউ কাউকে ভুল বুঝতে চায় না। এ সব ব্যাপার এখানে এত আকছার ঘটছে যে কেউ একে আমল দেয় না। মিসেস সোম বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন, ভার্মাকে এখন তোমার কেমন লাগছে?

মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা, অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

জিজ্ঞাসা করছি।

এখন তো খুব ভালো ব্যবহার করছেন।

উনি তোমার নামে রিপোর্টে দিয়েছেন যে ওঁর অ্যাবসেন্স নার্সারি বোর্ডের কোন ষড়্ হয়নি। অধিকাংশ গাছই তুলে ফেলতে হবে ফলে এই চা বাগানের প্রোডাকসন আগামী বছরগুলোতে খুব কিছু বাড়বে না বরং কমে যাওয়াই

স্বাভাবিক। চিঠিটা পেলে বোর্ড কি রকম খুশি হবে বুঝতেই পারছ ?

বিস্ময়ে আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। এ রকম জলজ্যান্ত মিথ্যে ভাষা সাহেব বোর্ডকে লিখবেন আমার সম্প্রদায়ের ছিল না। অথচ উনি এ কয়দিন আমার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেছেন, যখনই দেখা হচ্ছে হাসছেন। জেলাসি, শ্রদ্ধা জেলাসি। ওর অনুপস্থিতিতে বাগানের কাজকর্মের এতটা উন্নতি সহ্য করতে পারছেন না। কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি নার্সারি বোর্ডের প্রতি আমার সজাগ দৃষ্টি ছিল। রোজ দু'বেলা আমি ওটা তদারক করত যেতাম। গাছগুলো সুন্দর বাড়ছে, তুলে ফেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদি বোর্ড আমার কাছে এক্সপ্লানেশান চায় তাহলে আমি ওঁদের কাউকে সরেজমিনে তদন্ত করে যেতে বলব। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নেহাৎ আমাকেই বেকায়দায় ফেলতে ভাষা সাহেব রাতারাতি গাছগুলোকে উপড়ে ফেলে দিতে পারেন। একই সঙ্গে শীতলতা এবং জ্বলন্ত আমি আমার শরীরে ছাড়িয়ে পড়ল। ঠিক করলাম, যা হবে হোক সবার সামনে গিয়ে ভাষাকে চ্যালেঞ্জ করি।

আমার মুখ চোখ দেখে বোধহয় মিসেস সোম কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেন। বললেন, একদম বোকাম মতো কিছু করবে না।

আমি ভাষাকে ফেস করতে চাই। ক্রমশ আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

তুমি কি করে জানতে পারছ ও রিপোর্টে কি লিখেছে। এখন এই মুহূর্তে তুমি যদি এ সব কথা ওকে বলতে যাও তাহলে চরম বোকামি করবে। তুমি ওকে কিছু বললে আমি বিপদে পড়ব, তুমি তাই চাও ?

এ এক অসহনীয় অবস্থা। বুঝতে পারছি বিপদ চারিদিক থেকে এসেছে কিন্তু কিছুই করার নেই। মিসেস সোম হাত ধরলেন, ভয় পাচ্ছ কেন আমি তো আছি।

হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। মনে হল টিনাকে ঘটনাটা বলার সুযোগ। কিন্তু বলতে গেলে তো খবরের উৎসটাও জানতে হয়। মিসেস সোমকে টিনা একদম পছন্দ করে না। মিসেস সোম হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—মুখ গেমড়া করে বসে থেকো না তো। এসো, একটু পায়চারি করি।

মাথা নাড়লাম আমি।—আমাকে একটু একা বসে থাকতে দিন, এখন আমার কিছু ভালো লাগছে না।

অনিল এবং সুধাময়ী

ঠিক আটটার ডিনার শুরুর হল। লম্বা ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বেয়ারারা ঘুরছে। আগে বড়ো সিস্টেম ছিল কিন্তু তাতে অনেকের অসুবিধে হওয়ায় এখন এই ব্যবস্থা, খেতে খেতে অনিল আড়চোখে মিসেস সোমকে দেখে নিল। মিস্টার সোমের পাশে বসে স্বামীর কি কথায় মিষ্ট করে হাসলেন। একটু আগে যিনি

অনিলের হাত ধরে অন্ধকারের কোন কোণে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন তার কোন চিহ্ন এখনও মূখে নেই। ভার্মা সাহেব টেবিলের একদম শেষ প্রান্তে গ্রীনব্যাংক টি. এস্টেটের ম্যানেজারের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে বলতে মুরগী কাটছেন প্লেটে। টিনা চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। টেবিলে বসা ইন্তক ও অনিলের পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। অনিলকে এত অনামনস্ক এর আগে কখনো দ্যাখিনি। শেষ পর্যন্ত চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, কিছ্ হয়েছে তোমার...

চমকে উঠতে গিয়ে সামলে নিল অনিল, কই না তো। কেন?

মনে হল। টিনা স্বামীর দিকে তাকাল।

সামান্য ব্যাপার, পরে বলব।

তোমাদের ভার্মা সাহেব একটু আগে আমার কাছে এসে তোমার খুব প্রশংসা করে গেলেন। টিনা ভার্মার চোখ দুটো মনে করে ঠোঁট বঁকাল।

শক্ত হয়ে গেল অনিল। মানবচরিত্র নাকি অবোধ্য, কিন্তু এতটা অবোধ্য হবে যে সামান্য আঁচ সে পাবে না। তবে কি মিসেস সোম তাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন?

কখন ফিরবে? টিনা খাওয়া শেষ করল।

ম্যাজিকটা দেখা যাক।

খাওয়া দাওয়ার পর হুজোড় জমল। যারা মদ্যপান করেন তাঁরা দলে দলে ড্রিংকস নিয়ে বাগানে নেমে গেলেন। মিসেস সোম এখন ভার্মার সঙ্গে ঘুরছেন। সবার অলক্ষ্যে অনিল নীচের লনে নেমে এলো। স্দুরকি বিছানো পথটা ধরে সামান্য এগোলে পিছনের গেটটা পড়বে। কেউ ওকে দেখছে কিনা অনিল ভালো করে জরিপ করে নিল। সবাই নিজেই নিয়ে মত্ত। তাছাড়া জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা বলে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। দ্রুত পায়ে ও গেটটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি মহিলা কণ্ঠ অস্ফুট শব্দ করে উঠতে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরুষ কণ্ঠটি মহিলাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতেই মহিলা বলে উঠলেন, ইউ আর স্টিল নভিস। অনিল গলাটা চিনতে পারল। গ্রীনব্যাংকের ম্যানেজারের স্ত্রী, মধ্যবয়সী এই মহিলার ককর্শ কণ্ঠ সর্বজনবিদিত। অনিল আর দাঁড়াল না। গেট পেরিয়ে অজস্র গাড়ির সারি সবাই পার্ক করে রেখে গেছে। মাথা নীচু করে হেঁটে নিজের গাড়ি খুঁজে নিতে গিয়ে ও দেখল আর একটা গাড়ি সন্তর্পণে পার্কিং প্লেস ছেড়ে হেডলাইট না জ্বালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে নজর করতাই ও চালককে চিনতে পারল। ডিনার খেয়ে মিস্টার সোম বাগানে ফিরে যাচ্ছেন। সোমের জন্য মনটা কেমন বিষন্ন হয়ে গেল অনিলের। ভদ্রলোককে এগিয়ে যাওয়ার সময় দিয়ে ও নিঃশব্দে নিজের গাড়িতে চেপে বসল। তখন রাত পোনে দশটা। যে করেই হোক আজ একটার মধ্যে ওকে ফিরে আসতে হবে। ম্যাজিক মিস্টারই তারপরে হবে না।

গাড়ির আলো না জ্বলে অনিল বাইরে বেরিয়ে এলো। ভার্গিস ম্যানেজাররা কেউ ড্রাইভার নিয়ে ক্লাবে আসে না, পুরো মাতালও নিজের স্টায়ারিং নিজেই করেন। না হলে এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে অবশ্যই ড্রাইভারদের চোখে

পড়ত এবং সে খবরটা কখনই চাপা থাকত না।

কোন রকমে হাইওয়েতে এসে অনিল স্পীড বাড়াল। রাস্তা খুব চওড়া ও মসৃণ। এত রাত্রে কিছু দূরপাল্লার লরি ছাড়া সাধারণত যানবাহন থাকে না। সন্তর পঁচাত্তর অনায়াসে তোলা যায়। আর এই রকম গতিতে যেতে যেতে অনিলের বন্ধকের উত্তেজনা অশ্রুত আরাম পায়। গতির সঙ্গে মনের মিল হয়ে যায় বেশ। শহর এখান থেকে এই স্পীডে গেলে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগবে। এই রাস্তায় অনিল চোখ বন্ধ করে গাড়ি চালাতে পারে। সামান্য ঘাম জমতে না জমতেই তিষ্ঠা এসে গেল। ব্রীজে উঠতে টিকিট কাটতে হয়। এইটে একটা বড় প্রমাণ রেখে যাওয়া। প্রতি শনিবার রাতে একটি লোক ব্রীজ পেরিয়ে শহরে ঢোকে এবং মাঝ রাস্তায় ফিরে আসে, এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই টিকিট চেকারকে ভাবায়। যদি কেউ তাকে প্রশ্ন করে তাহলে সে সহজেই অনিলের চেহারার বিবরণ চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে। কিন্তু এই রিস্কটরু ওকে নিতে হবে। শহরে ঢুকতে হলে এই বিরাট নদী পার হবার রাস্তা এই একটাই। তবে বাঁচোয়া, লোকটা নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত ওর কাজের ওপর কখনও কথা খরচ করে না। টিকিটটা নিয়ে আশ্তে আশ্তে ব্রীজটা পেরিয়ে আবার দাঁড়াল অনিল। এখানে টিকিটের কাউন্টারপার্টটা জমা দিয়ে যেতে হয়। লোকটা এগিয়ে আসতেই অনিল সেটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল। ঘোড়ার খুরের নালের মতো রাস্তা বেয়ে ও শহরের কাছাকাছি এসে গেল। রাজবাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য এগিয়ে বাজারের কাছে একটা গলিতে ঢুকে ও গাড়িটাকে পার্ক করল। বড় রাস্তা দিয়ে গেলে গাড়িটাকে সহজে কারো চোখে পড়বে না। এখন প্রায় এগারোটা। গাড়িটাকে লক্ করে অনিল রাস্তায় বেরিয়ে এলো। এই সব মফস্বল শহর নটা বাজতে না বাজতেই নির্জন হয়ে যায় এখন তো এখানে গভীর রাত।

দিনবাজারের মদুখতাতে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। না, কোন খালি রিক্সা আসছে না। হেঁটে গেলে অন্তত মিনিট দশ লাগবে, এ সময়টুকু এখন ওর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, পাড়ায় ঢুকলে কারো না কারো চোখে পড়বে। ওই পাড়ায় সাধারণত গাড়ি ঢোকার রেওয়াজ নেই। পাঁচকান হয়ে যথাস্থানে খবর পৌঁছে যেতে বেশি দেরী হবে না।

পুরোটা পথ হেঁটে শিল্পসমিতি পাড়ায় চলে এলো অনিল। স্লান্ডার জ্যেৎস্নায় বাড়িঘরগুলোর ঘুমন্ত চেহারা ভীষণ নিজীব মনে হচ্ছে। বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট গলির মধ্যে ঢুকে একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল সে। না, কেউ ওকে দেখবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। মনে মনে হাসল অনিল। অফিসার্স ক্লাবে ম্যাজিক দেখতে দেখতে টিনা কখনই কম্পনা করতে পারে না এই মত্বহীন সে কোথায়।

বাড়িটা অন্ধকার। দরজার কাছে উঠে গিয়ে অনিল চাপা গলায় ডাকল, মা! সামান্য বিবর্তিত, তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলে গেল। নিঃশব্দে অনিল ভেতরে ঢুকে যেতে সূদা দরজা বন্ধ করলেন। একটা আমকাঠের বিরাট তন্তুপোষ আর ছাতল নড়বড়ে গোটা দুয়েক চেয়ার, একটা সস্তা আলনা, দেওয়ালে ঝোলানো

পুরোন দিনের আয়না আর বাবার ছবি, সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা ওই দৃশ্যটির ওপর আবার চোখ বোলাল অনিল। হ্যারিকেনের পলতেটা নামানো, ঘরে আবছায়ার সৃষ্টি করেছে। সেটাকে একটা টুলের ওপর রেখে সুধা বললেন, কপালের ঘাম মোছ।

ইন্ট্রিস্ট স্প্রে করা রুমালটা পকেট থেকে বের করে মুখ মুছল অনিল, তারপর স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

ভালো। তোর বউ, মেয়ে? সুধা তন্তুপোষের উপর আলতো করে বসলেন।

অনিল ততক্ষণে সেখানে টানটান হয়েছে, ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিল, ভালোই আছে ওরা। শঙ্করকে দেখাছি না—

সে বাড়িতে নেই। সুধা মুখ নীচু করলেন।

কোথায় গেছে? এত রাতে বাড়ির বাইরে থাকে কেন?

ও আজ রাতে বন্ধুর বাড়িতে থাকবে।

কেন?

মুখ তুললেন সুধা, তুই আসবি বলে। ও তোকে সহ্য করতে পারছে না।

বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগার মতো সোজা হয়ে বসে মায়ের দিকে তাকাল অনিল। শঙ্কর ওর ছোট ভাই। যখন টোকলাইতে গিয়েছিল সে তখনও ক্লাস এইটে পড়ত। এত বছর পর ডুরাসের সেই শঙ্কর যথেষ্ট লম্বা হয়েছে এবং পাজামা পাজাবী পরে কাঁধে ঝোলা নিয়ে পার্টি করে। মা এখনও সেই প্রাইমারি স্কুলে রয়েছেন বলে বাবুর রোজগার করার কথা খেয়াল হয় না। সেই শঙ্কর আজ বাড়ির বাইরে চলে গেছে যেহেতু সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

তুমি ওকে কিছুর বললে না? আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল অনিল। বৃকের ভেতর যে কণ্ঠটা চা বাগানে ছটফট করে হঠাৎ যেন সেটা জমাট হয়ে গেছে।

আমার ভালো লাগে না। এই যে তুই শনিবার করে মাঝরাতে চোরের মতো বাড়িতে ঢুকিস এটা আমার কত বড় লজ্জা বল তো! নিজের পেটের ছেলে দিনের আলোয় মাথা উঁচু করে এখানে আসবে না, আমাকে তাকে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো ঘরে তুলতে হবে, আমি আর পারছি না। সেই সেবার, কি একটা স্ট্রাইক করার জন্য খোকার তিন মাস জেল হল, ভাবলাম লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। কিন্তু ওর বন্ধুরা যখন গলায় মালা পরিয়ে বাড়িতে দিয়ে গেল তখন পাড়ার সবাই ওকে দেখতে এলো। লজ্জার বদলে গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছিল। সুধা হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

অনিল মায়ের দিকে তাকাল। শীর্ণ চেহারা চিরকালি, এখন যেন আরো রোগা দেখাচ্ছে। মাসকলাইবাড়ির প্রাইমারি স্কুলের টিচার সুধাময়ী সারা জীবন একা একা লড়াই করে গেলেন। সে যখন প্রথম চাকরির পেয়ে টাকা পাঠিয়েছিল সুধা আনন্দের সঙ্গে তা নিয়েছিলেন। কিন্তু সে মদহর্তে ছেলের চাকরির সত্যের কথা জানতে পেরেছিলেন সে মদহর্তে তিনি আর অনিলের টাকা স্পর্শ করেন নি। মায়ের এই অভাব অনটন চোখ চেয়ে দেখা ছাড়া অনিলের এতদিন কিছুরই করার ছিল

না। আজ এই রাত্রে সুধা ওকে স্পষ্ট বলে দিলেন তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে একমত হয়ে তিনিও চান না অনিল রাত্রের অশ্বকারে চুপিসারে গুর সঙ্গে দেখা করতে আসুক।

কেউ কোন কথা বলছে না। সুধা আবার ছেলের দিকে তাকালেন। চটকরে দেখলে ওই মানুষটার কথা মনে পড়ে যায়। অনিলকে বছর আটকের রেখে তিনি কেমন ফট করে চলে গেলেন। একটা পরস্য কারো জন্য তোলা ছিল না। তখন শঙ্করের বয়স একও পুরো হয়নি। সেই লেংচে লেংচে চলার দিনগুলোর কথা ভারলেই সব ব্যাপসা লাগে। অনিলের মাথায় বৃন্দ্বি ছিল, যা পড়ত মনে রাখতে পারত। সে বছর সরকারী স্কুলে ওকে ভরতি করেছিলেন ওর বাবা, দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শব্দু নিজের জোরে অনিল কোন দিন স্কুলে মাইনে দেয়নি, চিরকাল ফুল ফ্রিশিপ পেয়ে এসেছে। সুধা যে মাইনে পেতেন সে সময় তার কথা ভারলেই হাসি পায়। শঙ্করকে একটু একটু করে বড় করা আর অনিলকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা তাঁর সামনে খোলা ছিল না। একটা একটা করে গয়নাগুলো গেল, দারিদ্র যখন আকাশ ছোঁয়া হয় তখন আত্মীয়স্বজন কোথায় হারিয়ে যায়। তবু মানুষ বাঁচে। দু'মাইল রাস্তা খালি পায়ের এক জামা প্যাণ্টে সারা বছর হেঁটে স্কুল করে অনিল টেস্টে এ্যালাউড হল। তখন হাত একদম খালি সুধা অনেক চেষ্টা করেও অনিলের পরীক্ষার ফিস্ বোগাড় করতে পারলেন না। জমা দেবার শেষ দিনটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। যার কাছেই হাত পাতবেন ভাবেন তার কাছেই শোধ না করা ধার রয়েছে। এত দূর অবধি এগিয়ে এনে ছেলেটাকে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসাতে পারবেন না ভেবে নিজের চুল ছিঁড়ছিলেন যখন সুধা তখন একজন ওকে মতলবটা দিল। এই শহরে একজন গণ্যমান্য মানুষ বাস করেন। ভারতবর্ষের চা শিম্পের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থবান এই মানুষটির দান ধ্যানের সুখ্যাতি আছে। উপযুক্ত প্রার্থীকে কখনো তিনি ফেরান না। তবে মানুষটি এত ব্যস্ত যে তাঁর দর্শন পাওয়া মর্শাকিল। সুধা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেই সকালবেলার কথাটা ওর স্পষ্ট মনে আছে। প্রার্থীদের অপেক্ষা করার ঘরে সেই সাতসকালে লোক উপচে পড়ছে। প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন। সুধা বসার জায়গা পেলেন না, ছেলেকে নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কোন পরিচয় নেই, কারো সুপারিশ নিয়েও আসেননি, সুধার খুবই সন্দেহ ছিল ওঁদের আদৌ ডাক পড়বে কিনা। সেই সময় খাড়ী ঢুকল, ওই সাত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন কে জানে। গাড়ীটা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সোরগোল পড়ে গেল। সুধা দেখলেন বছর ষাটের একজন বৃন্দ্ব সোজা হয়ে গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে পা রাখলেন। পরনে ধূতি প্রাজবাবী, বেঁটে খাটো, ছোট করে ছাঁটা চুল শক্ত সামর্থ্য মানুষটি হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন, গুর চোখ সুধার দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সুধা সজ্জ্বিত

হয়ে পড়েছিলেন এমন সময় গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা শুনতে পেলেন আপনি কি আমার কাছে এসেছেন মা? গলার স্বরে কতৃষ্ণ আছে কিন্তু বিনয়ের ঘাটতি নেই। সুধা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়তেই মান্দুশাটি বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ছেলোট কি সঙ্গে এসেছে?

সুধা কিছ্‌র বলার আগেই একজন নাস্তেব মতো লোক নিবেদন করল, আজ বড় ভীড় হয়েছে কতামশাই, ভেতরে তিল খারণের জায়গা নেই।

তাই নাকি! কিন্তু আজ তো আমি বৈশিষ্ণব সময় দিতে পারব না। তুমি আজকে না হলে নয় কেবলমাত্র এমন কেসগুলোকে অপেক্ষা করতে বল।

মান্দুশাটি ভেতরে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল কেউ নিজের কাজটাকে জরুরী নয় বলতে চান না। নাস্তেব ভদ্রলোক মন্দ্রশিকলে পড়ে গেলেন। সুধা বুঝলেন আজ ঠুঁর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। হঠাৎ ঠুঁর খুব আফশোস হল, মান্দুশাটি যখন ঠুঁকে প্রশ্নটা করলেন তখনই তো সুযোগটা এসেছিল। চট করে কথাটা বলে ফেললেই হত। কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল ঠুঁর। আজ অবধি কখনো কোনো অপরিচিত মান্দুশের কাছে উনি হাত পাতেনি, এখানে আসবার আগে অনেক সময় লেগেছে নিজেকে তৈরী করতে।

এ রকম জায়গায় এসে অনিল খুব অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিল। ভালো জামা কাপড় পরা অনেকেই এসেছে ওদের মতো কিছ্‌র পাওয়ার আশায়। যে মান্দুশাটি একটু আগে গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে ও ওদের স্কুলের স্পোর্টসের প্রাইজ দিতে দেখেছে। এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, এই বাড়িতে আসার কারণ ও জানে। আগামী কালের মধ্যে টাকা ষোগাড় না হলে এ বছর পরীক্ষা দেওয়া হবে না, এই বোধ ওঁকে অসাড় করে রেখেছে। ওর ক্লাসের সব ছেলেই এই দায় চুকিয়ে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে শুরুর হয়েছে ওর আজকাল, মায়ের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়।

সুধার যখন ডাক এলো তখন প্রায় বারোটা। যদিও মান্দুশাটি আজ সময়ের অভাব বলেছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কাউকেই তিনি ফেরালেন না। নাস্তেব মতো লোকাটি যখন সুধাকে ভেতরে নিয়ে গেল তখন ঠুঁর শরীর টলছে। সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া কিছ্‌র হয়নি। ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরে ভাত চড়াবেন কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। ছোটটাকে পাশের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন, সেজন্যও চিন্তা হচ্ছে।

ঘরে ঢুকতেই মান্দুশাটি বললেন, আপনারা অনেকক্ষণ কষ্ট পেলেন, বসুন। খানিক ইতস্তত করে সুধা চেয়ার টেনে ঠুঁর টেবিলের উল্টোদিকে সুসজ্জিত বসলেন। অনিল ঠুঁর পাশে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে। এক সেকেন্ড ঠুঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক যেন জরিপ করে নিলেন। এতগুলো প্রার্থীর ধকল সামলে তিনি এখন বেশ ক্লান্ত।

বলুন, আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্য?

সুধা সামান্য ইতস্তত করলেন তারপর মাথা নীচু করে বললেন, আমি আপনার

কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে এসেছি। আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াই, খুবই সামান্য মাইনে। উনি চলে গেছেন অনেক দিন। খুব কষ্টে এই ছেলোটিকে মানুষ করতে চাইছিলাম। কিন্তু এবার আর পারছি না। নিশ্বাস নেবার জন্য থামলেন সূধা। মান্দুশটির চোখের দিকে তাকাতে ঔঁর সাহস হচ্ছিল না। ওপাশ থেকে কোন কথা শুনতে না পেয়ে সূধা শেষ কথাটি বললেন, ওর এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার কথা। কাল বাদে পরশু ফিস জমা দেবার শেষ দিন। আমি টাকার ব্যবস্থা করতে পারিনি। তাই—

অনিল দেখল ভদ্রলোক ওর মন্থের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

কোন স্কুলে পড় ? গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা এলো।

জেলা স্কুলে। রেজাল্ট কেমন হয়েছিল ?

অনিল কি বলবে ঠাওর করতে পারল না। প্রথম ডিভিশন পেতে ওর কুড়ি নম্বর কম ছিল। সেটাকে কি এই ভদ্রলোকের কাছে ভালো মনে হবে ? ও কিছু বলার আগেই সূধা হাতের খামটা ঔঁর সামনে এগিয়ে দিলেন। মান্দুশটি সেটা অবহেলায় তুলে নিয়ে ভেতর থেকে কাগজটা বের করে তাতে চোখ বোলালেন। দেখা শেষ হতেই ঔঁর ঠোঁটে হাসি ফুটল, বাঃ, তুমি তো দেখাছ গুড বয়। ফাইন্যালে ফাস্ট ডিভিসন পেতে হবে।

সূধা বললে, বইপত্র সব কিনে দিতে পারিনি, কারো কাছে পড়াব সে পয়সাও নেই। কোন রকমে যদি পাশ করে সেই আশায় আছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন মান্দুশটি। যেন কথাটা তাঁর মনঃপুত হল না।

আপনার আত্মীয় স্বজন কে কে আছেন ?

উনি দুটো ছেলে রেখে গেছেন। এটি বড়। কাছাকাছি কোন আত্মীয় নেই, আর যারা আছেন তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

তুমি খেলাধুলা কর ? ফুটবল, ক্রিকেট ? হঠাৎ প্রশ্নটা অনিলের দিকে ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক।

অনিল বলল, অল্প অল্প।

শোন, আমি তোমার পরীক্ষার ফিসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে তুমি কথা দিয়ে যাও ফাইন্যালে তুমি ফাস্ট ডিভিসন পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ভদ্রলোক চোখ সরাসরি না।

কি জবাব দেবে অনিল। ফাস্ট ডিভিসন পাওয়া কি ওর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। চিরকালই সে মাঝারি গোছের ছেলে। ওর ক্রিকেট খাওয়া ফাস্ট ডিভিসন পাবে তারা আলাদা করে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেখানে ভুলিও কেউ ওর নাম উচ্চারণ করে না। এবার টেস্টে জানা প্রশ্নগুলো পড়েছিল বলে ওর নম্বরটা খারাপ হয়নি। অনিল দেখল মা ওর দিকে কেমন তাকিয়ে আছে। কিন্তু না ভেবে ও ধীরে মাথা নাড়ল।

কিন্তু ভদ্রলোক তাতে সন্তুষ্ট হলেন না, না না, মাথা নাড়লে চলবে না,

মুখে বল ।

অনিল বলল, আমি ফাস্ট ডিভিসন পেতে চেষ্টা করব ।

গদু । শুনুন—মানুষটি সুধার দিকে তাকালেন, আপনার ঠিকানা এই কাগজটায় লিখে রেখে যান । আমার লোক আপনার বাড়িতে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে । আর এই তিন মাস ওর জন্যে একটু ভালো খাবারের ব্যবস্থা করবেন । লড়াই করতে হলে গায়ে শস্তির প্রয়োজন হয় ।

সমস্ত বুক আনন্দে কাঁপছিল সুধার । এত সহজে যে এ রকম সমাধান হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি তিনি । এ যুগে এ রকম দয়ার মানুস বেঁচে আছে কে জানত । নিজের ঠিকানা লিখে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন ঠা-ঠা রোদ্দুরে, কিন্তু সেটা ওই মূহুর্তে তাঁর কাছে কোন কণ্ঠই নয় ।

নায়েব লোকটি এসে টাকা পৌঁছে দিয়ে গেল । বাড়ি ফিরে খেয়াল হয়েছিল পরীক্ষার ফিসের অঙ্কটা তো কখনই মানুষটিকে বলা হয়নি, টাকা যদি কম পাঠান ! কারণ ওঁর পক্ষে নিশ্চয়ই এখনকার পরীক্ষার ফিস জেনে রাখা সম্ভব নয় । ওঁর হাতে টাকা না দেওয়ার পিছনে উনি দুটো যুক্তি পেয়েছিলেন । এক : বাড়ি-ঘর দেখে ওদের সততা যাচাই করে টাকা দিতে চান মানুষটি । কত উটুকো লোক আছে যারা মিছে কথা বলে নিশ্চয়ই অতীতে ওঁকে ঠকিয়েছে । দুই : নিজের দানটা হাতে হাতে দিয়ে নিজের কতৃষ্ণতা হয়তো দেখাতে চান না উনি । নায়েব যে টাকা দিয়ে গেল তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন সুধা, কম তো নয়ই বেশ কিছু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাওয়া অবশ্যই শোভনীয় নয় কিন্তু সুধা মরমে মরে গেলেন ।

অতিরিক্ত টাকাটায় অনিল কোচিং স্কুলে ভর্তি হল । এক মাস তাই সই । পরের মাসে নায়েব এসে খৌজখবর নিয়ে গেল যখন তখন অবাক হলেন সুধা । মানুষটি তাদের ভুলে যাননি । দু'দিন পরে নায়েব এসে আরো কিছু অর্থ পৌঁছে দিল—কতমিশাই মাস্টারের মাইনে আর ভালো খাবার কিনতে দিলেন ।

এই লোকটার সঙ্গে সহজ গলায় কথা বলতে পারেন সুধা । দু-চারটে কথার পর নায়েব বলেই ফেলল, কতমিশাই-এর ছাতিটা দেখেছেন—এই এত বড় । কিন্তু দিলটা ওতে ধরে না । যাকে একবার ভালো লেগে গেল তো তার ছেঁয়ে গেল । আমার মনে হচ্ছে আপনার এই ছেলোটর ভাগ্য খুলে গেছে । কতমিশাই নিশ্চয়ই একে পছন্দ করেছেন । আর আপনাদের কোন চিন্তা নেই—শুধু কোনরকমে ফাস্ট ডিভিসনে পাস করতে বলুন ছেলেকে ।

কিন্তু ফাস্ট ডিভিসন চাইলেই যে পাওয়া যাবে এ কথা সুধা ভরসা করতে পারেননি । ওই তিনমাস বাড়িতে অন্য রকম হাওয়া বয়ে গেল । নিয়ম করে পড়াশুনা, একটু যেন অবহেলা না হয়—অনিলের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল । সেই মানুষটির কাছে দিয়ে আসা কথার যেন অমর্যাদা না হয় এই রকম বাধনে সুধা অনিলকে আটকে রাখলেন । পরীক্ষা হল এবং রেজাল্ট বেরুল ।

মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য অনিল ফাস্ট ডিভিশন পেল না। যে ছেলে কোনরকমে পাশ করলেই সুধা তৃপ্ত ছিলেন আজ এই রেজাল্টের পর তিনি যেন মাথা তুলতে পারছিলেন না। এই ছয় মাসে সেই মানদুর্ঘটির সঙ্গে দেখা হয়নি, যদিও পরীক্ষা পর্যন্ত নায়েব মাঝে মাঝে এসেছে, এখন যদি তিনি জবাবদিহি না দিতে যান তাহলে কেউ তাঁর ঘাড় ধরে সেটা আদায় করবে না। কিন্তু এটা যেন তাঁরই অক্ষমতার লজ্জা, ছেলেকে কিছু বলতে পারছিলেন না তিনি। কেননা ওঁর মদুখের দিকে তাকিয়ে সুধা বদ্বতে পেরেছিলেন বেচারার মরমে মরে আছে। কিন্তু যার জন্যে ওর পাশ করা সম্ভব হল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত, ছেলে বড় হয়ে চাকরি করলে না হয় ঋণ শোধ করবে। সুধা অনিলকে বললেন মানদুর্ঘটিকে প্রণাম করে আসতে।

একা যেতে অনিলের সাহস হাঁচিল না, শেষ পর্যন্ত ওর চাপে সুধাকে যেতে হল, সঙ্গে ফাইন্যালের মার্কারশীট। সেদিন তেমন একটা ভীড় ছিল না। নায়েব ওদের দেখেই ভেতরে নিয়ে গেল। মায়ের শেখানো মতো অনিল ভদ্রলোককে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, ফাস্ট ডিভিশন যারা পেয়েছে তার মধ্যে তোমার নাম নেই দেখলাম।

অনিল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল দেখে ভদ্রলোক রেগে গেলেন, মাথা তোল। যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে তখন মাথা উঁচু করে রাখবে, ভগবান ওটাকে দিয়েছেন শরীরের ওপরে, তিনি তো হাঁটুর ওপর দেননি।

অনিল দ্রুত মাথা সোজা করল। সামান্য কটা নম্বরের জন্য ওর এখন কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন ভদ্রলোক, এবার কি পড়বে ঠিক করেছে? সালোন্স না কন্সার্স?

সুধা এবার কথা বললেন, আমার সামর্থ নেই, চারদিকে এত অভাব, আপনি যদি ওকে আপনার কোন কাজে ঢুকিয়ে দেন।

অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকাল মানদুর্ঘটি, সে কি! এই রকম একটা ব্লাইট ছেলেকে নষ্ট করবেন?

সুধা বললেন, আমাদের মতো সংসারে আর কি হবে বলুন।

চোখ বন্ধ করে টেবিলে আঙুল ঠুকে কয়েক মনোহর চিন্তা করলেন ভদ্রলোক, ঠিক আছে, আমি ওর পড়ার ভার নিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যদি ও চাকরি করত তাহলে মাসে দুশো টাকার বেশী পেত না। ওকে আর্মি হোস্টেলে রাখব, আই.এস.সিতে ফাস্ট ডিভিশন পেতে হবে। আর আশুনার জন্য মাসে দুশো টাকা আমার অফিস থেকে যাবে।

বিহবল হয়ে গিয়েছিলেন সুধাময়ী, এ রকম প্রস্তাব ওঁর স্বপ্নের অগোচরে ছিল। কিন্তু সেই মনোহর ওঁর ভেতরের সংশ্লিষ্টতাটি জেগে গেল। স্পষ্ট গলায় বললেন, আপনার কাছে আমার ঋণ অসীম। কিন্তু আমি এই টাকাটা নিতে পারব না। অনিল যদি বড় হয়, আর পাঁচটা মানুষের ক্ষতি থাকে তবে তার চেয়ে বড় পাওয়া আমার আর কিছুতেই নেই। আপনি ওকে যেমন ইচ্ছে পড়ান, আমি আমাদের চালিয়ে নেব।

হাসলেন ভদ্রলোক, তাহলে আপনি কথা দিন ওকে আমি যেভাবে গড়ব আপনি তাতে বাধা দেবেন না।

সুধা বললেন, ও যদি মানুষ হয় তাহলে মা হয়ে আমি কেন বাধা দেব? কথা দিলাম।

ভুল, ভীষণ ভুল করেছিলেন সুধা। এই কয় বছর ধরে সেই চিন্তাটাই অহরহ ওঁকে দংশন করেছে। সেদিন যদি উনি রাজী না হতেন যদি ছেলেটাকে একটা সামান্য চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার জন্য মানুষটির কাছে জিদ ধরতেন তাহলে এই রাতের অন্ধকারে অনিলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে হত না। দার্জিলিং-এর কলেজে ছেলেটা পড়তে চলে গেল। প্রথম বছর এসে কত গম্প না করেছিল। ওর পোশাক কথাবার্তা বদলে পেছে প্রচুর কিস্তি মনে মনে একটুও পাণ্ডায়নি। পরের বছর এলো না। চিঠি দিল, পরীক্ষার জন্য ছুটিতেও হোস্টেলের ছেলেরা বাড়ি ফিরছে না। ফাস্ট ডিভিসনে আই. এস, সি পাশ করল অনিল। অতটুকু ছেলেটা তাড়াতাড়ি কি বড় হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে কথা বলে, এই বাড়ির জীর্ণ পরিবেশে ওকে মানায় না। বেশীর ভাগ সময় ছুটিতে এলে সেই মানুষটির কাছে পড়ে থাকে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর ভদ্রলোক তাঁর বাসনা ব্যস্ত করলেন। তিনি অনিলকে একজন ভালো চা-শিপ্পের পরিচালক হিসাবে দেখতে চান। অতএব ওকে টোকলাইতে পাঠালেন তিনি ট্রেনিং-এর জন্য। এই কোর্সে ভরতি হওয়া অনিলের পক্ষে কখনই সম্ভব হত না যদি না তিনি থাকতেন।

ট্রেনিং শেষ করার মতুখেই আচমকা বাজ পড়ল। রেডিওতে খবর শুনল অনিল হৃদরোগে ভদ্রলোক দেহ রেখেছেন। সমস্ত শহর শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু ফাইন্যাল টেস্টের জন্য অনিলের পক্ষে আসা সম্ভব হল না। তার পরের ইতিহাস অন্য রকম। টোকলাই-এর ভালো ছেলেদের বিভিন্ন কোম্পানী ট্রেনিং শেষ হতেই টানাটানি করে নিজেদের বাগানে নেবার জন্য। আসামের যে বাগানটিতে অনিল প্রথম সরকারী ম্যানেজারের চাকরিতে ঢুকল সেটার হেড অফিস একদা ছিল লন্ডনে। ব্রিটিশ আমলের নিয়মকানুন তখনও চালু আছে সেখানে। কোম্পানি মনে করে মালিক আর শ্রমিকের জাত সম্পূর্ণ আলাদা। এবং যতদিন আলাদা থাকবে ততদিন প্রোডাকশান ভালো হবে। এবং এই নিয়ম কানুনের অন্যতম একটি সত্য হল ম্যানেজার তার সমান মর্যাদার মানুষ ছাড়া কারো সঙ্গে মিশবেন না, আত্মীয়তা রাখবেন না। সে যদি নিজের ভাই বা মা বাবা হয় তাও না। চাকরি পেয়ে অনিল মাকে চিঠি দিল ওর কাছে গিয়ে থাকতে, মা যদি ওই সামান্য টাকার প্রাইমারি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন তাহলে তাঁর স্টাডিস নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠবে না। আর অনিল যখন ভালো রোজগার করছে তখন আর এই বড়ো ব্যসে মাকে চাকরি করতে দিতে সে চায় না। কিন্তু পরীক্ষার পরে বিস্ময় জিনিসটার মোটেই অভাব নেই। সুধা লিখলেন এই চাকরি তিনি ছাড়তে পারবেন না। দীর্ঘকাল এই চাকরিতে থেকে তাঁর পক্ষে তাকে ছেড়ে বাঁচা অসম্ভব।

দোটানায় পড়ল অনিল। একদিকে মা অন্য দিকে চাকরি। একজন ম্যানেজারের মা প্রাইমারি স্কুলের টিচার এ কথা বেশীদিন চাপা থাকে না। ওকে দেখলেই সহকর্মীরা কেমন অস্বস্তির চোখে তাকায়। এই সময় টিনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ওর। টিনাকে পেতে হলে এই রকম মর্যাদার চাকরি একান্তই দরকার। টিনার মা মেকেকে দিতে পারেন অনিল যদি চাকরীর সর্ব সব সময় মেনে চলতে পারে তাহলেই। প্রথম প্রথম ওর পাঠানো টাকা সুধা নিতেন। হঠাৎ সেটাও ফেরৎ গেল। সুধা লিখলেন শঙ্কর পছন্দ করছে না অনিল মাকে টাকা পাঠাক। কারণ যে দাদা সবার সামনে মায়ের সম্পর্ক রাখতে পারছে না তার টাকা পাঠাবার কোন অধিকার নেই। মায়ের এই মনোভাব একদম স্বাধীন ভাবে আসেনি এ রকম একটা অনুমান অনিলের ছিল। কিন্তু শঙ্কর সম্পর্কে এতটা সে অনুমান করতে পারেনি। যদিও শঙ্কর পড়াশুনায় মোটেই ভালো নয় এবং ইদানিং রাজনীতি করছে তবু ওর কথা মনে এলে একটা স্নেহের প্রশ্ন সব কিছু আড়াল রাখে। ও যে অতটা বড় হয়ে গেছে তা চিন্তা করেনি অনিল। ওর লিখতে ইচ্ছে হয়েছিল শঙ্কর আগে নিজে রোজগার করে মায়ের সেবা করুক তারপর এই ধরনের উক্তি করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল, না, বাইরে থেকে সেটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সুধাময়ী চিরকালই একরোখা মানুষ, বড় ছেলের সম্পর্কে হতাশাবোধ থেকে যে অভিমান ওঁর মনে এসেছে সেটাকে আঁকড়ে রেখে ছেলের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য না নিয়ে নিজেদের অহংকার বাঁচাতে চাওয়ার জন্য হয়তো ওঁর পক্ষে ছোট ছেলের সমর্থন প্রয়োজন হয়েছিল। সেই সময় অনিল কি করতে পারত? একটি মাত্র রাস্তা ওর সামনে খোলা ছিল সেটা হল চাকরি ছেড়ে চলে আসা। সাধারণ চাকরির বাজারে হয়তো সামান্য মাইনের একটা চাকরি জুটত একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলের। কিন্তু এই যে সাহেবী চাকরির চাকচিক্য এবং ক্ষমতার স্বাদ ছেড়ে আসার কথা ভাবতে গিয়ে ওরও জেদ চেপে গেল। ও পক্ষ থেকে সহযোগিতা যদি না আসে তাহলে সে কেন সহযোগিতা করবে? আর টিনার ব্যাপারটা হচ্ছে যাওয়ার পর তো পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বিয়ের সময় অনিল মাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছিল। সুধাময়ী শব্দভেদে জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত। দিনগুলো বেশ কাটাছিল কিন্তু মনশিকল হল অনিলের ডুয়ার্সে আসার পর। কোম্পানিরই এই চা বাগানে যখন বদলি হয়ে এলো তখন সুধাময়ী গাড়ির রাস্তায় মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইন দূরে। একটা মাস কোন রকমে নিজেকে সামলাল অনিল কিন্তু তারপর সেই ছেলেবেলাটা তাকে লুণ্ঠন করে দিল। সুধাময়ী ওকে দেখে প্রথমে জেধাক হয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দের অভিব্যক্তি চাপা থাকেনি তাঁর। তারপর যখন জানলেন ছেলে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং খানিক দূরেই চুপচাপ ফিরে যাবে তখনই মনুষ্যে পড়লেন। কিন্তু অনিল এতদিন মায়ের মন থেকে কিছু শোনেনি। বরং টিনা আর মন্মের গল্প শুনে মা বোধহয় ওদের ভীষণ চিনে ফেলেছেন। একটা

ব্যাপারে অবশ্য অনিলের হার ছিল, সুধাময়ী অনেক অনুরোধেও অনিলের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিতে চাননি। দৃংখ ছিল, তবু মাকে দেখার জন্যে অনিল ছুটফুট করত এবং সুধাময়ী সেটা জানেন।

সুধাময়ী আজ রাত্রে ছেলের মদুখের দিকে তাকালেন।—আমি চাই না শঙ্কর বাড়ির বাইরে রাত কাটাক।

অনিল অসহায় গলায় জবাব দিল, ওকে বাইরে থাকতে কে বলেছে, আমি ওর দেখা পেলে আলোচনা করতাম।

সুধাময়ী বললেন, ও কোন আলোচনা করতে রাজী নয়। আর তোকে একটা কথা বলি, তোর মেয়ে বড় হচ্ছে। যে সমাজে ও মানুষ তাতে আমাদের মতে অভাবের ঘরে এলে ও বাঁচবে না। চা বাগানের চাকার ছেড়ে তুই ওকে সেই সমাজ দিতে পারবি না। বউমার কথা ছেড়ে দিলাম, মেয়ের কথা মনে রেখে আমার কাছে তোর আসা উচিত নয়। অনেক রাত হয়েছে, অত দূর রাস্তা তোকে যেতে হবে, এখন তুই যা।

নিশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে, অনিলের খুব কষ্ট হিচ্ছিল। মাথা নিচু করে সে উঠে দাঁড়াল। সুধাময়ী লগ্নটা হাতে তুললেন।—শঙ্কর বলিছিল পার্টির কাজে তোদের বাগানের কুলিদের সঙ্গে ও বোধ হয় কিছুদিন থাকবে। তখন ওকে চেনা দিস না।

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল অনিল। ওদের বাগানে লেবার ট্রাবল সৃষ্টি করতে শঙ্কর যাচ্ছে? তিনদিকে বিপদ ও পেতে ছিল এবার চতুর্থ দিকটা পূর্ণ হল। কি বলবে বদ্বতে না পেরে সে হঠাৎ নীচু হয়ে মাকে প্রণাম করল।

সুধাময়ী বললেন, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না রে। যদি খবর পাস চলে গেছি তাহলে চলে আসিস। আমি তোর হাতের আগুন নিয়ে যেতে চাই। মরার তো শোক, জাত নেই, স্ট্যাটাস নেই। নিশ্চয়ই তোর চাকারিতে কোন অসুবিধে হবে না, কি বল?

আর দাঁড়াতে পারল না অনিল। মাথা নীচু করে চোরের মতো বাইরে বেরিয়ে এলো। এ বাড়ির দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল অনিল। এখন ঠান্ডা হাওয়া বইছে। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলির শেষ প্রান্তে এসে সে পিছনে তাকাইল। ওদের বাড়ির দরজার কপাট দুটো সামান্য ফাঁক, ভেতরের হ্যারিকেনের আলো সেই ফাঁক গলে বাইরে আসছে। তার মনে সুধাময়ী এখনও নিজেকে আড়ালে রেখে ওর চলে যাওয়া দেখছেন।

অনিল এবং টিনা

বড় রাস্তায় এসে ঘড়ি দেখল অনিল। একটা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ছুটফুটানি শব্দ হয়ে গেল ওর মধ্যে। যে করেই হোক দুটোর মধ্যে

পৌঁছাতেই হবে। এমনিতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ম্যাজিক এতক্ষণ নিশ্চয়ই চলছে না। কিন্তু রাস্তায় একটাও রিক্সা নেই! আজ রাতে এই শহরে কি হল হঠাৎ? প্রায় দৌড়ে ও দিনবাজারের দিকে এগোল।

*

*

*

ঠিক সেই মূহুর্তে প্রচণ্ড হাততালিতে ম্যানেজার্স ক্লাবের সদস্যরা ম্যাজেসিয়ানকে সম্বৰ্ধনা জানাচ্ছিল। পর্দা পড়ে গেলে টিনা উঠে দাঁড়াল। এখন ঘড়িতে ঠিক একটা। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে কাল সকাল সকাল ওঠা যাবে না। অনিলকে খোঁজবার জন্য ও চারপাশে তাকাল। মেয়ে পুরুষরা বেরিয়ে এপাশ ওপাশে যাচ্ছে। আর কারো বাড়ি ফেরার তাগাদা নেই। বারের কাছে প্রচণ্ড ভীড়। টিনা সোঁদিকে কয়েক মূহুর্ত চেয়ে দেখল। অনিল নিশ্চয়ই ওখানে থাকবে না। হঠাৎ পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে টিনা মুখ ঘুরিয়ে দেখল মিসেস সোম ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, ও মা, একা একা দাঁড়িয়ে কেন? দারুণ দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে, কিন্তু কানে ওই দুলটা পরেছ কেন? বড্ড গোল মুখ দেখাচ্ছে। অনুযোগে চোখ ঘোরালেন মহিলা।

টিনা ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেলেও হাসি ফোটাল, মিস্টার সোম কোথায়? আরে ওকেই তো আমি খুঁজে মরিছি। দেখ তো কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

অসহায় ভঙ্গী করলেন মহিলা, তোমার কতটি কোথায়?

আছে কোথাও। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, কাল সকালে মুমকে দেখতে যাব ভাবছি। টিনা বাগানের দিকে তাকাল। সেখানে অনেক নারী পুরুষের জটলা। স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল টিনার।

ঠিক সেই সময় ভামাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। টিনা মিসেস সোমকে 'যাচ্ছি' বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ভামা চোঁচিয়ে উঠলেন, আরে কি সৌভাগ্য! দুজন সুন্দরী মহিলাকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার জন্য অনেক ভাগ্য দরকার।

টিনা দেখল ভামা টলছেন। টিনার দিকে মূর্চাকি হেসে মিসেস সোম বললেন, আমরা আমাদের স্বামীদের খুঁজে পাচ্ছি না।

অ্যাঁ! তাই নাকি! চলুন, আমি একটু সাহায্য করি। এই বাগানটা রহস্যময়। অনেক হারানো জিনিস ওখানে খুঁজে পাওয়া যায়। ভামা দু'হাতী দু'পাশে তুলে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন।

টিনা বলল, না না, ও এখনই এখানে আসবে। ভামার চেপ্টের দিকে তাকিয়ে ওর অস্বস্তি হচ্ছিল, এসে অবাধে উনি টিনার বুকের ওপর দু'হাতী আটকে রেখেছেন।

ঘাড় দোলালেন ভামা, এলে তো ওই বাগান থেকেই ওকে আসতে হবে। কারণ ম্যাজিক শুরুর হবার মুহুর্তাতে আমি ওকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল টিনার। অনিল তাহলে ম্যাজিক দ্যখনি! দশটা থেকে নিশ্চয়ই বাগানে বসে থাকবে না! তাহলে কি ও—দাঁতে ঠোঁট চাপল সে। ওর মন বলল, অনিল এই মূহুর্তে ক্লাবের ভেতরে কিংবা বাগানে

কোথাও নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে বাইরে যাবার কি যুক্তি দেখাবে অনিল। একবার সন্দেহ হলে সত্য উন্মোচনে দেরী হবে না। ব্যাপারটা যে সত্যি কি তা টিনা নিজেও জানে না কিন্তু ওর অনুমানটা যাতে মিথ্যে হয় প্রাপণে সেই প্রার্থনা করছিল।

মিসেস সোম খুকীর মতো ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, তাহলে চল আমরা বাগানে যাই। ঘরে বসে বসে মাথাটা ধরে গেল ভাই। নিশ্চয়ই দেখব কোন গাছের তলায় তোমার আর আমার বালক দুটি মদুখোমুখি বসে আছেন।

মিসেস সোমের বাড়ানো হাত ধরলেন ভার্মা, তারপর অন্য হাত টিনার দিকে নেড়ে বললেন, আইয়ে মেমসাব।

মন ঠিক করে ফেলল টিনা। ভার্মার মনে অনিল সম্পর্কে কোন সন্দেহ আসতে দেওয়া চূড়ান্ত বোকামি হবে। তার ওপর সঙ্গে যিনি আছেন তিনি তো চাইবেন টিনাকে বিপদে ফেলতে। এই প্রথম ও স্বভাবের বিপক্ষে গেল। ভার্মাদের সঙ্গে নেমে এলো বাগানে।

ওরা সূর্য্যকি বিছানো প্যাসেজ দিয়ে দুবার সমস্ত বাগানটা চক্কর মেরে এলো। মিসেস সোমের কোমরে হাত রেখে ভার্মা হাঁটছেন কিন্তু টিনা লক্ষ্য করছে দৃষ্টি ওর টিনার বৃকের ওপর থেকে সরছে না। অস্বস্তিটা এখন সরে গিয়েছে। না, অনিল কিংবা মিস্টার সোম, কাউকেই বাগানে পাওয়া গেল না। মিসেস সোম বললেন, কি হল, বাড়ি ফিরে গেল নাকি আমাদের ফেলে।

ভার্মা খুব উৎসাহিত গলায় জবাব দিল, ও তাহলে তো এই শর্মার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই। বলেই টিনার দিকে তাকিয়ে মূর্চক হাসি হাসল, এই প্রথম আপনার সঙ্গে পেলাম।

শেষ পর্যন্ত ওরা পিছনের গেটের কাছে চলো এলো। জায়গাটা অন্ধকার। যখন এখানে কেউ নেই। হঠাৎ ভার্মা দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেন দে হ্যাভ গো ব্যাক হোম। চলুন, আপনাদের বাংলায় ফোন করে জেনে নিই।

মিসেস সোম ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতেই ভার্মা তার চিবুক নেড়ে বললেন, ওঃ, হাউ লার্ক আই অ্যাম। ফোন করে চলুন তিনজনে আমার বাংলায় ফিরে যাই। নাইট ইজ স্টীল ইয়ং।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল টিনা, না না, ও নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। আপনারা যান, আমি দেখছি। ওর মন বলাছিল ভার্মা ওদের বাংলাতে ফোন করলে অনিলকে পাবে না। তাহলে কি জবাবদিহি দেবে ও? আর ভার্মার সঙ্গে বাংলায় গেলে—না, মিসেস সোমের ওপর ও ভরসা করতে পারে না।

ভার্মা মূখের বিরক্তি চেপে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সময়ের অপব্যবহার করছেন। লেট হিম এনজয়, আমরা বাদ পাড়ি কেন?

প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটা ছুটে আসছিল। পয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা প্রায়

প'য়গ্রিশে শেষ করে দিচ্ছে যখন অনিল তখন ওর চোখে পড়ল দূরে হেডলাইটের শেষ প্রান্তে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ওদের ক্লাব দু'মিনিটও হবে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে কেননা ওর বনেট খোলা। স্পীড কমিয়েছিল সে অজান্তেই, হঠাৎ তাকিয়ে দেখল গাড়ির পিছনে মিসেস গ্রীনব্যাঙ্ক হাত পা নেড়ে আর একজনের সঙ্গে ঝগড়া করছেন। এই অবস্থায় ওর গাড়ি থামানো উচিত নয়। পরিচিত কেউ দেখুক এটা সে চায় না। সারা শরীর এই রকম উত্তেজনায় ভ্রাইভে ঘামে জ্বজ্ববে। কিন্তু সেই মূহুর্তে মিসেস গ্রীনব্যাঙ্ক ওকে দেখে ফেললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ছুটে এলেন মহিলা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিল। যাবার সময় এই মহিলাকে ঝোপের অশ্বকারে কারোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে গিয়েছিল সে। যার সঙ্গে সেই কি ওই গাড়ির ভ্রাইভার? গাড়িটা খারাপ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ওঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন?

জানালায় কাছে এসে হাঁফাতে লাগলেন মহিলা, ও আপনি! কোথায় গিয়েছিলেন এত রাতে? হাসার চেষ্টাটা বন্ধ মেকি লাগল।

মাথা ধরেছিল তাই খোলা হাওয়ায় বোঁড়িয়ে এলাম। অনিল নির্বিকার গলায় বলল, আপনি?

আমারও। কিন্তু মাঝপথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে কি বলবে? আমি আপনার সঙ্গে ক্লাবে ফিরব? রুমালে নাক মুছলেন মহিলা।

আসুন। দরজা খুলে দিতেই মহিলা লাফিয়ে উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি এবং তার চালকের সম্পর্কে ওঁর কোন মাথা ব্যথা নেই। ছোকরা বোধ হয় নতুন এসেছে।

আপনাদের ম্যানেজার সাব তো পুরো আউট হয়ে আছেন। অনিলের ঘাড়ের কাছে এসে পড়লেন মহিলা, একদিন আসুন না আমাদের বাংলায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে অনিল বলল, দেখি। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসে গেল। ও কোথায় গিয়েছিল এই মহিলাকে সঙ্গে দেখলে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। ঈশ্বর ওকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মহিলাকে একটু বাজালে কেমন হয়, আপনাকে যাওয়ার সময় যেন বাগানে দেখে গিয়েছিলেন।

ও মা তাই নাকি! ডাকেনি কেন? এই ছেলেটা এমন হ্যাংলা নো?

লোকে কিন্তু আমাদের একসঙ্গে ফিরতে দেখলে কিছ্ ভাবতে পারে।

ভাবুক। আপনার আপত্তি আছে? থাকলে একটা অমরোধ, আমাকে যে রাস্তায় দেখেছেন তা কাউকে বলবেন না। ওর হাঁটুতে স্থিতি রাখলেন মহিলা।

অনিল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না না, আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম।

লক্ষ্মী ছেলে। ক্লাবে এমন গম্ভীর হয়ে থাকায় যে, ঘৃণাকরে বদ্বতে পারিনি পেটে পেটে এত! যাই বল, তোমার বউটা বড্ড কোন্ড।

নেকি নেকি মূখের দিকে একবার তাকিয়ে অনিল ক্লাবের সামনে গাড়ি পার্ক

করল। তারপর দৃষ্টিতে একসঙ্গে গেট খুলে ভেতরের প্যাসেজে পা দিল।

মাঝপথে আসতেই ওরা মৃদুস্বপ্নমুখি হল। টিনা চমকে উঠল ওদের দেখে। কিন্তু ওর নিজের অজান্তেই একটা বাতাস বদল শান্ত করে বেরিয়ে এলো। অনিল দেখল ভান্সি মিসেস সোম আর টিনাকে নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। টিনাকে ভান্সির সঙ্গে দেখে ওর সব কিছুর গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

প্রথমে ভান্সি হাসলেন, আরে অনিল, তোমার বউ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

অনিল কিছুর বলার আগেই মিসেস গ্রীনব্যাঙ্ক বলে উঠলেন, আমরা একটু বোকা হয়ে এলাম। বস্তু মাথা ধরেছিল।

মাথা ধরেছিল! বলে হো হো করে হেসে উঠলেন ভান্সি। কিন্তু আচমকা ক্ষেপে উঠলেন মিসেস সোম, চল, আমার বস্তু ঘুম পাচ্ছে। বলে অনিলের দিকে একবার অশ্রুদৃষ্টিতে চেয়ে ভান্সির হাত ধরে গেটের দিকে এগোলেন। যেতে যেতে ভান্সি টিনাকে বলে গেলেন, আশা করি আপনার দুর্ভাগ্য শেষ হল, গুড নাইট।

মিসেস গ্রীনব্যাঙ্ক বোধ হয় টিনার সামনে দাঁড়াতে চাইছিলেন—আচ্ছা, চলি আমি—বলে তিনিও টিনার পাশ দিয়ে ক্লাবের দিকে চলে গেলেন।

এখন এই প্যাসেজের প্রায়-অন্ধকারে টিনা এবং অনিল মৃদুস্বপ্নমুখি। টিনা কোন কথা বলতে পারছিল না। একই সঙ্গে স্বপ্নি এবং অভিমান ওকে ঘিরে ধরেছিল। অন্য মেয়ের সঙ্গে মেসার স্বভাব অনিলের কখনো ছিল না। অনিল টিনাকে দেখল। ও ভান্সির সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল এত রাত্রে? বৃষ্টির মধ্যে অশ্রুত জলধারা শব্দ হল ওর।

কিছুক্ষণ বাদে গাড়িটা খুব ধীরে ওদের বাংলায় ফিরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি। হঠাৎ অনিল বলল, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। আমি ওই মহিলার সঙ্গে ক্লাব থেকে বের হইনি।

জানি। টিনা বলল।

জানো? বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলল না অনিল, কিন্তু আর আমার বাইরে যাবার দরকার হবে না।

বিস্ময় এবার টিনার। কিছুক্ষণ চুপ করে টিনা বলল, তোমার জন্য ভান্সির সঙ্গে আমাকে হাটতে হচ্ছিল।

অনিল বলল, বদলে পারছি। আমরা তো কাল মদকে দেখতে যাচ্ছি, না?

টিনা বলল, হ্যাঁ।

অনিল বলল, ও বেশ আছে, আমার মতো নজরবন্দী নয়।

টিনা বলল, আমাদের বল।



গল্পগুচ্ছ

কেউ একজন বলেছিল, স্দুথেনের হাতের রেখা অনুযায়ী ওর কখনও টাকা অভাবে কিছু ঠেকে থাকবে না। তবে সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিল এই হাতের মালিক কখনই বিরাট বিত্তের অধিকারী হবে না। তা বলতে নেই, কথাটা মিথ্যে হয়নি আজ পর্যন্ত। খুব বিরাট কিছু রোজগার করে না স্দুথেন কিন্তু আজ অবধি কখনও হাত খালি হয়নি। এমনও হয়েছে শেষ টাকাটি খরচ করার সময় আগামীকাল কি হবে এই দৃষ্টিচ্যুত মন যখন খারাপ ঠিক তখনই এমন কোন টাকা ওর হাতে এসে গেছে যা সত্যিই ওর কম্পনার বাইরে ছিল।

স্দুথেন সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। এই পুজোয় ওর বয়স আটাশ হল, লম্বা ছিপছিপে এবং শ্যামলা রঙের শরীর। এম. এ. পরীক্ষা দেয়ার কারণে সময় সিনেমায় নামার ভূত চেপেছিল মাথায়। সেখানে অনেক ঘোরাঘুরির পর হালে পানি না পেয়ে মোড়িকো এন্ড মোড়িকোর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চাকরি করেছিল কিছু দিন। ওর যোগ্যতা সম্পর্কে কোম্পানির সন্দেহ ছিল না কিন্তু নিজেকে দালালের ভূমিকায় বেশী দিন সহ্য হল না স্দুথেনের। হাতে কিছু টাকা জমেছিল, চাকরি ছেড়ে কিছু দিন পায়ের ওপর পা দিয়ে সেই টাকা উড়িয়ে দেবার আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারিতে কিছু টাকা পেয়ে গেল ও। অঙ্কটা যদিও সামান্য তবু মাস কয়েক চলার পক্ষে যথেষ্ট। কলকাতায় ওদের নিজস্ব একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি বিশাল, কিন্তু ছয়-শরিকের কল্যাণে ওর অংশে চারটে ঘর ভাগাভাগির ফলস্বরূপ এসেছে। মা স্দুখলতার সঙ্গে স্দুথেন বাস করে। শৈশবে ওর বাবা কার পাল্লায় পড়ে বৃদ্ধি সন্ধ্যাসী হয়ে যান এবং এখনও তিনি ফেরেননি। স্দুখলতা এখনও নিজেকে বিধবা ভাবতে পারেন না যদিও দীর্ঘকাল ওঁর মনের ওপর প্রলেপ ফেলে ফেলে স্বামীর অনুপস্থিতি ভুলিয়ে দিয়েছে। স্দুখলতার এখন একমাত্র চিন্তা পুত্রকে নিয়ে। ছেলের কোথাও মন দিয়ে কাজকর্ম করার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। এম. এ. পাশ করল না। বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করবেন সেটাও সম্ভব নয় ছেলের বাউঁডুলেপনার জন্য। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির কিছুমাত্র অভাব নেই স্দুথেনের। ছেলেবেলায় তাকে কি কণ্ঠে স্দুখলতা মানুষ করার চেষ্টা করেছেন সে গল্প ও জানে। বাবা না থাকায় এবং অন্য আত্মীয়-স্বজন উদারতা না দেখানোর স্দুখলতা দিন রাত সেলাই করে চোখের বারোটা বাজিয়েছেন। এম. এ. পড়ার সময় সিনেমায় নামবার প্রচেষ্টার সময় স্দুথেন দিনে ছাঁটি ছাগকে বিভিন্ন সময়ে পড়াত। ফলে স্দুথেনের অর্থ উপার্জন শুরুর হওয়ার পর থেকে স্দুখলতার ওপর আর চাপ নেই। কিন্তু এতে উনি ভরসা পাবেন কি করে। পাকাপাকি একটা কিছু করে স্থিতি হয়ে-বসার কথা বললে স্দুথেন হাসে। কিন্তু এই ভাবে বেশী দিন চলে না, একটা মানুুষের স্দুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে হলে নিয়মমত আয়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

আর এই ব্যবস্থার জন্য স্দুথেন ইদানিং উঠে পড়ে লেগেছে। ও হিসেব করে

দেখেছে আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ওকে গাছে ওঠার মইটা দিতে পারে। আর এরকম সময় ওর সঙ্গে অবনীর দেখা হয়ে গেল। লাইটহাউসের উল্টো দিকে ইংরেজি বইয়ের স্টলটার সামনে দাঁড়িয়ে বইগুলোর মলাট দেখছিল বৃন্দ। হয়ে এমন সময় পিঠে আলতো করে চড়টা পড়ল। সুখেন পিছন ফিরে দেখল অবনী হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝারি লম্বা, কাগজের মতো ফরসা এবং রোগা চেহারার অবনী গত দশ বছরে খুব একটা পাষ্টায়নি। কিন্তু বিদেশী টাই আর জামা প্যাণ্টের পেলবতা দেখে বোঝা যায় ডবল হাফ-চা খাওয়া অবনীর সঙ্গে এই অবনীর দৃষ্টির ফারাক।

কি রে, হাঁদার মতো দেখাচ্ছিস কি? চিনতে পারাচ্ছিস না! অবনী হাসল।

সুখেন ঘাড় নাড়ল—কেমন আছিস? অনেক দিন তোকে দেখিনি।

অবনী ঘাড় নাচাল—চলে যাচ্ছে। বিয়ে-থা করেছিস?

না। সুখেন দেখল অবনীর কথা বলার ভঙ্গীতে বেশ গ্রামভারী ভাব এসেছে।

কি করছিস এখন?

কিছুই না। কি করা যায় তাই ভাবছি। তোর খবর কি?

অবনী চট করে ঘাড়ি দেখল। তারপর আশেপাশে দ্রুত চোখ বদলিয়ে বলল, তোর তাড়া আছে? না থাকলে মিনিট দশেক বসা যেত। সুখেন সম্মতি জানাতে অবনী ওকে বগলদাবা করে লাইটহাউসের দোতালায় নিয়ে এসে দুটো বিয়ার দিতে বলল। সুখেন আপত্তি জানাতে গিয়ে চুপ করে গেল। মদ খেতে ওর ভালো লাগে না কিন্তু তাই বলে কোন শূচিবাই ব্যাপারও নেই। নিজের পয়সা খরচ করে কখনো মদ খাবে না এবং এমন খাওয়া খাবে না যে পথেঘাটে মানুষ হুঁতুলে তাকায়—মোটামুটি এই রকম সিদ্ধান্ত ওর নেওয়া আছে। অবশ্য মদ এবং বিয়ার সমাজতের নয় অবনীই জানাল। টেবিলে বসে অবনী প্রথম যে ঘটনাটা জানাল সেটা শুনে হাঁ হয়ে গেল সুখেন। সেটার জের না সামলাতে দ্বিতীয়টি শুনে কিছুক্ষণ অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওদের কলেজের সবচেয়ে নাক উঁচু এবং সুন্দরী (দুটো অবশ্য আলাদা হয় না) মধুছন্দাকে বিয়ে করেছে অবনী সুখেনের মনে পড়ল সাদা গাড়িতে যে মেয়েটি কলেজে এসে সেটের সুবাস ছড়াত তাকে উতাস্ত করার অভিযোগে অবনীর একবার তলব পড়েছিল অধ্যক্ষের ঘরে। মূচলেকা দিয়েছিল বলে অবনী সম্পর্কে একটা গুজব তখন ছড়িয়েছিল। ওদের মধ্যে প্রেম-ট্রেন জমাবার কোন চান্স ছিল না আর। সেই মেয়েকে অবনী বিয়ে করেছে, পাঁথিবীতে কত কি যে হয়ে যায়, অবনী মনে মনে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথমটির ফলশ্রুতি। মধুছন্দার বাবা মাদ্রাসা ওয়ার পর প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সমেত এক্সপোর্টের চাল, ব্যবসার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চেপেছে। একশো তিনজন কর্মচারীর ওই অফিসটির কর্মকর্তা ও

বিয়ার খেতে খেতে অবনীর দিকে তাকিয়ে সুখেন রুমালে মুখ মুছল। অবনী বলাছিল, এক সময় একটা টাকার দাম আমার কাছে অনেক ছিল। এখন আর টাকা

ভালো লাগে না। মদ-টদে কত খরচ করব বল। যেদিকে হাত দিই টাকা আসছে আর আসছেই। আমি যা ইনকাম-ট্যাক্স দিই আমার বাবা তাই রোজগার করার স্বপ্ন দেখেনি। ঘেন্না ধরে যাচ্ছে টাকাতে। অবিশ্বাস্য লাগছে হয়তো তোর, কিন্তু ঘটনাটা তাই।

সুখেন অনেকক্ষণ বাদে প্রশ্নটা করল, কি করে মধুছন্দাকে বিয়ে করলি ?

আবার কাঁধ নাচাল অবনী, হস্বে গেল। প্রজাপতির ব্যাপার। কিন্তু এতে আমার মন ভরছে না। আমি এমন একটা কিছু করতে চাই যাতে টাকা আছে কিন্তু নাম, মানে ফেমও আছে। আইভিরাটা আমার অনেক দিন মাথায় ঝুঁকছে কিন্তু লাইনটা আমার ঠিক পরিচিত নয় বলে ইতস্তত করছি। তাকে দেখে আমার আইভিরাটা এসে গেল।

কি ব্যাপার ? সুখেন তাল পাচ্ছিল না।

একবার শূন্যেছিলাম তুই নাকি ফিল্মে জয়েন করেছিস ?

দূর, কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেছিলাম কিন্তু হালে পানি পাইনি। আসলে কলেজে নাটক করতাম তার ভূতটা মাথায় চেপেছিল। সুখেন পাশ কাটাতে চাইল।

কলেজে আমিও নাটক করতাম, কম্পিটিশনে তোদের কাছে আমরা দুই পর্যায়ে হেরেছিলাম মনে আছে ? ঠিক আছে, শোন, আমি ছবি করছি। তুই অনুরোধ করের নাম শূন্যেছিস ? সিরিয়াস গলায় বলল অবনী।

ঘাড় নাড়ল সুখেন, না।

এবার শূন্যেছি। পুণা থেকে পাশ করেও ব্যাকিং নেই বলে নায়িকার কাজ পায়নি। এখানকার পরিচালকরা ওকে হিরোইন করতে রাজী নয়, কিন্তু সাইড রোলে সে অ্যাডজাস্ট করবে কেন ? আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম কিন্তু কতগুলো অসুবিধে থাকায় এগোতে পারছি না।

কি অসুবিধে ? কথাগুলো হজম করছিল সুখেন।

মধুছন্দা ! তিনি আমাকে বিজনেস এন্ট্রেন্ট করতে সব রকম স্বাধীনতা দেবেন, আমি যদি মূঠো মূঠো টাকা উড়িয়ে দিই খেয়ে-দেয়ে তাতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁর বাবার টাকায় আমি অন্য কোন ব্যবসা করতে পারব না। পুরো সম্পত্তির অংশীদার আমরা দুজন, সমান ভাগ। তাই আমার এমন একজন লোক দরকার যে আমার হস্বে ছবিটা প্রযোজনা করবে। অর্থাৎ আমার বিশ্বাসভাজন কেউ থাকে সামনে রেখে আমি কাজ করতে পারব। একমাত্র সত্য হল মধুছন্দা এ সব ব্যাপার কিছুই জানবে না। তাকে দেখে ভাবলাম রিস্কটাই নিই, তুই রাজী ?

তৃতীয় ধাক্কাটা খেয়ে সুখেন সোজা হয়ে বসল। অবনী কি ওকে আগাগোড়া ব্রাফ দিচ্ছে ? যার পকেটে টাকা নেই তাকে বৃত্তান্তটি প্রযোজক বানিয়ে দিতে চাইছে ? সুখেন বলল, রাজী হলে আমার কি ক্ষতি হবে ?

কাঁধ নাচাল অবনী, রাজী হলে তুই আমার কাছে আপাতত বারো হাজার টাকা পাবি। ছবি যদি হিট করে একটা তাহলে পার্সেন্টেজ অব প্রফিট আমরা ঠিক করে

নেব। প্রযোজক হিসেবে তোর নামও হবে। তোকে ভালো অভিনয় করতে হবে, কেউ যেন ঘৃণাক্ষরে টের না পায় যে তুই নকল লোক। যা কিছু ব্যবস্থা আমি করব কিন্তু লোকে সেটা জানতে পারবে না। মোটামুটি পাঁচলাখ টাকার ছবি হবে বলে হিসেব হয়েছে। টাকাটা তোকে আমি থোকে থোকে দেব খরচ করতে। একটা দিন চিন্তা কর, তারপর যদি আপত্তি না থাকে তো আমার সঙ্গে দেখা করবি। পকেট থেকে পাস বের করে একটা চকচকে আইভারি কার্ড বের করে সন্ধুত্বের সামনে রাখল অবনী।

কিন্তু টাকাটা আমি কোথেকে পেলাম, এই হিসেব কি করে দেব? সন্ধুত্বের মাথা ঘুরছিল।

সেটা আমার চিন্তা। ম্যানেজ করার রাস্তা আমার জানা আছে। ঠিক আছে, আমি উঠি। পরশু সন্ধ্যাবেলায় চলে আস, কিন্তু মধুছন্দার সামনে কোন আলোচনা নয়, ও-কে!

অশ্রুত ঘোরের মধ্যে কতকগুলো ঘণ্টা কাটল সন্ধুত্বের। একটা চাকরি না হলে যেখানে চলছে না সেখানে রাতারাতি প্রযোজকের ভূমিকা পেয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতের রেখা এত স্পষ্ট সত্যি কথা বলে ভাবতে পারেনি সে। এক সময় সিনেমায় নামবার জন্য জুড়তোর শুকতলা ক্ষইয়েছে আর আজ সে সিনেমা তৈরি করছে অর্থব্যয় করে—লোক খবরটা কি ভাবে নেবে? ব্যাপারটা কাউকে বলা যায় না, সুখলতাকে বলবে বলবে করে বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে এটা এমন একটা খেলা যাতে ওর কিছুই হারাবার নেই। রাতারাতি বাদশা হবার সুবর্ণ সুযোগটা হাতে পেয়েও ওর ঠিক স্থিতি হচ্ছিল না। অনেক ভেবে চিন্তে সন্ধুত্ব এই সিদ্ধান্তে এলো সে যে একশো ভাগ মধ্যবিত্ত এর দ্বারা তাই প্রমাণ হয়।

ম্যাক্সমুন্ডার ভবনের পাশে সাততলা বাড়িটার দোতলার দরজায় অবনীর নাম লেখা আছে, পাশে মধুছন্দারও। ইন্টারভ্যু দেবার মতো টিপটপ পোশাকে সন্ধুত্ব দরজার পাশে মদ্য তোলা সুইচটায় আঙুল রাখল। একরাশ কোকিল ডেকে উঠল ভেতরে, যেন বসন্ত হুড়মুড় করে ছুটে এলো। চাকর বলতে অসুবিধে হয়, বেলারটির পিছন পিছন সন্ধুত্ব হলঘরটায় এসে বসল। পুরো ঘরটায় ক্রিকেট খেলা যায়, কার্পেটে মোড়া এবং সুন্দর করে সাজানো।

অবনী দেরী করল না আসতে, পোশাকে বোঝা যায় বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি ছিল, যাক, সময় মতো চলে এল তাহলে। তারপর কি ঠিক করলি? শেষের কথাটা বলার সময় ওর গলার স্বর নেমে এলো।

আমার ভূমিকা স্পষ্ট করে জানা দরকার। কিছু যদি করার না থাকে তাহলে মিছিমিছি টাকা নিতে চাইছি না। সন্ধুত্ব বলল।

আরে সব কিছুই তোকে করতে হবে, পুরো অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব তোর ওপর। আমি শুধু টাকা দেব। প্ল্যান প্রোগ্রাম তুই করবি।

শেষ পর্যন্ত বিধা ঝেড়ে ফেলে দিল সন্ধুত্ব ঠিক আছে, রাজী।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ওর হাতে হাত মিলিয়ে অবনী বেলারাকে ডাকল, ড্রিংকস্

লেয়াও। বলেই মত পাশটাল, আচ্ছা ওটা বাইরে খাব।

এখন কি খাবি—চা না কফি ?

চায়ের পক্ষে মত দিল সুখেন। সেই সময় মধুছন্দাকে দেখল সে।

সামান্য এই কর্ণটি বছরে মধুছন্দা আপাদমস্তক পাশে গেছে। কলেজে পড়ার সময় রোগাটে মেয়েটার শরীর এখন পূর্ণ চাঁদের মতো ফুলে ফেঁপে জোয়ারের জল ছিটোচ্ছে। এবং এই রকমটা হলে গায়ের রঙে সোনার পালিশ লাগে, মধুছন্দার কালো শাড়ির আড়াল সেই পালিশকে মোলায়েম করে তুলছিল। অবনী আলাপ করিয়ে দিল, সুখেনকে তোমার মনে আছে ?

সামান্য মাথা হেলিয়ে হাসল, বাঃ চিনব না। কেমন আছেন ?

বেকারের আবার থাকা—এ রকম একটা কিছুর বলতে যাচ্ছিল সুখেন, শেষে মধুছন্দা সামলে নিজে বলল, ভালো। আপনি অনেক পাশে গেছেন !

খুব মোটা হলে গোঁছ, না ! ভু কংচকে হাসল মধুছন্দা, বিস্মে-খা করেছেন ?

না। পাত্রীরা আমাকে পছন্দ করবে না। সামলে সামলে কথা বলল সে।

সে কি ! আপনার এত টাকা, ছবি প্রোডিউস করছেন আর মেয়েরা অপছন্দ করবে, এ কি হয় ? আপনার ছবি কবে শুরুর করছেন ?

সুখেন অবনীকে একবার চোরা চোখে দেখে নিল। তার মানে ওর মত পাওয়ার আগেই অবনী স্ত্রীর কাছে বানানো গল্পটা বলে রেখেছে। অর্থাৎ এই মধুছন্দা থেকে ওর অভিনয় শুরুর হচ্ছে। সামান্য হাসতে চেষ্টা করল সুখেন, দেখি, সবকিছুর যদি ঠিকমতো চলে মাস ছয়েকের মধ্যেই শুরুর করব। এই সময় বেগারা এসে জানাল অবনীর টেলিফোন এসেছে।

এক মিনিট অননুমতি চেয়ে সে উঠে যেতে সুখেন অস্বস্তিতে পড়ল, মধুছন্দা একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

আপনার ছবির বাজেট কত সুখেনবাবু ? মধুছন্দা বলল।

এই ধরুন, লাখ চার পাঁচ।

যদি পুরোটা জলে চলে যায়, তাহলে ?

কপালে ঘাম এসে যাচ্ছে টের পাচ্ছিল সুখেন, জীবনে ঝুঁকি না নিলে কখনো ল্যাভের মদ্য দেখা যায় না।

তার মানে আপনি ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন। কিন্তু মানুষ ঝুঁকি নিতে পারে যখন সেটা নেবার ক্ষমতা তার থাকে। তাই না ?

মানুষ বিশেষে সেটার হেরফের হয়। কেউ পদতুচ্ছ করে সব হারিয়ে শেষে কুটোটে কুটু সম্বল করে ঝুঁকি নিতে চায়।

আপনি কি সেই দলে ? মধুছন্দা চোখ সরিয়েছিল না।

যদি বলি হ্যাঁ ? সুখেন তাকাল।

তাহলে বলব আপনার সাহস আছে। আপনার সঙ্গে এতদিন পরে আলাপ করে আমার ভালো লাগল। আমি একটু আলাদা ভাবে কথা বলতে চাই। মধুছন্দা

ঝাড় ফিরিয়ে দরজাটা দেখে নিল।

গোলমাল হয়ে গেল সন্ধানের। আলাদা ভাবে কথা মানে ব্যক্তিগত কথা ? যেটা অবনীকে জানাতে চায় না মধুছন্দা। এদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে রহস্যের ঘন্টা পেল সন্ধান। খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করল, কি কথা ?

এখন নয়, শনিবার বেলা তিনটের সময় যদি দয়া করে একবার এখানে আসেন, ভালো হয়। আর এই আসার কথাটা তৃতীয় ব্যক্তি জানুক আমি চাই না।

অবনীর প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল, সন্ধান রাজী হওয়া মাত্র কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। ছবি শূরু হবার আগের যে কাজটা তার গুরুত্ব কম নয়। সেজন্য একটা অফিস দরকার এবং সম্ভব কারণে অবনী যখন নিজের বাড়ি বা অফিস ব্যবহার করতে পারছে না তখন বালিগঞ্জ সাকুলার রোডে নিয়ে রাখা ফ্ল্যাটটাতে এই ফিল্ম অফিস খোলা হল। এই ফ্ল্যাট যে বেনামে অবনীর নেওয়া ছিল সেটা অনুমান করতে পারে সন্ধান, কিন্তু এতদিন অবশ্যই ওটা তালাবন্ধ ছিল। ছবি পরিচালনা করবে চিত্রদূত ছদ্মনামে একাটি গোষ্ঠী এবং সেটা যে অবনীর ছদ্মনাম বদ্বন্ধে অসুবিধে হয় না। একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের গল্প নিয়ে সে ইতিমধ্যে চিত্রনাট্য লিখে রেখেছে। অফিস খোলার দিন থেকেই শূরু হয়ে গেল বিভিন্ন টেকনিসিয়ান পছন্দ করা। একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যান না হলে অবনীর অসুবিধে হবে বলে সে রকম একজনকে নিয়োগ করা হল। সন্ধ্যায় ওরা যখন একটু নির্বিবল হল তখন অবনী ওকে এক হাজার টাকার খামটা দিল। সারাদিন ধরে বিভিন্ন মানদ্বয়ের সঙ্গে প্রযোজক হিসেবে কথা বলতে বলতে সন্ধানের ব্যাপারটা খেয়ালে ছিল না, এখন হোঁচট খেয়ে সামলে নিল। আজ অবনী তাকে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়েছিল বিভিন্ন খাতে খরচের জন্য। তার বিরাট অংশ এখন আলমারিতে তোলা আছে। খামটা হাতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এসে সন্ধান আজকের খরচগুলোর হিসেব লিখে অবনীকে ব্যালেন্সটা ফেরত দিতে আলমারি খুলল।

অবনী হাসল, ওটার জন্য খুব একটা ব্যস্ত নই আমি। প্রতি এক লাখের হিসেব দিলেই চলবে। আমি এক বছরের মধ্যে ছবি শেষ করতে চাই। স্ক্রিপ্টের একটা কপি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, প্রযোজক হিসেবে তোমার পড়ে রাখা উচিত। আর এই হল কাস্টিং, তুমি কাল থেকেই আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু কর, আমি আগামী মাসের দশ তারিখ থেকে শূটিং করতে চাই।

সন্ধান লক্ষ্য করল কাল অবনী প্রথম দেখায় তুই বললে আজ হঠাৎ তুমিতে চলে গেল। অবনী চলে যাওয়ার খানিক পরেই টেলিফোন বাজল। মহিলা কণ্ঠ একজন খুব বাস্তবতার সঙ্গে জানতে চাইলেন যে অবনী আছে কিনা ? সন্ধান 'না' বলতে মহিলা খুব হতাশ হলেন। সন্ধান জানল মহিলার নাম অনুরাধা। টেলিফোন নামিয়েই ওর মনে হল প্রযোজক হিসেবে কিছুর কথা বলা উচিত ছিল তার। কারণ কাস্টিংয়ের যে লিস্ট অবনী দিয়ে গেছে তার ফিল্ম লিডে অনুরাধা করের নাম রয়েছে।

পরদিন সুখেন ভোরে উঠে ঠিক করল সকাল সকাল অফিসে গিয়ে চিত্রনাট্য নিয়ে বসবে। বেলা বাড়লে লোকজনের ভীড়ে ঠিক মন দিয়ে পড়া যায় না। অবশ্য তার যদি কোন অংশ পরিবর্তন করার কথা মনে হয় সেটা অবনী শুনবে কিনা কে জানে। সাড়ে আটটা নাগাদ অফিসে চলে এলো সুখেন। একজন দারোয়ান গোছের লোকের কাছে চাবি থাকে, সেই ঝাঁট-পাঁট দেয়। তাকে খুঁজে বের করে শুনল বড় সাহেব ভেতরে আছেন। সুখেন দরজার সামনে এসে দেখল কোলাপসিবল গেটটা টানা, তালা নেই। বেশ কয়েকবার নক্ করার পর ভেতর থেকে সাড়া এলো। দরজা খুলতে বলায় কপাট সামান্য ফাঁক হল, সুখেন দেখল একজন মহিলা তার কাঁধ ছোঁয়া খোলা চুলের মদুখ বের করে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

নিজেদের অফিসে এ রকম প্রশ্নের সামনে পড়ে অবাক হয়ে গেল সে।

অবনী ভেতরে আছে? সুখেন জিজ্ঞাসা করল ঠান্ডা গলায়।

উম, কিন্তু উনি বাথরুমে। আপনি কে? মহিলার চোখে-মুখে বিরক্তি।

আমি সুখেন বলছি, ওকে বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল মুখে। কপাট খানিকটা সরিয়ে মহিলা ওকে আমন্ত্রণ জানালেন, ও মা, আসুন আসুন। আপনিই তো এই ছবির প্রযোজক? কিছু মনে করবেন না।

সুখেন ভেতরে ঢুকে থ হয়ে গেল। মহিলার শরীরে বেশবাস ভীষণ রকম অগোছালো, বোধ হয় জামা-কাপড় গুঁছিয়ে পরে উঠতে পারেননি। শব্দের মতো গায়ের রঙ সেই এলোমেলো পোশাককে ধরে রাখতে পারছে না। বাঙালী মেয়েদের চেয়ে ইনি একটু দীর্ঘকায়, কিন্তু ঈশ্বর যৌবন শব্দটাকে এর সর্বাস্থে সেঁটে দিয়েছেন। মহিলা নিজেকে সহজ করার যাবতীয় প্রয়াস চালিয়ে আবার বললেন, আপনার বন্ধু এইমাত্র বাথরুমে গেল।

কোন কথা না বলে নিজের চম্বারে চলে এলো সুখেন। এই সাত-সকালে অবনী এ রকম কাণ্ড করবে অনুমানেও ছিল না। হাজার হোক এটা অফিস, লক্ষ্মীর জায়গা—ভেতরে ভেতরে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ ওর মনে হল পুরো ব্যাপারটাই অবনীর ভাঁওতা নয় তো। এই মেয়েছেলটিই বা কে? অনুরোধ করার নামটা মনে আসতে দেরী হল না। এই প্রথম নিজেকে ঝুঁকি দালাল মনে হল সুখেনের। চম্বারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ছিল সে, ইন্সট্রুমেন্টের গন্ধটা নাকে যেতেই চোখ খুলল।

অনেকটা সাজগুজু করে নিয়েছেন মহিলা, হেসে বললেন, আপনার ঘরে না বলে ঢুকে পড়লাম। বসতে বলবেন না?

বসুন। সুখেন ওঁর দিকে তাকাল। বোধ হচ্ছে না একটু আগে মহিলা অবনীর সঙ্গে কতটুকু খেলেছেন! কারণ ওর জামার ওপর মদুখ বাড়ানো দুটো সোনালি বেল অর্ধমুদ্র এবং স্থির।

আপনার কি এত তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিল? মহিলা চুল সরিয়ে আলতো

গলায় বললেন ।

ছিল না । আমি দৃষ্টিত ।

আরে না না । আচ্ছা, আমি কে চিনতে পারছেন ?

আপনি এই ছবির নায়িকার ভূমিকার অভিনয় করছেন ।

বাঃ । আপনি কখনো আমার না দেখে কি সুন্দর অনুমান করলেন । অবনীদা সত্যি এত ভালো লোক না— ! ওই চরিত্রটাতে আমাকে মানাবে তো ? আদর্রে আদর্রে ভঙ্গী করলেন অনুরাধা ।

অবনী এখন বলছে তখন নিশ্চয়ই মানাবে ।

বাঃ, আপনি তো প্রোডিউসার, আপনার বুদ্ধি আমাকে পছন্দ না ?

সুখেন ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি মেয়েদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না । তবে একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য আপনি এই—।

সুখেন কথা শেষ করবার আগেই অবনী দরজায় এসে দাঁড়াল, সাত সকালে অফিসে, কি ব্যাপার ?

সুখেন দেখল অবনী টিপটপ । গম্ভীর মুখে সে বলল, প্রশ্নটা আমিও করতে পারি ।

আমি ? অবনী হাসল, আমি অনেকে ওর রোলটা বোঝাচ্ছিলাম । আজ দুপুরের ফ্লাইটে আমরা লোকেশন দেখতে বাগডোগরা যাচ্ছি । যাওয়ার আগে ওর রোলটা বুঝে নেওয়া দরকার ছিল । তারপর অনুরাধার দিকে মূখ ফিরিয়ে ঠাট্টার গলায় বলল, প্রযোজককে কেমন কৈফিয়ৎ দিতে হয় দ্যাখ ।

ভীষণ রাগী প্রযোজক । বলে খিলখিল করে হেসে উঠল অনুরাধা ।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সুখেন, লোকেশনটা কোথায় ?

দেখি, কালিঝোরা ডাকবাংলোতে উঠে স্পষ্ট পছন্দ করব । আর হ্যাঁ, অনেকে হাজার পাঁচেক এ্যাডভান্স দিয়ে দাও । ওর কন্ট্রাক্ট ফর্মটা আমার কাছে আছে ।

পাঁচ হাজার ।

হুঁ ।

সুখেন আলমারি খুলে টাকাটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল । অবনীর হিসেব নিভুল, এই টাকাটাই গতকালের ব্যালেন্স হিসেবে পড়ে ছিল । অর্থাৎ এই মর্হুত থেকে প্রযোজকের কাছে কোন টাকা থাকল না । সেই-সাবুদ না করেই মহিলা টাকাটা নিলেন । যাওয়ার আগে অবনী জানাল মধুহুন্দা জানে আমি দিল্লী যাচ্ছি ।

চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকল সুখেন । বারো হাজার টাকার জন্যে এ রকম পদতুল হয়ে থাকা সম্ভব নয় । প্রথম প্রথম যতটুকু কাজ করতে পারবে মনে হচ্ছিল এখন যে সেটা অসম্ভব তা বুঝে গেছে সে । মধুহুন্দার মতো স্ত্রী থাকতে অনুরাধাকে নিজে অবনীর এই ব্যাপারের পিছনে এক মদত দিতে পারবে না । এর মধ্যে অবনীর ব্যবহার দ্রুত পাণ্টে গেছে । সুখেনটা খুব শীগগির নেমে চাকর-বাকরদের পর্যায়ে নেমে আসবে । সুখেন দরজায় তালা বন্ধ করে নীচে নেমে এলো । যে ওর হাত দেখে বলেছিল কখনো টাকার অভাব হবে না সে মিথ্যে বলেনি কারণ

এখন ওর পকেটে একহাজার টাকা আছে। অন্তত দুটো মাস নিশ্চিন্ত।

*

*

*

ম্যাক্সি পরা মধুছন্দাকে দেখতে খারাপ লাগছে না। সব পোশাক সব মেয়েকে মানায় না আবার কাউকে দেখে মনে হয় পোশাকটা ওর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। পুরোটা না হলেও মধুছন্দা শেষের কাছাকাছি। আজ দুপুরে এখানে আসার আগে অনেক ভেবেছে সে। যখন কথা দিয়েছিল তখন চিন্তা করেনি, পরিস্থিতিটা অন্য রকম ছিল। আজ অনেকবার সে ভেবেছে চারিটা সোজাসুজি অনুদান হাতে দিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলে আসবে।

এখন মধুখোমড়া চেন্নারে বসে সে প্রচণ্ড অস্বস্তি অনুভব করল। ব্যাপারটা ওদের স্বামী স্ত্রীর বাইরের লোক হিসেবে ইন্দন যোগাবার কি দরকার তার! অবনীর চাকরিটা সে যখন ছেড়ে দিয়েছে তখন—? সুখেন নিজেকে নির্লিপ্ত রাখার চেষ্টা করেছিল।

আপনার ছবির কাজ শুরুর হয়েছে শুনলাম। মধুছন্দা বলল, গম্পটা কার? এক মধুহৃত ভেবে নিল সুখেন—ছবিটা আমি করছি না।

সে কি! ভীষণ অবাক হয়ে গেল মধুছন্দা, এই যে শুনলাম সব ঠিকঠাক, অফিস নিয়েছেন।

হ্যাঁ, সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু আমি বেঠিক হয়ে গেলাম। ছেড়ে দিন ও কথা কি যেন বলবেন বলোছিলেন—। সুখেন থামল।

আমত চোখে কিছুদ্ধ দেখল মধুছন্দা—আপনার সঙ্গে ওঁর গোলমাল হয়েছে?

মানে? অবাক হল সুখেন। যা-ই শব্দে থাকুক মধুছন্দা, অবনী অবশ্যই ওকে বলবে না যে এই প্রজেক্টের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। অন্তত ছবি শুরুর মধুহৃত একথা সে স্ত্রীকে জানাবে না।

আমার প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না কিন্তু সুখেনবাবু, আমি জানি ও দিল্লী মায়ানি। দিল্লী গেলে সম্ভাব্য যে সব জায়গায় ওঠে সেখানে কেউ ওর দেখা পাননি।

আপনি কি করে জানলেন?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন বিশ্বাসে ফাটল আসে তখন এই সব খবর পেতে কোন অসুবিধে হয় না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মধুছন্দা। ওদের এই ঘরের সামনে চমৎকার আমতক্ষেত্রের আকাশ রয়েছে। ফ্ল্যাটটা শব্দহীন। একটু ইতস্তত করে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবেন?

নিশ্চয়ই, কিন্তু কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কি অবনীকে সন্দেহ করছেন? সুখেন খুব বিহবল।

সন্দেহ! না, সে পাট চুকে গেছে অনেক দিন। অহলে চলুন। দু'হাত তুলে ওকে ওঠার অনুরোধ করল সে।

কিন্তু আপনার এভাবে যেতে চাওয়াটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। আমি অবিবাহিত, অবনী হয়তো পছন্দ করবে না। সুখেনের চোখে নিজের জীর্ণ বাড়ির

চেহারাটা ভাসছিল। যে লোক চার পাঁচ লাখ টাকা জলে ফেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তার গৃহ ও রকম হতে পারে না। মধুছন্দা কয়েক পা এগিয়ে সুখেনের পাশে দাঁড়াল, আপনার বন্ধুকে আমি ভয় করি না। এই নির্জন ফ্ল্যাটে যদি আপনার সঙ্গে আমি সময় কাটাতে পারি তাহলে আপনার বাড়ি কি দোষ করল। সেখানে নিশ্চয়ই আপনার আত্মীয়স্বজন আছেন। আর আমার মনে হয় বিবাহিতরাই অবিবাহিতের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। তারপর হঠাৎ মত পাশে ফেলার ভঙ্গী করে বলল, ছেড়ে দিন এ সব কথা, আপনার নায়িকা অনুরাধার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছে, কেমন লাগল তাকে? সূত্রটা খুঁজে পেল সুখেন। অবনী যা-ই বলুক তাকে মধুছন্দার কাছে বোধ হয় কিছুই অজানা নয়। বলল, অনুরাধা দেবীকে দেখেছি, চেহারা সুন্দর।

কতখানি? নায়িকা হবার মতো কি?

বোধ হয়।

নায়িকা হতে গেলে শরীরের কি রকম কোয়ালিটিজ থাকা উচিত?

ওর মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, এটা ঠিক। পাশ কাটাতে চাইল সুখেন।

আমার মধ্যে সেটা নেই? গলা নামাল মধুছন্দা।

অস্বস্তিতে সুখেন বলল, তুলনা জিনিস বড় খারাপ।

এদিকে তাকান। প্রায় ধমকের ভঙ্গীতে বলে উঠল মধুছন্দা, আমাকে দেখুন, আমি একটা বাংলা ছবির নায়িকা হতে পারি না?

এক পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানো মধুছন্দার শরীরে এখন অনেক ঢেউ। মাথা নাড়ল সুখেন, পারেন।

খুশি হল মধুছন্দা, আর একটু এগিয়ে এসে বসে থাকা সুখেনের কাঁধে হাত রাখল আমি সব জানি সুখেন। আপনি অবনীর চাকরি করছেন। প্রযোজনা করার মত অর্থ আপনার নেই। অবনী জানে না আমার বাবার একজন বন্ধু পল্লিশের খুব বড় পোস্টে আছেন। তার কাছ থেকে আপনার খবর পেতে কোন দেরী হয়নি। কিন্তু আপনি বললেন যে ছবি করছেন না, তার মানে আপনি কি অবনীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?

মাথা নাড়ল সুখেন, হ্যাঁ।

কেন?

মানতে পারছিলাম না।

কেন?

তাকাল সুখেন, আপনি এত খবর পাচ্ছেন এটাও পেরে যাবেন।

তবু আপনার মন্থ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।

না, এটা বলতে পারব না।

তাহলে আপনি তো এখন মূক মানুষ। কত টাকার চুক্তি হয়েছিল ওর সঙ্গে?
মধুছন্দা সামান্য ঝুঁকল।

বারো হাজার ।

আমি যদি কুড়ি দিই !

মানে ?

আমি কিছু টাকা জলে ফেলে দিতে চাই । আপনি গল্প বাছুন, পরিচালক ঠিক করুন, ছবি শূন্য করুন । আমি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে ।

বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল সুখেন । তারপর গাঢ় গলায় বলল, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর এই খেলায় আমাকে জড়াচ্ছেন কেন ?

কেন ? আপনার সাহস হচ্ছে না ? আপনি আপনার বন্ধুর মতো সাহসী হবেন না ?

তারপর যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে তখন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ।

উদাস গলায় বলল মধুছন্দা, এ খেলা কখনো শেষ হবে না । আপনি রাজি থাকলে আমরা লোকেশন দেখতে যেতে পারি ।

গল্প ঠিক হল না, এখনই লোকেশনের কথা ভাবছেন ?

অবনীদেব গল্প কোনদিন ছবি হবে না কিন্তু ও তো লোকেশন দেখতে যাচ্ছে হিরোইনকে সঙ্গে নিয়ে ! আপনি রাঁড়ান, আমি চেকটা নিয়ে আসি । আজ থেকে আমরা বন্ধ । চট করে সুখেনের হাতটা ছুঁয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল মধুছন্দা ।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো সুখেন কিছুক্ষণ । হাতের রেখা অনুযায়ী টাকার অভাবে ওর কখনও কিছু ঠেকে থাকবে না । এই ক্ল্যাটে আজ দুপুরে আসবার আগের মদহর্তেও যে অনিশ্চয়তা ছিল এই মদহর্তে সেটা নেই । কিন্তু সমস্ত শরীরে সে এমন অস্বস্তি অনুভব করছে কেন ? ডল পদতুল সাজিয়ে অবনী যে খেলায় মেতেছে অনুপ্রাণিত হয়ে ঠিক সেই খেলা ও খেলতে পারে মধুছন্দার সঙ্গে । মধুছন্দার শরীর কোন অংশেই কম লোভনীয় নয় । কিন্তু মন থেকে একটুও সাড়া পাচ্ছে না কেন সে ?

হঠাৎ ওর খেয়াল হল মধুছন্দা এখনও ফিরছে না । চেকবই খুঁজতে কি ওর দেরী হচ্ছে । সুখেন ঠিক করল মধুছন্দাকে পরিগ্রহটা থেকে রেহাই দেবে । বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল সে । পাশাপাশি দুটো শোওয়ার ঘর । তার মানে অবনীরা আলাদা শূয়ে থাকে । ঘরের ভেতর উঁকি দিল সুখেন । সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছে মধুছন্দার । বিছানায় উপড় হয়ে শূয়ে বালিশে মদ গুঁজে সে কাঁদছে । চেক নিতে আসেনি মধুছন্দা ।

কিছুক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে রইল সুখেন । মানুষ ইচ্ছে করলেই সব রকম ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে না । কোন কোন মানুষ, অবনীর মতো, পারে । কিন্তু অনেককেই সংস্কার আর মধ্যবিন্দু সারল্য বোঁড়ি পরিয়ে দেয় । অবনী যা পারছে চেষ্টা করলেও সে তা পারবে না, মধুছন্দারও অনুপ্রাণিত হবার প্রয়োজন নেই ।

অনেক দিন পর কাউকে কাঁদতে দেখে ভীষণ ভালো লাগল ওর । সুখেন বলল, আমি যাচ্ছি দরজাটা, বন্ধ করে দিন ।

হাতের রেখা বেরোছিল সুখেন নাকি কখনই বিবাহের মালিক হতে পারবে না । কিন্তু মানে কি শূন্য অর্থ ? সুখেন হাসল, এখন তার মতো বিবাহের আর কে আছে ? যে বিবাহ রাখতে পৃথিবী জোড়া বৃক্ক দরকার হয় । বন্ধ দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে এলো সুখেন ।

অক্টোপাস

এই মেঘ অসময়ের। তবু দু'দুটো দিন এঁটুলির মত লেগে আছে আকাশের গায়ে। অভিরাম ভেবেছিল ঝড়ো বাতাস নুনের ছিটে দেবে। কিন্তু দুটো দিনরাত কাটল, কেটেই গেল।

যে কোন মূহুর্তেই মেঘগুলো জল হয়ে নামতে পারে। ব্যাস, তাহলে আর রক্ষে নাই। সব গেল। এ যেন সব পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া বৃড়ি মেয়েছেলেদের শরীরে নতুন আঁচড় পড়ার মত ব্যাপার। ঝরেও ঝরে না জল, শুধু খটাং খটাং শব্দ বাজে মেঘের হাড়ে হাড়ে। ঘোঁবনের কাঠঠোকরা বড় মারাত্মক। ঠুকে ঠুকে ঠোঁট ভোঁতা তবু অভ্যেস মরে না।

তাবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল অভিরাম। চারপাশের জঙ্গলটাও থম মেয়ে আছে। মেঘ দেখলেই, গাছের পাতা অসাড় হলেই পাখিগুলোর গলা পালটিয়ে যায়। জঙ্গলের শরীরে কালো রঙ লাগে, সেই রঙ বোধহয় পাখিদের শ্বাসে মাখামাখি হয়। তিনয়ুগ হয়ে গেল এই ভারতবর্ষের জঙ্গলে জঙ্গলে কেটে গেল অভিরামের। চরিত্র বোঝা এখনও হয়ে উঠল না। লোকে বলে মেয়েমানুষের মন নাকি দেবতারাও জানে না, হয়তো, কিন্তু একটা সোমখ জঙ্গলের মন চরিত্র বোঝ দেখি কেমন হিম্মত ?

পুরুষের টাকের মত কিছুটা খোলা জমি, তার একদিকে অভিরামের তাবু। ওপাশে চালার নিচে আগুন জ্বলে, রান্না হয়। ছয়জন মানুষ খায় দায় শোয়। রাতে নেশা করে, দিনে পরিশ্রম। গুরুণীতি ঠিক হল না। ছয়জনের মধ্যে দুজন এখন ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর জীবন তাদের। ঠিক মধ্যখানে একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে শেকলে বাঁধা হীরামন আর হীরামতি। এখন ওদের সর্বাস্ত্র কাদা মাখা। শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে, চাপড়া বেঁধে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। ওদের বয়স হয়েছে, বেশ বয়স। অভিরামের কাছেই রয়ে গেছে অনেক বছর। এখন ওদের নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা। হাতি দুটোও অভিরামের মনের কথা টের পেয়ে যায় বেশ।

অভিরাম ও দুটোর পাশে এসে দাঁড়াতেই শূঁড়জোড়া তাকে ছুঁয়ে গেল। পায়ে শেকল বাঁধা কিন্তু ঘুরতে ফিরতে অসুবিধে নেই। জোড়া হাতি অভিরামের শরীরে আদর ছড়িয়ে দিলে শব্দ করল। যেন নিঃশ্বাসে জানাল, বয়েস হয়ে গিয়েছে গো, তোমার এবং আমাদেরও। এই পুরুষ এবং স্ত্রী হাতি দুটো অনেককাল একসঙ্গে রয়েছে। অথচ এদের সন্তান আসেনি। ওরা আজকাল শুধু জাবর কাটতেই ভালবাসে। কাজ না থাকলে হাঁটু মূড়ে ঝিমোয়। কাছাকাছি থাকা ছাড়া পরস্পর সম্পর্কে কোন আকর্ষণ নেই। দুটো পাথরের মত চলতে পাথর।

পাকা দাড়িতে হাত বোলায় অভিরাম। কোন মেয়েছেলের শরীরে এই জীবনে ঝাওয়া হয়নি। আজকাল ঝাওয়ার ইচ্ছেটাই হয় না। শরীরের ভেতরে যে শরীর আছে তার মূখ ঠিক ব্রহ্মার মত। একটা মুখে লোভ চটচট করে, শ্বিতীয়টায় লকলকে

খিদে। যা কিছু খাওয়া যায় তাই গেলো, পেটে না যাওয়া পর্যন্ত স্থিত নেই। পেটে গেলেও তা যেতে না যেতেই খিদে। তৃতীয় মদখে অহংকারের লাল লোহা টঙ হয়ে থাকে। একটু জলের ছিটে লাগলেই ছ্যাক শব্দ। আর এখন চতুর্থ মদখের জিভ শুকিয়েছে, দাঁত নড়বড়ে। তার খাঁজে খাঁজে যে সন্ডুঙ্গ তাতে ভয়ের বাসা। যদি সামান্য চাপেই ঝরে যায়। ন্যাংটো মাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসা মানে নিজের অক্ষমতা পাঁচজনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। কি লাভ তাতে? ফলে অভিভ্রামের চতুর্থ মদখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, ঠোট দুটো টসটেসে হাসিতে ভিজিয়ে রাখাই সার। দ্দ হাতে দ্দটো শড় জড়িয়ে ধরল অভিভ্রাম, ‘আর দ্দটো বছর। দ্দটো বছর তোরা আমার সঙ্গে থাক। অন্তত গোটা চারেক বাচ্চা বিক্রী করতে দে। তারপর তোদের ছুটি, আমারও। ঘোবনটা গেল, কখন এল টেরই পেলাম না।’

এই একটা ভাবনায় স্থির হয়ে রয়েছে অভিভ্রাম। আর দ্দটো বছর। তারপর ছুটি। এই জঙ্গলের শরীর থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে কোথাও। কোথায়—সেইটে ঠিক নেই, তবে যাবে। জঙ্গলও তো মেয়েছেলে, বলা যায় গরম মেয়েছেলে, যতক্ষণ তার সঙ্গে তাল ঠুকতে পারবে সে রাখবে। যেই তুমি কমজোরী হলে তো তোমার পায়ের তলার মাটি সরল। তখন সরে যাওয়া ভাল। কিন্তু মদশুকিল হল, এতদিনের ঘোবনবেলা একসঙ্গে কাটিয়ে এই জঙ্গল বৃকের গভীরে ঢুকে কখন যে সব যাওয়ার জায়গাগুলো ঢেকে দিয়েছে অন্ধকারে। বিষ, বিষের নেশার মতন। কিন্তু আর নয়। দ্দ’বছরে আরও কিছু টাকা জমিয়ে পালাবে এখান থেকে। কোন শহর কিংবা গাঁয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বাকি দিনগুলো খরচ করবে।

সরকারি ইজারা নেয়া আছে। প্রতি বছর হাতি ধরে দিতে হবে। বৃড়ো হাবড়া নয়, টাটকা কিশোর। বিনিময়ে টাকা পাওয়া যাবে, অঙ্কটা যদিও মোটেই ভাল নয় কিন্তু তাই বা কে দেয়। হাতি ধরা অভিভ্রামের পেশা। জুয়াসের এই বিশাল জঙ্গল এলাকায় আজকাল হাতি খিকখিক করে। কিন্তু তাদের ধরতে যাও তোমার চোন্দপুরবৃষের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে ওরা। চোরা শিকারিরা আসে ওদের মেয়ে দাঁত চুরি করতে। সরকারি প্রহরীরা গুলি ছুঁড়তে পারে না ওরা বেয়াদাঁপ করলেও। অথচ হাতিগুলো সংখ্যায় বাড়ছে। আগে ওরা বেড়াতে যেত বামায়। জঙ্গলে জঙ্গলে চমৎকার পথ ছিল। কিন্তু সেই পথ এখন বন্ধ। মন্দিরগুলো গাছ কেটে পথ হাওয়া করে দিয়েছে। ফলে এই একই জায়গায় ঘোরা ঘোরা। সারা বছর এই জঙ্গলে তাই খাবার জোটে না এত হাতির, দলবেঁধে ঝেঁয়িয়ে হামলা করে তাই আশেপাশের গাঁয়ে, চা-বাগানে। লুটপাট করে, মন্দিরও মারে। যত দিন যাচ্ছে তত মানুষের ওপর অত্যাচার করতে ভালবাসছে ওরা। মানুষের সবরকম প্রতিরোধের ছলাকলা ওরা জেনে ফেলেছে আজকাল। ইলেকট্রিক তারকে পর্যন্ত ভয় পায় না, গাছের ডাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তার ছিঁড়ে ফেলে করে নয়।

এই হাতিদের ধরতে কম পরিশ্রম আর বৃদ্ধির দরকার। তাও এলোপাথাড়ি ধরলেই চলবে না, কাউকে আহত করাও চলবে না। দল থেকে টাটকা কিশোর

খুঁজে ধরে নিয়ে আসতে হবে। এ যেন সাপের মূখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বিষের খিল সরিয়ে নেওয়ার মত ব্যাপার, টাকাটা ওরা মূখ দেশে দিচ্ছে না। আর এই কাজটাই করতে হয় অভিরামকে। একটাও গুলি না ছুঁড়ে, এক ফোঁটা রক্তপাত না করে হাতের বাচ্চাকে দল থেকে বের করে নিয়ে এসে সরকারের হাতে তুলে দিতে হয় আর এই কাজের সহায়ক চালার নিচে বসে থাকা ক'জন মানুষ আর দীর্ঘকালের পোষা হাতি দুটো।

অভিরাম চালাটার দিকে তাকাল। লোকগুলো রান্নাবান্নার আলোজন করছে। পরনে ঢলঢলে হাফ প্যান্ট, খালি গা। ওরা আসে ভুটানের একটা পাহাড়ি গ্রাম থেকে। ওই গ্রামের মানুষগুলোর জন্মই যেন হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে। কলজে থেকে যেটা জন্মমাত্র বরিয়ে ফেলে তার নাম ভয়। এত সাহসী এবং বিনয়ী মানুষ কোথাও দ্যাখেনি অভিরাম দু'পুরুষ ধরে ওদের চেনে সে। শাসন করলে শাসিত হয়। হুকুম ওদের কাছে শেষ কথা। বছরের শুরুরতে দাদন পাঠাতে হয়। ওরা আসে। হাতি ধরে দিয়ে ফিরে যায়। না ধরতে পারলে পরের বছর ফিরে আসে অভিরামের ঋণ শোধ করতে।

মাঝে মাঝে নিজেকে শোষক বলে মনে হয়। সামান্য কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সে লোকগুলোকে কিনে রেখেছে। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা সে জানে। খাবার ওদের কাছে স্বর্গের চেয়ে বেশী লোভনীয়। সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে। মাঝে মাঝে অভিরামের মনে হয় এটাই নিয়ম। কেউ কাউকে নিয়ে খেলছে। যে খেলাচ্ছে তাকে নিয়েও আর একজন খেলে যাচ্ছে। এই জঙ্গলের নিয়মের রকমফের সমস্ত জগতে ছড়ানো। আর এইসব ভাবলেই বিবেকের বৃদ্ধবৃদ্ধগুলো বেশ ফেটে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে অভিরাম হাঁকল, 'মাইনু'।

'হোই।' সাড়া এল চালার নিচ থেকে। অভিরামকে অপেক্ষা করতে হল না। ঢলঢলে হাফপ্যান্টের তলায় লিকলিকে পান্নের জোড়া যেন উড়ে এলো। বেঁটে প্রোঢ় লোকটা ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'জী?'

'হাতিগুলোকে দেখতে পেয়েছিস?'

'হুঁ। কিন্তু ওরা মেঘ দেখে আর নড়ছেই না। আরও কাছে না এলে?'।

'কতক্ষণের পথ?'

'পূরো দিন।'

হিসেবটা ভাল লাগল না অভিরামের। যেতেই যদি দুই সপ্তাহ হয় তাহলে—। আকাশের দিকে তাকাল সে। বৃড়ো মেঘদেরও কি একই অবস্থা হয়? অভিরাম এবার ফিরল। অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। অন্তত দশ মাইলের মধ্যে দলটা যদি না আসে তাহলে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। সে হাতি দুটোর কাছে এসে ডাকল, 'এয়াই, তোরা নেমে আস।'

সঙ্গে সঙ্গে সরসর শব্দ হল। দুটো হাতির শরীর বেয়ে দুটো বেঁটে মানুষ টুকু

করে মাটিতে পড়ল। কাদার ওদের মূখ চোখ দেহ প্রায় ঢাকা। সেই কাদা শূন্যকরে এঁটে বসেছে শরীরে। গত পাঁচ দিন ধরে ওরা এই অবস্থায় রয়েছে। দিনরাত ওদের হাতি দড়টোর সঙ্গে থাকতে হয়। সমস্ত শরীর উদ্যোম, শূন্য কোমরে একটা কাদা মাথা কোঁপিন। শিকারে যাওয়ার সময় সেটাকে খুলে যেতে হবে। এই কদিন ওদের মাছ ডিম পৈয়াজ রসুন খাওয়া নিষেধ। এই কদিন মদ, বিড়ি, খইনি খাওয়া কিংবা স্ত্রীসঙ্গ করা বেআইনী। অত্যন্ত পবিত্র হয়ে হাতির শরীরের গন্ধ নিজেদের শরীরে মাখতে হবে ওদের। দিন রাত হাতির সঙ্গে থেকে থেকে মানুষের চামড়ায় হাতির গন্ধ লেগে যাবে। এ বছর হাতি ধরার অপারেশন এই প্রথম। প্রথম দলটা যাতে কোনভাবে অকৃতকার্য না হয় অভিরাণ সে বিষয়ে সজাগ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'থেরেইছিস ?'

দড়টো লোকই মাথা নাড়ল, 'না।'

'যা থেরে আয়।' তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হয় বৃষ্টি নামবে না। যদি নামে চট করে হাতির পিঠে উঠে বসবি।'

একটার বয়স বছর পঁচিশ, অন্যটা তিরিশ ছাড়িয়েছে। হুকুম পাওয়া মাত্র ওরা চালাঘরের দিকে ছুটল। পঁচিশের পায়ে যেন বেশী জোর। খাওয়া বলতে আলুসেঁখ নুন আর ফেনা ভাত। যদিও হাতি না ধরা পড়ে অন্যরাও চেষ্টা করে এই খেতে।

ওপাশের জঙ্গলে হাসির রোল উঠল। তারপরেই ওদের তিনজনকে দেখা গেল জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। মাথায় ঝাঁকা, তাতে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী! দড়ি কিশোরী আর একটি যুবতী। অভিরাণকে দেখে এগিয়ে এসে ঝাঁকা নামিয়ে বলল, 'হিসেব মিলিয়ে নে।'

অভিরাণ হেসে তার পাকা দাড়িতে হাত বোলাল। এই জঙ্গলে বাস করতে গেলে যেসব জিনিস একান্ত প্রয়োজন তাই রয়েছে ঝাঁকায়। জঙ্গলের গায়ে যে ছোট লেপচা গ্রাম সেখান থেকেই আসে এই সওদাগরুলো। ওই যুবতীর বাবার একটি শীর্ণা মৃদঙ্গের দোকান আছে ওখানে। সে বলল, 'চুরি করলে তুই করবি, তোর বাবা তো চোর নয়। যা ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়।' যুবতী ঠোঁট ওলটালো, তারপর সঙ্গীদের ঝাঁকা তুলতে ইশারা করা মাত্রই অভিরাণ বাধা দিল, 'না। তুই না ওরা যুক।'

'আমি না কেন?'

'তোকে দেখলে যদি ওদের বুকু ঢেউ লাগে!' অভিরাণ হাসল।

'ঢেউ তো ওঠে নদীতে। ওরা তো ডোবাও না।'

'কি জানি। তোদের বিশ্বাস নেই। ডোবাকেও সমুদ্র করে দিতে পারিস। তুই আমার সঙ্গে আয়, দাম্ব নিয়ে যা। ওরা চালাতে শক্তি দিয়ে আসুক।' অভিরাণ তাঁবুর দিকে হাটতে শুরু করল। তার কথা শুনে যুবতীর মূখে কালো ছায়া নেমেছে সেটা তার নজর এড়ানি। না, ওর এখানে আসা বন্ধ করতে হবে। ওর বাপকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। মূর্খকিল হল ওই গ্রামে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশী তারপরেই অভিরাণ হেসে ফেলল। সে বোকাম মত এসব ভাবছে।

তার কর্মচারীরা আধবেলা খেলে থাকে গ্রামে, কেউ কেউ জীবনেও শহর দ্যাখেনি, কোঁপন কিংবা হাফপ্যাণ্ট ছাড়া পোশাক নেই অঙ্গে, ওদের প্রেমে পড়বে এই যুবতী ? অসম্ভব । যতই গরীর হোক ঠাঁট-বাট আর অহংকারটি এর ষোলআনা খাঁটি ।

তীব্রতে ঢুকে ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে করতে যুবতী পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল । অভিরাম জিজ্ঞাসা করল, ‘কত টাকা বলেছে তোর বাপ ?’

‘কুড়ি ।’

অভিরাম চোখ তুলে তাকাতেই বন্ধুর ভেতর ডেউটাকে টের পেল । মেয়েটা তীব্রতে ঢুকেই খাটিয়ায় বসেছে । ওর বন্ধুর খাঁজ দেখতে পাচ্ছে অভিরাম । টাইট জামার ওপর যে কালো ওড়না সেটা সময় বন্ধে সামান্য সরে গেছে । অনেক অনেকদিন পরে যুবতীর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অভিরামের শরীর বেইমানী করল । যেন পূর্ণ চাঁদের আকর্ষণে তার শরীরের শিরায় শিরায় জোয়ারের টান লেগে গেল আচমকা ।

‘টাকা দে ।’

অভিরামের অনেক কিছুর বলতে ইচ্ছে করছিল । তার বয়স হয়েছে ঠিক কিন্তু সত্যিকারের বড়ো তো হয়ে যায়নি । যা টাকা জমেছে আর দু’বছরে যা জমবে তাই নিয়ে এইরকম একটা যুবতীর সঙ্গে বাকি জীবনটা যদি কাটিয়ে দেওয়া যেত—। কিন্তু সে কিছুরই বলল না, চুপচাপ টাকাটা দিয়ে দিল ।

যুবতী জামার মধ্যে সেটাকে চালান করে দিয়ে বলল, হাতি ধরাবি কবে ?’

‘যদি বৃষ্টি না নামে তাহলে কাল—।’

‘হাস ভগবান, যেন বৃষ্টি নামে । খুব খুব । তারপর শরীর দু’লিয়ে বেরিয়ে গেল তীব্র থেকে ।

অভিরামের স্থির হতে সময় লাগল । কিন্তু তার মনে একটা তিরতির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল । তার শরীর বিকল হয়নি । আঃ ।

‘জী’ ।

বাইরে থেকে গলা ভেসে আসতেই অভিরাম বাইরে এল । বড়ো সদার মাইনু একটু উত্তেজিত গলায় জানালো ‘হাতীগুলো আরও সরে এসেছে । এখন মাত্র আধ বেলার পথ ।’

অভিরামের ঠোঁটে হাসি ফুটল । মুখে বলল, ‘সাবাস ।’

মাকখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে । তিনজন পাহারা দিচ্ছে তিনদিকে । অবশ্য সেটার যে খুব দরকার পড়ে তা নয় । বন্যজন্তুর পা একদিকে পড়লেই হাতি দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে । তবু, ব্যাটারের বয়স হয়েছে বলেই অভিরামের ঠিক ভরসা হয় না । অভিরামের সামনে দু’জন দাঁড়িয়ে । অভিরাম কথা বলছিল, ‘আমি আর নতুন কি বোঝাবো তোদের । মাইনুর কাছে তো সব জেনেছি । শূদ্ধ লক্ষ্য রাখবি হাতিটা যেন ছটফটে আর তাগুটাই হয় । তুই তো এর আগেও গিয়েছিস, তোকে নিয়ে চিন্তা নেই । কিন্তু তুই ভয় পাচ্ছিস না তো ?

পাঁচশ বছরের মাথাটা দ্রুত আপত্তি জানাল, না ।

‘একটুও ভয় পাবি না। তুই হীরামতির ওপর ছেড়ে দিবি। সে তোকে ঠিক দলের মধ্যে নিয়ে যাবে। যা, এখন শূন্যে পড়। আজকের রাতে তোদের ঘুম দরকার। ঠিক চারটের সময় রওনা হতে হবে। মাইনু!’ অভিরাম পেছন ফিরল।

‘জী?’

‘খাদ ঠিকমত ঢেকে রেখেছিস?’

‘জী।’

অভিরাম তাঁবুতে ফিরে এল। আর তখনই টপটপিয়ে বৃষ্টি নামল। অভিরামের কপালে ভাঁজ পড়লো। বৃষ্টির ধাক্কায় হাতীগগুলো আবার দূরে সরে না যায়। অভিরাম খাটিয়ায় শরীর এলিয়ে দিতেই মনে পড়ল যুবতী এখানে বসেছিল। তার মন চনমনিয়ে উঠলেও শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ব্যাপারটা যত সে ভাবছিল তত বুদ্ধের ওপর একটা পাথর চেপে রসেছিল। নিজেকে অক্ষম ভাবতে তার একটুও ভাল লাগছিল না। খাটিয়ায় উঠে বসল অভিরাম। এখনই একটা ছাতি নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়। সোজা গিয়ে যুবতীর বাবাকে প্রস্তাব দেবে, আমি তোমার মর্দার দোকানটাকে ভাল মতন সাজিয়ে দিচ্ছি তুমি তোমার মেয়েটাকে আমায় দাও। আমি দেখতে বড়ো কিন্তু আমি সত্যিকারের বড়ো নই। আর ষেটুকু বড়োটে দেখায় তোমার মেয়েকে পেলে সেটাও চলে যাবে।

অভিরাম হাসল। ঠিক কথা। ও মেয়ে সঙ্গে থাকলে যৌবন ফেরত আসতে বাধ্য। আজ যখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকেছিল তখনই নাকে বাস এসেছিল। না কোনও দোকানী গন্ধ নয়, স্নেফ যৌবনের বাস। সব মেয়ের শরীরে ওই বাস থাকে না। যার থাকে তার গায়ে গা ছোঁয়ালে যৌবন ফেরত আসতে বাধ্য।

বৃষ্টিটা বাড়ছে কমছে। কাল বিকেলে হাতির বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই গ্রামে যেতে হবে। তার সম্পত্তি তার বীরত্ব তার—। একটু থমকে গেল অভিরাম। যুবতীকে বোঝাতে হবে যে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে তার চেয়ে যে তাকে পেছন থেকে হুকুম করে সে অনেক বড় বীর। আর তখনই এক ফাঁকে প্রস্তাবটা দিয়ে দেবে সে। আজ রাতে গেলে তো খালি হাতে যেতে হবে। অভিরাম শূন্যে পড়ল আবার, আজকাল শরীর এলিয়ে শূন্যে বেশ আরাম আগে।

এখনও আকাশে মেঘ। তবে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে। পায়ের তলায় ঝাঁপ ভিজে চপচপে। গাছের ডাল থেকে জল ঝরছে টপটপিয়ে। নিভে যাওয়া রাতের আগুনটাকে নতুন করে জ্বলন্তে দেওয়া হয়েছে। দুটো হাতি এখন হাঁটু মূড়ে বসে আছে মাঝখানে। ওদের পা থেকে লোহার শেকল খুলে দেওয়া হয়েছে। অভিরাম ইশারা করতে লোক দুটো হাতির পিঠে চড়ে বসল। তারপর দু’হাতে কোঁপিন খুলে ছুঁড়ে দিল সঙ্গীদের সামনে। মাইনু এগিয়ে গেল ওদের মাঝখানে। ওর হাতে গোল করে পাকানো শক্ত দাঁড়ি যার একপ্রান্তে বড় ফাঁস। দুজনই দুটো হাতির ঠিক মাথার নিচে এমনভাবে বসল যাতে দুটো পা টানটান করে ছড়াতে হাতির কানের নিচে ঢাকা পড়ে যায়। হাত বাড়িয়ে মাইনুর হাত থেকে দাঁড়ি নিল

দুজন। দুটো বারো হাত লম্বা দাড়ি কায়দা করে গোটানো। ওরা দাড়িজোড়া যে বার পেটের তলায় এমন গদ্বিছয়ে রাখল যাতে তার কোন অংশ বাইরে থেকে না দেখা যায়। তারপর বসা অবস্থায় শরীরটাকে মিশিয়ে দিল উপড় হয়ে হাতের মাথায়। শব্দ চিবুকটা মাথার খাঁজে ঢুকিয়ে ওরা দেখার সুবিধে করে নিল। হীরামন আর হীরামতি নির্বিকার। এই মানুষ দুটো তাদের শরীরে এই কদিন ধরে শোওয়া-বসা করায় এদের ওজন নিয়ে আর ওরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। অভিরাম লোক দুটোকে শিখিয়ে দিয়েছে কি ভাবে একটা কথা না বলেও ওই হীরামন হীরামতিকে সব কথা বোঝানো যায়। ওই যে দুটো পা দুই কানের নিচে ঢোকানো সেখানেই আছে হাতিকে নির্দেশ দেবার কায়দা। বাঁ দিকে যেতে চাও বাঁ পা দিয়ে টোকা দাও, ডান দিকে তোঁ ডান কানে। দু-পা একসঙ্গে সোজা সামনে। আর দুপা একসঙ্গে কানের পেছনে ঘসলে হাতি বদ্ববে আর এগোতে হবে না, সামনে বিপদ।

হাতির উদ্যম পিঠে যে নগ্ন মানুষ দুটো বসে আছে তাদের সামনে আঁকড়ে ধরার কিছু নেই। দুটো হাত হাতির মাথার খাঁজে এমনভাবে রাখতে হবে যে সেটাই তোমার ব্যালেন্সের কাজ করবে। তবে দীর্ঘকালের অভ্যেসে হাতির পিঠে ওইভাবে বসে থাকার জন্যে কিছু ধরার দরকার ওদের হয় না।

মাইনু চিৎকার করে ওদের ভাষায় কিছু বলল। লোক দুটো সেই সঙ্গে মাথা নাড়ল। অভিরাম জানে এটা মন্ত্রপাঠ, যাতে ওদের কার্যসিদ্ধি হয়। ওরা যাবে জঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর মাঝখানে। খুব বোকামি না করলে অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা নেই। তবু বুনো হাতির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে বুদ্ধির জোর লাগে। একটু বেচাল হল তো সব শেষ।

অভিরাম সংকেত করামাত্র হাতি দুটো উঠে দাঁড়াল। বড়ো শরীরে সেই চনমনানি নেই। শরীর সোজা করে উঠতেও কষ্ট হয়। ওরা দাঁড়ালে অভিরাম ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করল। না লোক দুটোকে দেখা যাচ্ছে না। হাতির শরীরে মিশে গিয়েছে ওরা। অভিরাম দেখল হীরামন আর হীরামতি তার দিকে অন্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বনবাসে পাঠাচ্ছে ওদের এইরকম চাহনি। আজ ওদের কোথায় যেতে হবে সে সম্পর্কে ওরা সচেতন। এই যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করছে না ওরা। একদল যোবনের মাঝখানে মতলবে যেতে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একটুও ইচ্ছে করছে না। অভিরাম বুদ্ধল। তারপর এগিয়ে গেল ওদের সামনে। দুটো শব্দ উঠে এল ওর কাঁধে। অবসন্নভাবে হেলান দিল তার কাঁধে। যেন বলছে, আর কত বুদ্ধি নেব তোমার জন্যে!

চাপা গলায় নির্দেশ দিতেই দুটো হাতি যাত্রা শুরু করল। ডানদিকের জঙ্গলের পথে ঢুকে গেল ওরা। না, শিকারী দুজনের কিছুতেই দেখতে পাবে না বুনো হাতির দল। হাতির শরীরের সঙ্গে চমৎকার মিশে আছে। নিশ্চিন্ত হল অভিরাম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবু অভিরাম বাকী দল নিয়ে চলল বাঁ দিকের পথটা

ধরে। পায়ের তলায় প্যাচপেচে জল, ওপরের জঙ্গলের গা থেকেও জল ঝরছে। এখন সারা শরীরে জৌক ঝুলবে কিন্তু কিছই করার নেই। মেঘ না থাকলে পথটা দেখা যেত, এখন আন্দাজে যাওয়া। যেতে হবে যেখানে লাইনদুরা দক্ষ হাতে গর্ত করে ঢেকে রেখেছে। জায়গাটা এমন নির্বাচন করা হয়েছে যাতে তার চারপাশে গাছ থাকে। সেই গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না শিকার আসে।

হীরামন-হীরামতি তো ভয় পাবেই। বুনো হাতির দল যদি বদ্বতে পারে ওরা পোষা তাহলে ছিঁড়ে ফেলবে। দুই বড়ো-বড়ির তো নড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ওরা অভিনয় করতে জানে। এখন বোধহয় আর নিজেদের ওপর ঠিক ভরসা রাখতে পারছে না।

মানসচোখে দেখতে পাচ্ছে অভিরাম। হীরামন আর হীরামতি নিঃশব্দে দলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দলটার কাছাকাছি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওরা থামবে না। জঙ্গলের যেখানে বুনো হাতির দলটা রয়েছে তার কাছে গিয়ে ওরা লক্ষ্য করবে তারা কি করছে। সাধারণত সকালের দিকে হাতিরা একটু অলস থাকে। গাছপালা ভাঙ্গে, পাতা খায়। ছোট্টরা খুনসুঁটি করে। সদ্য কিশোর যারা তারা ছোট্টটিয়ে এপাশ ওপাশ যায় আবার দলে ফিরে আসে। দলের যিনি নেত্রী তিনি পাতা খেতে খেতে উদাস চোখে তাকিয়ে দ্যাখেন সবাই ঠিক আছে কিনা। তার কাছাকাছি থাকে সেই দাঁতাল পুরুষটি। হস্তিনীর সেবক এবং স্বামী। উঠতি ছোকরাদের সম্পর্কে তার বেশ বিরক্তি। এরাই সামান্য বড় হলে তার পদটি বিপন্ন হতে পারে। কোনরকমে এদের দল থেকে কাটিয়ে দিতে পারলে সে খুশী হয়। কিন্তু নেত্রীর সামনে সেটা প্রকাশ করতে পারে না সে। তাকে সবসময় সজাগ থাকতে হয়। যে-কোন মূহুর্তে নেত্রীর হুকুমে শত্রুর মোকাবিলা করতে হতে পারে। এমন কি চিবোবার সময়েও সে চোখ বন্ধ করার সুযোগ পায় না।

হীরামন আর হীরামতি যখন বোঝে দলটা অলস হয়ে আছে তখন তারা আলাদা হয়ে এগোয়। যেতে যেতে ডাল ভাঙ্গে, পাতা চিবোয়, যেন কোন মতলব নেই এমন ভঙ্গীতে পা ফেলে। দলের হাতিরা তাদের দিকে তাকালে এমন অভিনয় করে যে ওরা বাইরের কেউ নয়। কিন্তু ওদের লক্ষ্য থাকে নেত্রীর দিকে। খুব সাবধানে তাকে এড়িয়ে ওরা দলে মেশে। কিছুক্ষণ কাটানোর ওর সুষ্ঠু পায় কানের তলায়, কোনদিকে তাদের যেতে হবে। ওই যে চঞ্চল কিশোরটি দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে সাহসী পায়ে তার দিকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে ওপরের মানদুহ। অথচ চটপট পায়ে গেলে চলবে না। কেউ যাতে সন্দেহ না হয় এইভাবে ওই কিশোর হাতির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই মূহুর্তে ওরা দুজন কিশোরের দুই পাশে। কিশোর মনের আনন্দে ডাল ভাঙ্গেছে ওরা শরীরের পেছন দিকটা দিয়ে একসঙ্গে চাপ দিতেই কিশোর সামনে এগিয়ে যাবে। স্বভাবতই সে বিরক্ত হবে কিন্তু যখন দেখবে ওরাও পাতা ছিঁড়ছে তখন সে আর একটু এগিয়ে পাতায় শূঁড় দেবে এই ভেবে যে দলটা তার সঙ্গে আছে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর

আবার একই কৌশল। দু'পাশে ঘিরে পেছনে চাপ দিলে কিশোর সম্মুখগামী হবেই। এইভাবে অন্তত আধঘণ্টার পথ ওকে বের করে আনবে হীরামন আর হীরামতি। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দলের কেউ যেন সন্দেহ না করে। কিশোর যেন বিদ্রোহ না করে বসে। একটু নিরাপদ সীমায় আসা মাত্র মানুষ দুটো আচমকা খাড়া হয়ে বসে চিৎকার করে উঠবে। অনেক অনেক ট্রেনিং নিতে হয় ওই চিৎকার নিখুঁত করার জন্যে। শব্দটা অবিকল কোন হাতি বিপদে পড়লে করে থাকে। সেটা কানে যাওয়ামাত্র কিশোর ভাববে সেও বিপদে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে শূঁড় তুলে চিৎকার করতে চাইবে। যেই তার শূঁড় ওপরে উঠবে অমনি দুটো দাঁড়ির ফাঁস ভাতে গলিয়ে দেবে মানুষ দুটো। ভয় পেয়ে শূঁড় নামিয়ে নেওয়া মাত্র কিশোরের গলায় ফাঁস এঁটে বসবে। তৎক্ষণাৎ ছুটতে শুরুর করবে হীরামন আর হীরামতি। দৌড়াবার সময় তারা দাঁড়ির দুই প্রান্ত নিজেদের মূখে নিয়ে নেয়। ওপরের মানুষ দুটো কোনক্রমে ঝুলে থাকে তাদের শরীরে। দাঁড়ির টান লাগামাত্র কিশোর ছুটতে থাকে মাঝখানে। তখনও ধারণা যে সে সঙ্গীদের সঙ্গে আছে। এই দৌড় চলবে সেই লুকানো খাদ পর্যন্ত। সেখানে এসে এই খাদের দুই পাশ দিয়ে দৌড়ায়। আর কিশোর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গোপন ফাঁদে। তখনই চটপট নেমে আসে অভিভারাম। গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিটাকে সুন্দর করে ঢেকে দিয়ে পটকা ফাটাতে থাকে অনর্গল। হাতির পাল যদি টের পেয়ে যায় তাহলে ওই পটকা শব্দে থমকে দাঁড়াবে। বন্দী হাতিটিও পটকার শব্দ, আচমকা পতন এবং দাঁড়ির ফাঁসে ভয় পেয়ে নিথর হয়ে থাকবে। তার অস্তিত্ব টের না পেয়ে হাতির দল সরে যাবে আরও দূরে। বিশেষ করে দাঁতাল যদি বৃষ্ণতে পারে কিশোর হাতিটি বিপদে পড়েছে তাহলে সে সরে যাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে এই ভেবে যে তার একটি ভাবী প্রতিনবন্দী কমে গেল। এইবার ফাঁদে পড়ে থাকা কিশোরটিকে কব্জা করা অভিভারামদের কাছে কিছুই নয়। এই অভিযানে মানুষ এবং হাতি দুটোর বৃদ্ধির সমন্বয় থাকা দরকার। হীরামন আর হীরামতির ওপর অভিভারামের ভরসা আছে। বৃন্দাদের দলে মিশে যাওয়ার সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার ওপর ওই পঁচিশ বছরের ছেলটি আজ প্রথম যাচ্ছে। অভিভারাম মাইনকে জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন ছোকরাটা পারবে তো।'

মাইন লাল দাঁতে হাসল, 'ওর বাপ কত বড় শিকারি ছিল আর ও পারবে না?' অভিভারাম মাথা নাড়ল। 'ছিল কথাটায় তার মোটেই আস্থা নেই।' তারও তো যৌবন ছিল। সে সময়টা জঙ্গলে জঙ্গলে গাছের নেশায় কেটে গেল। আজ যুবতীকে দেখার পর থেকেই সেই যৌবনটা ল্যাজ নাড়ছে শরীরে কিন্তু তাই বলে কি সে যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? বাপ শিকারি ছিল বলেই ছেলে পারবে এমন নাও হতে পারে। দুটো লোকের কাঁধে চেপে অভিভারাম গাছের ডালে উঠল। দুটো ডাল গুলতির বাঁটের মত ছড়ানো। সেখানে বসে হাঁপ ছাড়ল সে। এখন এখানে অনন্তকাল বসে থাকতে হবে। স্থগিত শান্ত হতেই চোখের সামনে যুবতীর শরীরটা ভেসে উঠল। হাতিটা ধরা পড়া মাত্রই প্রস্তাবটা পেশ করবে সে। শরীরে

বড় নেশা ধরেছে, এই নেশা নিয়ে মরেও স্বেচ্ছা নেই।

হীরামন আর হীরামতি আগু পিছু হাঁটছিল। মাঝে মাঝে শব্দ তুলে বাতাস ঝাচাই করে পথ পাশটাচ্ছে। এই মেঘবৃষ্টিতে ওদের হাঁটতে মোটেই ভাল লাগছিল না। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে হীরামন, হীরামতির শব্দ জড়িয়ে ধরেছিল। একবার জঙ্গলে ঢুকে গেলে কথা বলা নিষেধ। তবু পঁচিশ বছর চাপা গলায় বলল, 'এদুটো ঠিক ভয় পেয়েছে মনে হয়।'

বয়স্ক পদ্রুবাটি জবাব দিল না। শব্দ জিভে যে শব্দ করল তার অর্থ, কথা বলবি না। দুটো পা কানের তলায় ঢালিয়ে শরীর বেষ্টিকয়ে পঁচিশ বছর হাতের মাথায় চিবুক রেখে জিভ কাটলো কথা বলা নিষেধ সে ভুলে গিয়েছিল। অনেক কিছু সে ভুলেছিল কাল রাতে এটা তো তার কাছে কিছুই না। কিন্তু হাত দুটো ভয় পেয়েছে সেটা ওদের শরীরের কাঁপুনিতে মালুম হচ্ছে।

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর জঙ্গলটা যখন আরও ঘন তখন হীরামন আর হীরামতি থমকে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করল। মানুষ দুটো কান পাতল। দূরে গাছভাঙার শব্দ হচ্ছে। সারাটা পথ মাথার ওপর ভিজে গাছে বসে পাখরা চিংকার করেছে, বানরগুলো ছটফটিয়েছে। হাতের ওপর মানুষ লুকিয়ে আছে সেটা বুঝেই ওদের অস্বস্তি। এখানে জঙ্গল বেশ ঘন। বয়স্ক মানুষটি সন্তর্পণে হীরামনের কানের তলায় পায়ের আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করামাত্র হাতটা সোজা হাঁটতে লাগল। দেখাদেখি পঁচিশ বছর হীরামতিকে নিয়ে এল পাশে। হাতদুটো নির্লিপ্ত হয়ে ডাল ভাঙছে। পাতা খাচ্ছে। মেপে মেপে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা হাতকে দেখতে পেল ওরা। চপ্পল পায়ের এগিয়ে এসে হীরামনদের দেখে থমকে গেল। তারপর আবার সহজ হয়ে একটা ডাল ভেঙে ফিরে গেল ভেতরে।

এখান থেকে হীরামন সরে গেল হীরামতির কাছ থেকে। বয়স্ক পদ্রুবাটি ধীরে ধীরে হীরামনকে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে নিতেই দেখল গোটা বারো বুনো হাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাতা খাচ্ছে, গাছ ভাঙছে। সে-যে দলে ঢুকছে সেটা কেউ খেয়াল পর্যন্ত করল না। আটটা বড় আর চারটে বাচ্চা। সে দলনেত্রীটাকে খুঁজে বের করল। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাতা চিবোচ্ছে। তার ঠিক সামনেই দুটো ডালটা। হীরামন ওদিকে যাবে না। সে ধীরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করল দুটো। লোকটি বুঝতে পারছিল না হীরামনের মতলব। বুনো হাত দেখে অন্য কোন ইচ্ছে হচ্ছে নাকি। তারপরেই সে কিশোরীটিকে দেখতে পেল। বেশ বেশী ভাব। বারংবার দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বয়স্ক লোকটি হীরামনকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া স্থির করল। হীরামন এখন অভিনয় করছে। পাতা খাচ্ছে আর মূখে পদ্রুহ। কিন্তু একা গেলে চলবে না। বয়স্ক লোকটি সম্মুখ মূখ ফিরায়ে হীরামতি খুঁজতে লাগল।

হীরামতি ওপাশ দিয়ে দলে ঢুকছে। শব্দ তুলে একটা গাছের পাতা ধরল। তার

ওপরে পঁচিশ বছর যে শব্দে রয়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এবার হীরামনকে সে কিশোরের দিকে নিয়ে এল। ওর যাওয়া দেখে হীরামনকে নিশ্চয়ই পঁচিশ বছর এদিকে আনবে। তাদের শিকার কোনজন বন্ধু নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

কিন্তু হঠাৎ দলনেত্রীকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল বয়স্ক লোকটি। হাতিটার চেহারা চট করে পাশে গেল। শব্দ ওপরে তুলে যেন বাতাসে একটা ঘ্রাণ খুঁজতে চাইল। তারপর দুপা এগিয়ে আবার বাতাসে টেনে হুঙ্কার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতালটা ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে সে ছুটে এল নেত্রীর পাশে। বয়স্ক লোকটি বন্ধুতেই পারাছিল না এইরকম কেন হচ্ছে! তার বন্ধু কেঁপে উঠল। সে দেখল হীরামন যেন অস্বস্তিতে পড়েছে। একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। দলনেত্রীর লক্ষ্যবস্তুর যে সে, তা টের পেয়েছে হীরামন। এই সময় নেত্রী চেঁচিয়ে উঠতেই হীরামন ঘুরে দৌড়াতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতালটা ছুটল তার পিছে। বাকি দলটাও অনুসরণ করল ওদের।

বয়স্ক লোকটি জানে এখন অন্য কোন আচরণ করা যাবে না। তাকেও দলের সঙ্গে ছুটতে হবে। এবং এই অবস্থায় পঁচিশ বছরকে সাহায্য করার কোন সুযোগই নেই। কিন্তু সে বন্ধুতে পারাছিল না কি করে হীরামন ধরা পড়ল। তার দিকে তো কেউ লক্ষ্যই করছে না। হীরামনের পা দ্রুত চলছিল যেন হীরামনকে বাঁচাতে সে উদ্দাম হয়ে উঠছিল। ওদিকে হীরামন ছুটেছে প্রাণের দায়ে। তার ওপর ওই অবস্থায় বসে থাকতে পারল না পঁচিশ বছর। হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরতে গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতালটা তাকে শব্দে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দলনেত্রীর সামনে। বয়স্ক লোকটি চোখ বন্ধ করার শক্তিও পেল না। হীরামন ততক্ষণে চোখের বাইরে। পুরো দলটা থমকে দাঁড়িয়েছে দেখে হীরামন শান্ত হল।

পঁচিশ বছর কোন আওয়াজ করল না। দলনেত্রীর ভারী পা যখন তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে তখন দলটা আবার সহজ হয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গী করে ওরা আবার জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল। দলনেত্রী এবং দাঁতাল আগে আগে যাচ্ছে। এই জায়গাটা নিরাপদ নয় সেটা বন্ধুতে পারাছিল বোধহয়।

ক্যাম্প এখন শোকের ছায়া। পাঁচটা মানুষ পাথরের মত বসে আছে। শব্দটিতে হীরামন আর হীরামন চেনে বাঁধা। হীরামন ছটফট করছে আর তার শরীরে শব্দ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হীরামন। অভিরাম দাঁড়িতে হাত বোলাছিল। তার সামনে বস্তায় জড়ানো পঁচিশ বছরের শরীরের অবশিষ্ট। বারংবার সে বয়স্ক পুরুষটির কাছে বৃত্তান্ত জেনেছে। কিছুতেই সে বন্ধুতে পারছে না ওরা হীরামনকে কি করে আবিষ্কার করল। হীরামনের শরীরটিকে সে ভাল করে যাচাই করছে। কোন শব্দ নেই। কোন চিহ্ন নেই। শব্দ ধীরে দিতে পারে।

অভিরাম ডাকল, 'মাইনু!'

'জী।' প্রোট বেঁটে শরীরটা সাড়া দিল। দল থেকে উঠে এল না।

‘ও কি মাছ মাংস ডিম রসদুন পেরঁয়াজ খেয়েছিল ?’

‘না । ওসব আমরা সাতদিন খাইনি ।’

‘হাড়িয়া ? নেশা করেছিল ?’

‘না । করলে আমি জানতে পারতাম । জানলে পাঠাতাম না ।’

‘তাহলে কি করে হাতীগলো ওকে ধরল । কারণটা কি ?’

‘আমি জানি না । এখন ওর মাকে কি জবাব দেব গ্রামে ফিরে গিয়ে ।’

অভিরাম জানে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । থানায় জানাতে হবে । কিন্তু কি করে এমন হল সেটা না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই । সে বয়স্ক লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কাল সারারাত ও হাতির পিঠে ছিল ?’

লোকটা ভাবল একটু । তারপর বলল, ‘মাঝরাত্রে নেমেছিল ।’

‘কেন ?’

‘পায়খানায় যাবে বলে ।’

‘কতক্ষণ পরে ফিরেছিল ।’

‘একঘণ্টা হবে ।’

সময়ের মাপটা এদের কখনই ঠিক হয় না অভিরাম জানে । তার সব প্লান আজ নষ্ট হয়ে গেল । এবছর আর এই দলকে হাতি ধরতে পাঠানো যাবে কিনা সন্দেহ । কিন্তু কারণটা জানা দরকার । অথচ সে জানতে পারছে না ।

মৃত্যু-খবর মানুষকে চিরকাল উৎসাহিত করে । থানায় খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিল অভিরাম ? তার কাছেই গ্রামের মানুষ জেনেছে হাতির বাচ্চা ধরা পড়েনি বরং একজনকে মেরে ফেলেছে । বিকেলে ওদের অনেকে জঙ্গলে এল । সান্ধ্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, ‘ছেলেটা বড় ভাল ছিল । গতবারও দেখেছি, বেজাত হলে কি হবে মূখটা ভারি মিষ্টি ছিল ।’

‘তোমাদের গাঁয়ে যেত নাকি ?’

‘গতবার খুব যেত । এবার দুই-একবার ।’

অভিরামের কপালে ভাঁজ পড়ল, ‘কার কাছে যেত ?’

‘ঠিক কারো কাছে না । মূদির দোকানে বসে থাকত ।’

‘মূদির মেয়ের সঙ্গে কথা বলত ?’

‘যৌবনের ধর্মই তো কথা বলার ।’

অভিরামের বৃদ্ধের মধ্যে ছোবল মারল কালকেউটে । টেবিল হাতে সে হাঁটতে লাগল গ্রামের দিকে । গ্রামে ঢোকার মুখেই সাঁকো । তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । হঠাৎ টর্চের আলোর বৃত্তে মূর্তিটাকে নজরে পড়ল । মূর্তিনার গায়ে একটা পাথরের ওপর যদুবতী স্থির হয়ে বসে আছে । একা ।

অভিরামের বৃদ্ধের মধ্যে যেন ঝরনাটা উঠে এসেছে । বৃড়ো কলজে কলকল করছে । সে টর্চ না নিভিয়ে এগিয়ে যেতেই মূখ ফেরাল মেয়েটি, চোখ ঢাকল ।

এবার টর্চ নেভাল অভিরাম, ‘তুই এখানে ?’

জবাব দিল না যুবতী। তারপর উঠে দাঁড়াল।

‘তুই লোকটাকে চিনতিস?’

‘কোন্ লোক?’ যুবতীর গলায় কাঁপন।

‘ষে আজ মরল।’

‘হ্যাঁ।’

‘কাল রাত্রে তোর কাছে এসেছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোথায়?’

‘এখানে।’

‘কি করেছিল তোরা?’

এবার অদ্ভুত একটা শব্দ এল ‘পদ্রুঘেরা যা করে।’

অভিরামের হৃৎপিণ্ড নড়তে লাগল, ‘তুই জানতিস না শিকারে যাওয়ার আগে ওসব করতে নেই। শরীরে ঘোঁষন লেগে থাকলে তা বাতাসে ভাসে?’

‘আমি না বলেছিলাম ও শোনেনি। বলল, যদি না ফিঁরি তাহলে সাধ ঘুচবে না ওর।’

অভিরামের জিভ শুকিয়ে গেল, ‘তুই ওকে মেরে ফেললি।’

‘আমি না, ওর ঘোঁষন।’

হিলহিলে শীত অভিরামের শরীরে খেলা শুরু করল। একটু উত্তাপ নেই। তার অঙ্গে ঘোঁষনের সামান্য দপদপানি বন্ধ হয়ে গেছে আচমকা।

যুবতী দু’পা এগিয়ে এল, ‘কে টের পেয়েছিল? হাতি না হস্তিনী?’

‘হস্তিনী।’ অভিরাম বিড়বিড় করল, ‘মেয়েরাই তো মেয়েদের টের পায়।’

ওদিকে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। খারা জঙ্গলে গিয়েছিল মৃত্যুসংবাদ শুনে তারা ফিরে আসছে। যুবতী ঘুরে দাঁড়াল, ‘বল, সত্যি কি আমি দোষী?’

দোষ? অভিরাম শূন্য চোখে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে উল্টো পথে হাঁটতে লাগল। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তাকে শীতল থেকে শীতলতর করছিল। তবু যুবতীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে সে আর এক ধরনের আরামের সন্ধান পেল।

সেই উৎসাহটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। কিছন্ন ছেড়ে গেলে এত মনোযোগে?

আঠারো ঘরের এই বাড়টার মালিক পাণ্ডেজী। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। কথা বলেন সুন্দর হিন্দীতে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। বছর চা্লিশের মধ্যেই বয়স কিন্তু কথাবার্তায় এমন ভদ্রলোক আজকাল দেখা যায় না। লোকে বলে ওঁর বাবাও নাকি ওইরকম বিনয়ী ছিলেন। মাথা ঠাণ্ডা, একটুতে উত্তেজিত হবার লোক নন বলে কানপুর থেকে কোলকাতায় এসে এরকম তিনখানা বাড়ির মালিক হয়েছেন। খিদিরপুরের এই মহল্লায় ওঁর তিনটে বাড়ির মধ্যে এই বাড়টাই বড়, ঘর অনেক, ভাড়াটে বেশী। তাই ভেতরে ঢোকান মূখেই যে ঘরটি তা কাউকে ভাড়া দেননি পাণ্ডেজী। বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাড়ির যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে ভাড়াটেরা মতলব আঁটবেই। বরং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটাও বাবার কাছ থেকেই শেখা। তাই ওই ঘরে রোজ বিকেলে মজলিশ বসে। বাড়ির ভেতরে যারা যায় আসে তাদের ওপর নজর রাখা যায়। বাইরের উটকো লোক হলে এই ঘরে বসতে হবে প্রথমে।

আঠারো ঘরের এই বাড়ির ভাড়াটেরা সুনির্বাচিত। নিজে উত্তরপ্রদেশের মানুষ বলে উত্তরপ্রদেশীয়রাই সংখ্যায় ভারী। দু-ঘর বিহারী আর বাঙালী আছে। বাঙালীকে রাখা নিজে আপত্তি ছিল পাণ্ডেজীর। কিন্তু বাবা এ-ব্যাপারেও তাকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এই শহরটা যেহেতু বাংলাদেশে তাই আমাদের হাবভাবে বাঙালী ছাপটা রাখা দরকার। একজন বাঙালী ভাড়াটে থাকলে তার সঙ্গে কথা বললে সেই ছাপটা আসবেই। তাছাড়া কোনদিন বাঙালী অবাঙালী ঝামেলা হলে সেই তোমাকে বাঁচাবে। তবে হ্যাঁ, এমন লোককে ভাড়াটে হিসাবে নির্বাচন কর যে মেরুদণ্ড সোজা করতে পারে না, একশটা ঝামেলায় অষ্টপ্রহর জড়িয়ে আছে। পাণ্ডেজীর এই বাঙালী ভাড়াটেরা একটা স্কুলে পিওনের চাকরী করে, পাঁচটি কন্যাসন্তানের জনক, সবসময় মাটির সঙ্গে মিশে আছে। তার সঙ্গে দেখা হলে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা করেন তিনি। লোকটি বিগলিত হয়। দুখীলা হাত তুলে নমস্কার করে তাকে। অন্য ভাড়াটেদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে বাঙালীদের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার না করে। সাধারণত জল-কল পানীয় নিয়েই তো ওদের ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। সে ব্যাপারে পাণ্ডেজীর কাছে সমস্যা হলেই আসতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে।

যেহেতু উত্তরপ্রদেশের এবং বিহারের মানুষজন এখানে শান্তিতে থাকতে চায় তাই পদপ্রথা সবাই সঙ্গত বিবেচনা করে। আঠারো ঘরের কোন দর্শনাথী এলে তার হুট করে ভেতরে যাওয়ার নিয়ম নেই। পাণ্ডেজী তাকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করেন, ভাড়াটেকে খবর দেন। সে এসে যদি প্রয়োজন মনে করে তবে নিজের দায়িত্বে

অতিথিকে ভেতরে নিলে যাবে। কারণ এই বাড়ির মেয়েদের ইচ্ছাত রক্ষা করা একটি পবিত্র কতব্য।

পাণ্ডেজীর আর একটি নিয়ম সবাইকে মানতে হয়। আঠারো ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে সতেরজনের আয় অত্যন্ত সীমিত। বেশীর ভাগই আশেপাশের কলকারখানার শ্রমিক। ক্লাশ থিট্র বেশী বিদ্যে নেই কারো। দেশে চিঠি লিখতে হলে পাণ্ডেজীর সামনে এসে উবু হয়ে বসতে হয়। তা এই ধরনের মানুষ নেশা করে, ঝামেলায় ফেলে সবাইকে। খিদিরপুরে নেশা করার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু পাণ্ডেজীর হুকুম নেশা করে কেউ হুলা করতে পারবে না। যদি তেমন হয় তাহলে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কোন নিয়ম দীর্ঘকাল চালু থাকলে তা সহজে কেউ ভাঙতে চায় না। নেশা করে আসা মানুষ চুপচাপ শুয়ে থাকে ঘরে।

পাণ্ডেজী এই সতেরজন সম্পর্কে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত। এরা ধর্মপ্রাণ এবং তাঁর অত্যন্ত বশব্দ। উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণজাত সবাই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এই বাড়িতে সবাইকে আত্মীয়ের মত থাকতে হবে। সদরে একটি বারোয়ারী পাপোসে পা মূছে সবাইকে ঢুকতে হবে। স্ত্রীলোকরা যখন কলঘর ব্যবহার করবে তখন পুরুষেরা সেদিকটা সম্মানের সঙ্গে পরিহার করবে। কিন্তু আঠারোতম ভাড়াটেটিকে নিয়ে ইদানিং দৃষ্টিচ্যুতায় পড়েছেন পাণ্ডেজী।

লোকটি উত্তরপ্রদেশের নয়। বিহারের সমস্তিপুত্র জেলার মানুষ। মাত্র ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স। দুই কন্যার জনক। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। নাম নাগেশ্বর।

এ বাড়ির এই একটমাত্র লোক প্যান্ট-সার্ট পরে। টোঁরকটের মোজাসহ জুতো পায়ে দেয়। ঘর বড় আয়না ছাড়া দুটো চেয়ার এবং টেবিল আছে। সমস্তিপুত্র কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। ধর্মতলার একটি কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে বাবু চাকরী করে। এ বাড়ির গোত্রছাড়া ভাড়াটে। পাণ্ডেজী এই একটি ব্যাপারে বাবাকে সমর্থন করে না। তিনিই মৃত্যুর আগে এই ভাড়াটেটিকে মাত্র ষাট টাকায় বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য দু'থেকে পাণ্ডেজী আশী টাকায় সেই ভাড়াকে তুলে এনেছেন। কিন্তু মনে শান্তি আসেনি। অন্যান্য ভাড়াটেরা নাগেশ্বরের সম্পর্কে অত্যন্ত ঈর্ষা পোষণ করে এ তিনি জানেন। নাগেশ্বরের স্ত্রী খুবই সাদামাটা মেয়েহলে, কোন পুরুষ আজও তাকে ঘোমটার আড়ালে দেখতে পারিনি। কিন্তু ওই পরিবার অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, এমন কি বাচ্চাগুলোও ঘরেই থাকে সবসময়। প্রথম প্রথম এটাকে অহঙ্কার বলে মনে করত সবাই। একবার কাউকে অহঙ্কারী মনে হলে তাকে সহ্য করা মন্বিল হয়ে পড়ে। এ বাড়ির মেয়েদের ইন্দ্রনে পুরুষেরা নাগেশ্বরকে তাই এড়িয়ে চলত। সে বি. এ. পাশ জানা সত্ত্বেও কেউ তার কাছে চিঠি লিখতে আসত না। কিন্তু ক্রমশ সবাই বদ্বতে পারল নাগেশ্বর লোকটা নিরীহ প্রকৃতির, একমাত্র স্ত্রীকে শাসন করার সময়েই তার পৌরুষ প্রকাশ পায়। এতে বৈরীভাবটা কমে এলেও ঈর্ষা গেল না। নাগেশ্বরের ঘরে খুব নীচু স্বরে রেডিও বাজে, পুজোর আগে রকমারী

জামাকাপড় কিনে তারা দেশে যায়। কখনো সখনো যখন নাগেশ্বরের মা দেশ থেকে আসে তখন জমিজমার গল্প শোনায়। তার ওপরে খুব সম্প্রতি নাগেশ্বর তার এগার বছরের বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়ে এসেছে সমস্তিপুরে গিয়ে। ঈর্ষা তো হাওয়া পাবেই।

পাণ্ডেজী খবর নিয়েছেন। নাগেশ্বর যে অফিসে কাজ করে সেখানে ভাল উপরির ব্যবস্থা আছে। যদিও নাগেশ্বরের চাকরী সামান্যই তবু সেই উপরির খুদকুঁড়ো তার হাতে আসে। পাণ্ডেজী এ ধরনের ভাড়াটেকে পছন্দ করতে পারছিলেন না। কোন ভাড়াটেকেই তিনি বাড়ি ভাড়ার রসিদ দেন না, কেউ চায়ও না। সম্প্রতি নাগেশ্বরের অফিসে প্রয়োজন হওয়ায় সে পাণ্ডেজীকে বিনীত ভঙ্গীতে বলল, ‘একটা রসিদ যদি দেন তাহলে আমার উপকার হয়।’ পাণ্ডেজী অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মদুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন ‘অবশ্যই দেব ক’মাসের চাই বলুন?’

নাগেশ্বর বলল, ‘গতমাসেরটা হলেই কাজ চলবে।’ পাণ্ডেজী তাকে রসিদ দিয়ে স্থির করলেন নাগেশ্বরকে এখান থেকে সরাতে হবে। সরাতে হলে একটা যুক্তি চাই। নাগেশ্বর সেই সুযোগ দিচ্ছে না। দেবদ্বিজে তার খুব ভক্তি, প্রায়ই ঘরে পুজো করে। কন্যার বিবাহ দেবার আগে যে পুজো করেছিল তার প্রসাদ দিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডেজীকে। অত্যন্ত সদ্‌স্বাদু এবং পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশন করেছিল সে। খেয়ে তৃপ্ত হলেও মন খুঁত খুঁত করেছিল।

বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাগেশ্বর স্ত্রীকে রেখে এল দেশে। উপরি থাকলেও তার আয় খুব বেশী নয়। ফলে তাকে কজ করতে হয়েছিল অনেক। ঋণগ্রস্ত নাগেশ্বর স্থির করল কোলকাতায় সে একা থাকবে। তার স্ত্রী স্বভাবতই দেশে থাকতে চায় না। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তার। কোলকাতায় বেশীর ভাগ সময় ঘরে থাকলেও সে এখানে স্বাধীনভাবেই থাকে। মাঝে মধ্যে নাগেশ্বর তাকে কোন ভগবানের বায়োস্কেপ অথবা কালীঘাটের মন্দিরে নিয়ে যায়। দেশে থাকলে তাকে বন্দীদশায় কাটাতে হবে। কারণ সেখানে পর্দাপ্রথা অত্যন্ত কড়া। এমনকি নাগেশ্বরের সঙ্গেও রাত না হলে ওখানে সে কথা বলতে পারে না। তার উপর বিরাট সংসারের হাজারটা কাজ সামলাতে হয় তাকে। যেহেতু সে স্বামীর সঙ্গে কোলকাতায় থাকে তাই দেশের বাড়ির লোক সেখানে গেলে এই চাপ দিয়ে বেশ সুখ পায়। তাই সে মেয়ের বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু নাগেশ্বর রাজী হয়নি। সে কোলকাতায় একা থাকলে অনেক পয়সা বেঁচে যায় এবং কজ শোধ করতে সুবিধে হবে। স্ত্রী-যুক্তি শোনার মানসিকতা যেহেতু বিহারী পুরুষদের নেই তাই নাগেশ্বরের চলে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি।

পাণ্ডেজীর এই বাড়িতে কোন অবিবাহিত পুরুষের স্থান নেই। নাগেশ্বর যখন এবার একা ফিরে এল তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন। যদিও নাগেশ্বর কোনদিকে মদুখ তুলে তাকায় না তবু স্ত্রীহীন হয়ে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে থাকাটা শোভন হচ্ছে না। কিন্তু সে অবিবাহিত নয়, স্ত্রীও প্রয়োজনে দেশে যেতে পারে। একটা

বিহিত করার জন্যে সুযোগ খুঁজছিলেন পাণ্ডেজী।

এই প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে কোলকাতায় আছে নাগেশ্বর। প্রথম প্রথম তার খুব মন খারাপ হতো। রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী তার পাদোদক পান করত। সে সময় চোখ বন্ধে থাকত নাগেশ্বর, নিজেকে খুব দামী বলে মনে হত। স্নান খাওয়ার শেষে যখন অফিসে বেরুতো তখন স্ত্রীর প্রণাম নিতে হতো। অনেক দিন তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে এসে এই কারণে আবার ফিরে যেতে হয়েছে। সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে নাগেশ্বর। রাত আটটার মধ্যেই স্ত্রীর পাশে না শুলে তার খুব মন খারাপ লাগে। শূয়ে শূয়ে অফিসের বাঙালীদের গল্প বলে সে। মনে প্রাণে বাঙালীদের অনেক কিছু সে অনুসরণ করতে চায়। ভাঙ্গা বাংলা বলে। কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা মানতে পারে না। স্ত্রীকে সে অফিসের মেয়েছেলেদের নানান কেচ্ছার কথা শোনায়। আর স্ত্রীর কাছে এ বাড়ির মেয়েদের গল্প শোনে। দু-একজন, যাদের সে ভাল করে কখনো দ্যাখেনি, একটু আধটু ফর্টিফোর্টি করার বাতীক আছে। নাগেশ্বর বউকে সতর্ক করে দেয় ভুলেও যেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে।

এখন সেই ঘরে একা শূয়ে শূয়ে নাগেশ্বরের বড় কষ্ট হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাতে-ভাত রান্না করে অফিসে যেতে হয়। হোটেল খেলে খরচ বাড়বে বলে সন্ধ্যাবেলায় আবার স্টোভ ধরাতে হয়। এ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা নেই তার। কিন্তু অফিসে সে নিশ্চিন্ত, বাঙালীদের মন খুব উদার হয়। বউ থাকলেও বেশ্যাদের গল্প বেশ সহজেই করে ওরা।

সেদিন সকালে সে ভাত খেতে বসেছে এমন সময় একটা বাচ্চা হাতে বাটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত নাগেশ্বর শূখোল 'কি চাই?'

এমন সময় পেছন থেকে আর একটি গলা ভেসে এল, 'রোজ রোজ হাত পুড়িয়ে খান, তাই একটু সবজি দিলাম।'

নাগেশ্বর আঁতকে উঠল, 'না, না, আমার কিছু লাগবে না।'

'এক কথা! দিদি থাকলে কি এত কষ্ট করতে হতো।'

একথা শোনার পর না নিয়ে পারেনি নাগেশ্বর। খেয়ে দেখল তার স্ত্রীর চেয়ে অনেক ভাল রান্না। বাচ্চাটি দাঁড়িয়েছিল, এঁটো বাটি ধুয়ে তাতে কিছু বাতাসা দিয়ে ফেরত দিল নাগেশ্বর।

স্ত্রীলোকেরা কখনই অন্য স্ত্রীলোককে সুখী দেখতে পারে না। নাগেশ্বরের স্ত্রী চলে যাওয়ার পর এই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা যেন স্বস্তি পেলে। তাদের মনে হল নাগেশ্বরের এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। শরীরের গড়ন হাসিকা হওয়ায় তাকে খুবই তরুণ দেখায়। অল্পবয়সী স্ত্রীহীন যুবকের প্রতি স্ত্রীলোকদের এক ধরনের মমতা জন্মায়। ক্রমশ অন্যান্য ঘর থেকে খাবার আসতে লাগল নাগেশ্বরের কাছে। নাগেশ্বর প্রথমে বিব্রত হলেও শেষ পর্যন্ত বেশ উপভোগ করতে লাগল। এত অন্তঃপুরবাসিনীদের সে চোখে দেখে না কিন্তু প্রতি মৃদুহৃৎ তাদের নরম স্পর্শ

অনুভব করে। উনুনে আগুনে দিলে ধোঁয়া আকাশে ছড়াবেই। বাড়ির তিন চারজন পুরুষ ওর সঙ্গে হেসে কথা বলতে শুরু করল। তারা নাগেশ্বরের ঘরে এসে বসতে লাগল। নাগেশ্বরের ট্রান্সিস্টার রেডিও তাদের প্রধান আকর্ষণ। আড়ালে আবডালে তারা নাগেশ্বরের কাছে দু' পাঁচ টাকা কর্জ করা শুরু করে দিল। নাগেশ্বর ওই সামান্য অর্থ তাদের দিতে পেরে যেন বেঁচে গেল। বিনা পয়সায় প্রতিদিন খাবার খেতে তার মন স্বস্তি পেত না তাই ঋণ দিয়ে কখনই তাগাদা করেনি সে। 'ফলে ভাড়াটীদের একাংশের মধ্যে তার খ্যাতির বেড়ে গেল খুব।

স্নেহপ্রদর্শনের কালেও স্ত্রীলোকেরা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না। নাগেশ্বর প্রত্যেক রান্নাই ভাল বলে, কোন রমণীর মুখের দিকে তাকায় না। এতে তাদের মন ভরে না। প্রত্যেকেই চায় তার ভূমিকা অধিকতর উজ্জ্বল হোক। ফলে দু-একজন একটু একটু করে সাহসী হল। তারা অনেক সন্তানের জননী হলেও কঠিন পদাপ্রথায় বিশ্বাসী। কিন্তু এখন নাগেশ্বরকে অসহায় তরুণ বলে ভাবতে কারো কষ্ট হল না। কথাবার্তা, এতকাল কোন শিশুর মাধ্যমে চলত, এখন সেই দু-একজনের সঙ্গে সরাসরি হয়। তারা ভগ্নীস্নেহ প্রকাশ করে। এতে নাগেশ্বর কৃতার্থ হয় এবং সেই রমণীরা অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের অধিকতর মূল্যবান মনে করতে থাকে। বোঝা যায়, নাগেশ্বরের সঙ্গে এই মেলামেশার জন্যে তাদের স্বামীরা কোনরকম বিরাগ পোষণ করে না।

সোদিন সন্ধ্যার একটু আগে ঘরে ফিরেছিল নাগেশ্বর। বাইরের ঘরে পাণ্ডেজীদের আসর জমজমাট। আগামীকাল মোহনবাগানের খেলা, কথাবার্তার বিষয় সেটাই। নাগেশ্বরকে দেখে পাণ্ডেজী বললেন, 'আইয়ে মাহাতোজী, আপনি তো এ ঘরে আসেনই না। কি যে অপরাধ করেছি আমরা।'

নাগেশ্বর দুহাত জোড় করে বলল, 'নমস্ते। ছি ছি একথা বলছেন কেন। আসলে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না।'

পাণ্ডেজী বললেন, 'একি কথা। আপনার মত শরীফ আদমি এলে আমরা বিব্রত হবো? এ বাড়ির সব মেয়েপুরুষ যখন আপনাকে আত্মীয় করে নিয়েছে—' কথাটা শেষ না করে হাসলেন পাণ্ডেজী। নাগেশ্বর দেখল উপস্থিত অন্যান্যদের মুখ বেশ গম্ভীর। ওইসব পুরুষরা তার ঘরে যাতায়াত করে না। নাগেশ্বর বসল।

পাণ্ডেজী বললেন, 'আমি খুব প্রবলেমে পড়েছি, আপনাদের সমাধা দরকার। কর্পোরেশন বাড়ির ট্যাক্স বাড়িয়েছে, ইলেকট্রিক কোম্পানীও চার্জ ডাবল করেছে। এই অবস্থায় আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি নিজে আপনাদের বাড়ি ভাড়া বাড়িতে পারতাম কিন্তু তা করব না। কারণ আমি ডেমোক্রেসিটে বিশ্বাস করি। আপনারাই নিজেরা ঠিক করে দিন কত ভাড়া বেশী দিতে পারবেন যাতে আমার ওপর চাপ না পড়ে। আপনি বি. এ. পাশ শিক্ষিত লোক, এখানে আছেন আমাদের গর্ব, আপনি সবার সঙ্গে কথা বলুন।'

নাগেশ্বর বলল 'আপনি খুব সহৃদয় মানুষ। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আর কি

বলব। আমি কি পাশ করেছি তা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, আমি এনাদের মত একজন ভাড়াটে মাত্র, এটাই আমার পরিচয়। তাই সবাই যা ঠিক করবে তাই আমি মানব।’

পাণ্ডেজী মাথা নাড়লেন, ‘খুব ভাল, খুব ভাল। তা স্ত্রী না থাকায় আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?’

নাগেশ্বর মাথা নাড়ল, ‘একা লোকের আর অসুবিধে কি!’ তারপর সে উঠে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ‘আপনারা কি কালকের খেলা দেখতে চান?’

পাণ্ডেজী বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, জরুর! কিন্তু—’

নাগেশ্বর সেদিন অফিসে উপরি হিসেবে পাওয়া একটা টিকিট পকেট থেকে বের করে পাণ্ডেজীর সামনে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এরকম মহার্ঘ টিকিট যে এককথায় কেউ বের করে দিতে পারে এটা কম্পনার বাইরে। এ বাড়ির অনেকে টিকিটটাই প্রথম চোখে দেখল। পাণ্ডেজী হাসলেন। চাপ দিলে পাথর থেকেও জল বের হয়, তা নাগেশ্বর তো ছেলেমানুষ।

ইদানিং কলঘরে যাওয়ার সময় দু’একটি রমণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তারা ঠোঁট টিপে হাসে। এই হাসি দেখে নাগেশ্বর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ঘরে ফিরে এসেই সে সতর্ক করে নিজেকে। যে রমণী পরপুরুষের দিকে অমন ভঙ্গীতে হাসতে পারে সে চরিত্রহীনা। তার প্রতি কোনরকম আকর্ষণ বোধ করা মানে নিজের স্ত্রীকে অপমান করা। একথা ভাবতেই নিজের স্ত্রীর জন্যে তার খুব মন কেমন করতে লাগল। এই ভর যোবনে স্ত্রীহীন হয়ে রাত কাটানো বড়ই কষ্টকর। যদিও মেয়ের বিয়ে দেবার পর তার ছাশ্বিশ বছরের স্ত্রী আবেদন করেছে যাতে কোন কারণেই সে যেন পুনরায় গর্ভবতী না হয় সে দায়িত্ব নাগেশ্বরকে নিতে হবে। তাহলে একুশ বছরের জামাই-এর সামনে মদুখ দেখাতে পারবে না সে। নাগেশ্বর ভেবেছিল বলে, তাদের সংসারে শাশুড়ি কখনই জামাই-এর সামনে দাঁড়ায় না, অতএব মদুখ দেখানোর সমস্যাই নেই। কিন্তু লজ্জাবোধ হওয়ায় সে কথা বলেনি সে।

ঘরে মদু শব্দ হল। নাগেশ্বর খাটে শুয়ে ছিল। চোখ মেলে দেখল খাবারের বাটি নিয়ে একজন ঢুকছে। সে দ্রুত উঠে বসতেই রমণীটি ঘোমটা সরিয়ে হাসল। একে আগেও দেখেছে নাগেশ্বর। অন্তত চল্লিশ বছর বয়স এবং সুশীল হীনা। বোধহয় সেই কারণেই শরীর অটুট। রমণীটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে বলল। তারপর ঘরের দরজা ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলল, ‘কাল রাত্রে আমার স্বামী থাকবে না। আমার ঘরে ছেলে হয় সেইজন্যে তারকেশ্বরে জল দিতে যাবে। ওসবে কিছ্ হয় না আমি জানি। কিন্তু সে জানুক ওতেই কাজ হল।’

নাগেশ্বর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলল, ‘কিন্তু আমি কি করব?’

রমণী চোখে বিদ্যুতের চমক এনে বলল, ‘ঢং, জানেন না যেন! নাকি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না? আপনার বউ চলে যাওয়ার পর থেকেই এই ফন্দিটা আমি এঁটেছি।’

কাল রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি আসব। দরজাটা খোলা রাখবেন।’ যেমন এসেছিল তেমন নিঃশব্দে চলে গেল সে।

বজ্রাহতের মতো বসে থাকল নাগেশ্বর। একি কথা শুনল সে! এই রমণীকে এই কদিন সে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণা বয়স্কা দিদির মত দেখেছে। এত কঠোর পদাপ্রথার মধ্যে বাস করেও এইরকম কামনা কেউ পোষণ করে বিন্দুমাত্র না জানতে দিয়ে! সে তো বয়সে অনেক ছোট। মহাভারতে নাকি এমন ঘটনার কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন রমণীরা শক্ত খোলের আড়ালে নিজেকে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু একমুহূর্তেই সেই আড়াল খুলে দিতে স্বেচ্ছাও করে না। তবে মুশকিল হল, সেই মুহূর্ত কখন আসবে তা তারা নিজেরাও জানে না। এই ঘটনাই তার চিরসত্যতা প্রমাণ করে। এই ব্রাহ্মণ পত্নী তাকে কি পাপে নিয়ে যাচ্ছে! নাগেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনার কথা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু অধিক রাতে ওই নিঃসন্তান রমণীর কথা চিন্তা করতে করতে একটি গোপন ঢেউ তাকে প্লাবিত করল। একটি সুঠাম শরীর চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দিচ্ছিল।

পরের দিন অফিসে কোন কাজে মন দিতে পারছিল না নাগেশ্বর। বিকেল হতে না হতেই তাকে চুশ্বকের মত বাড়িটা টানছিল। সে অবশ্য শরীরে যখন ঘরে ফিরল তখন পাণ্ডেজীর মজলিশ সরগরম। হয়তো খেলার জন্যই ওই অবস্থা। কিন্তু তাকে দেখা মাত্রই সমস্ত কথাবার্তা নিঃশব্দ হয়ে গেল। নাগেশ্বর দেখল সবকিছু চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এবং মূখের অভিব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর। ধক করে উঠল বুক। আজকের খবর কি এরা কোনভাবে জেনে গেছে! হিমবুক নিয়ে সে দে’তো হাসল, ‘নমস্তে পাণ্ডেজী! আপনি খেলা দেখতে যাননি?’

পাণ্ডেজী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেউ কথা বলছে না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নাগেশ্বর ভেতরে যাওয়ার জন্য বারোয়ারী পাপোসে পা মূছতে যেতেই একজন চিংকার করে উঠল, ‘খবরদার। ওতে তুমি পা দেবে না।’

এবার আর একটা শীতল স্রোত নাগেশ্বরের দিকে ধেয়ে এল। সে লোকটির দিকে তাকাতে পাণ্ডেজী উঠে ওর সামনে এল। নাগেশ্বর কোনমতে জিজ্ঞাসা করল ‘কি ব্যাপার?’

পাণ্ডেজী বললেন, ‘তোমার জামাই-এর বাপ এসেছিল দুপুরে।’

নাগেশ্বর খতমত হল, বেয়াই আসবে সে তো জানে না।

পাণ্ডেজী আবার বললেন, ‘তাঁর কাছে তোমাদের সব খবর পেলাম!’

নাগেশ্বর বলল, ‘কি খবর?’

পাণ্ডেজী বললেন, ‘তোমরা নীচু জাত।’

সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি আমাকে কি বলতে চাইছেন?’

পাণ্ডেজী বললেন, ‘আমি ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস করি। সবাই যা বলবে আমি তাই করব। আগামীকাল সকালে মিটিং আছে, তুমি উপস্থিত থাকবে। এ বিষয়ে

সবাই আলোচনা করবে।’

নাগেশ্বর বলল, ‘ওসব আপনার ব্যাপার। আমি নিয়মিত ভাড়া দিই, কারো সাতে পাঁচে থাকি না। আমি যেমন আছি তেমনি থাকব।’

পাপোস না ছুঁয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আসবার সময় সে লক্ষ্য করল পথের পাশে কেউ নেই। এমনকি বাচ্চাগুলোও সামনে আসছে না। মদুখ হাত ধুতে কলঘরে যেতে দেখল সবাই আড়ালে সরে যাচ্ছে। এই সময় একটা বৃড়ি কাকস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, ‘এই জল আমি খাব কি করে।’

কেউ একজন বলল, ‘আপ্তে বল, ও শুনতে পারে।’

‘শুনুক।’ বৃড়ির গলা তীব্রতর হল, ‘খুব নেচেছিলি তোরা। খুব সবজি খাওয়াতিস। হায় হায়।’

কোনরকমে ঘরে ফিরে এসে কিম মেরে গেল নাগেশ্বর। একদিনের মধ্যেই সে এদের কাছে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। অফিসের বাঙালীরা এ কথা শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ক্রমশ ভয় করতে লাগল তার। আজ কেউ সবজির বাটি দিয়ে গেল না। বাইরে পদ্রুদ্ররা উত্তেজিত গলায় তর্ক করছে। বিষয়টা যে-সে-ই তা বদ্বতে অসুবিধে হচ্ছে না। মেয়েমহল একদম নিঃসাড়। সমাপ্তিপুরে এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি নাগেশ্বরের। ছাপরার দিকে এ ব্যাপারটা খুব জোরালো তবে উত্তরপ্রদেশের মত নয়। খাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে গেল, স্টোভ ধরাল না নাগেশ্বর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ওরা কি করতে পারে। নিশ্চয়ই তাকে মারধোর করার সাহস পাবে না ওরা। তা না হলে সে এই বাড়ি কিছুতেই ছাড়বে না। ওর প্রতি এমনিতেই সবাই ঈর্ষান্বিত ভাল চাকরী করে বলেই, এটি অতিরিক্ত। সে ভাড়া দিচ্ছে মাথা উঁচু করে থাকবে। এখন কোলকাতা শহরে এত অল্প পয়সায় বাড়ি ভাড়া মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। তাই ছেড়ে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

আজকের রাতটার কথা মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল পাণ্ডজীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই। এখন খেয়াল হতে সে নিশ্চিন্ত হল। ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বলল, না কোন চান্স নেই। কেউ এ ঘরে আসবে না।

কিন্তু অনেক রাতে যখন দরজাটা খুলেই চট করে বন্ধ হয়ে গেল তখন চমকে উঠল সে। রমণীটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আলো নেভা থাকলেও জানলা দিয়ে ঈষৎ ওজ্জ্বল ঘরে আসায় সে রমণীটিকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। খুব মদুদ্রস্বরে রমণীটি বলল, ‘জেগে আছেন আপনি?’

নাগেশ্বরের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ঘাড় নাড়ল।

‘রমণীটি বলল, ‘সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন ফিরে যেতে হবে।’ বলে হাসল।

নাগেশ্বর কোনরকমে বলল, ‘আপনি চলে যান।’

‘কেন?’

‘আমি পারব না !’

‘কেন ?’

‘আমি, আমি নীচু জাতের লোক । শোনে নিন ?’

‘শুনছি । কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ । আপনার সন্তান আছে ।’

‘আমাকে ঘেন্না হচ্ছে না ? আপনি ব্রাহ্মণের বউ !’

‘ভগবান তো এইজন্যে রাত দিয়েছেন । রাতে সব ঢেকে রাখা যায় ।’

‘আপনি ক্ষমা করুন ।’

‘না ! আমি যখন একবার লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি তখন ফললাভ করবই । তবে আপনি এখান থেকে কালই চলে যান । ওরা আপনার ক্ষতি করবেই । সেটা আমার লাভ । দিনের বেলায় আপনাকে দেখতে হবে না ।’

রমণীটি তার খাটের দিকে এগিয়ে আসতেই নাগেশ্বর বলে উঠল, ‘আপনি চলে যান । আপনি ভ্রষ্টা, ম্ৰিচারিনী ।’

রমণীটি যেন বেগাঘাত পেল । তার ঠোঁট স্ফীত হয়ে বোঁকে উঠল একবার, চোখ জ্বলছে । দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে বৃকের উত্থান পতন সমুদ্রকে হার মানায় । কিন্তু সেটা কয়েক পলকমাত্র । নাগেশ্বর দেখল সে যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল নিঃশব্দে ।

তারপর সব চুপচাপ । নাগেশ্বরের রক্ত চলাচল ঈষৎ শান্ত হলে সে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় ফিরে এল । রমণীটির দূঃসাহস এবং স্পর্শ্য সে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল । তার জাতের কথা জানার পরও প্রস্তাবের কোন হেরফের হল না কেন ? এ অবস্থায় ধরা পড়লে রমণীটির তো মারাত্মক ক্ষতি হতো তবু এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহসী হল ? নাগেশ্বর নিজের দিকটা ভাবতে লাগল । কেন সে দরজাটা ভাল করে বন্ধ রাখেনি ? এত ঘটনার পরেও কি সে গোপনে রমণীটির জন্যে অপেক্ষা করছিল ? তাহলে এখন গ্রহণ করতে পারল না কেন ? এই রকম হাজার চিন্তা মাথায় পাক খেলে কারো ঘুম আসে না । ওরা নাগেশ্বরের ক্ষতি করবে । কি ক্ষতি !

ঠিক এইসময় বাড়ি কেঁপে উঠল তীক্ষ্ণ চিৎকারে । যারা নিদ্রিত ছিল তাদের অচেতন অনর্ভূত সেই শব্দের প্রতিধাতে ছিন্ন হল । সতের ঘরের বাসিন্দারা চিৎকারের কারণ সন্ধানে সশব্দে দরজা খুলতে লাগল । চমকে উঠেছিল নাগেশ্বরও । সে দ্রুত দরজা খুলতে যেতেই রমণী কণ্ঠস্বর ডুকরে উঠল, ‘হায় ভগবান’ ওঁ কিয়া হো গয়া ।’

নাগেশ্বরের কণ্ঠস্বরটি পরিচিত বোধ হওয়ার কারণভ্রান্তি করে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল । সতের বাসিন্দা একযোগে প্রশ্ন করছে, কি হয়েছে ? চিৎকার এবং কান্নার কারণ কি ? রমণীটি প্রথমে নিজের স্বামীকে দায়ী করল তার ভাগ্যের জন্যে । কি দরকার ছিল এই বয়সে সন্তানের আশায় তার কণ্ঠস্বরে যাবার ? সে যদি ঘরে থাকত তাহলে কি ওই লোকটা এই সাহস পেত ?

এতক্ষণে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে নাগেশ্বরের কাছে । তার সমস্ত শরীর

কাঁপতে লাগল। মহাভারতে আছে, প্রত্যাঘাতা স্ত্রীলোক সাপের চেয়ে হিংস্র হয়। এখন কি হবে।

পদ্বিগন্ধের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র যেমন শকুনেরা ডানায় জোর পায় তেমনই সতের বাসিন্দারা নানাবিধ প্রশ্নে সত্য জেনে নিল। এই একটু আগে রমণীটি কলঘরে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল। এমন সময় কেউ তার হাত ধরে টানে। ভয় পেয়ে চিৎকার করতেই লোকটি যখন তাকে ছেড়ে ছুটে যায় তখন সে চিনতে পারে। এতদিন সে যাকে নিজের ভাই-এর মত দেখে এসেছে সেই লোকটা তার ইজ্জত নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে গঙ্গা মাষ্টার বন্ধুকে গিয়ে শুল্লের খাটলে তবেই এ অপমানের জ্বালা দূর হবে। পাগলের মত করছিল রমণীটি। অন্যান্য রমণীরা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ তখন পাণ্ডেজীকে খুঁজছে।

একটু পরেই পাণ্ডেজীর গলা পাওয়া গেল। তাঁকে অনেকে মিলে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করতেই তিনি বললেন, ‘কে সে নরাদম, এই বাড়ির কেউ কি যে পরস্মীর শরীরে হাত দেওয়ার হিম্মত রাখে?’

পুরুষরা আবার রমণীটির শরণাপন্ন হল। সে তখনও ঢুকরে ঢুকরে কাঁদছে। সেই অবস্থাতে জানাল, ‘ও চোখের নজর আমার খারাপ লাগত। কিন্তু ভাবতাম আমার ভাইয়ের মতন। অন্য সবাই যেমন সবজি তৈরী করে ওকে দিত আমিও দিতাম। ওর বউটা তো ভারী সুন্দর ছিল। কিন্তু আজ দুপুরে যখন শুনলাম—তখন থেকে বন্ধু জ্বলে যাচ্ছিল। মাঝরাত্রেও মনে হচ্ছিল আমি ভাই বলছি আর সে নিজের পরিচয় লুকিয়ে আমাদের ঠকিয়েছে? অমনি তাই মনে হল স্নান করলে পবিত্র হবে। তা যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি যে সে খপ করে হাত ধরবে তা কে জানত!’

সমুদ্রগর্জনকেও এই শব্দ হার মানায়। মারো শালাকে, কেটে ফেল, ঘর জ্বালিয়ে দাও—ইত্যাদি বাক্য বাঁশ ফাটার মত বাজতে আরম্ভ করল। পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাগেশ্বর। হে ভগবান, এঁক করলে! মেয়েছেলেটা এতবড় মিথ্যে বলছে? সে দ্রুত দরজার ছিটকিনিটাও বন্ধ করে জানালার পাল্লাও আটকে দিল। ওরা কি দরজা ভেঙ্গে ঢুকবে? না সেটা সহজ নয়। তার চেয়ে সে যদি এখনই বেরিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মেয়েটিকে? সব কথা ফাঁস করে দেয়? তবে? সঙ্গে সঙ্গে ওর মন বলল, কেউ বিশ্বাস করবে না। ওরা বিশ্বাস না করার জন্যে মন্থিয়ে আছে। তাহলে?

দ্রুত পালের আওয়াজ তার বারান্দায় উঠে আসা মাত্র পাণ্ডেজীর গলা শুনতে পাওয়া গেল, ‘এ্যাই হুঁশিয়ার। কেউ দরজায় হাত দেবে না। ওটা আমার দরজা।’ লোকগুলো বলল একসঙ্গে, ‘কিন্তু ও শালাকে এখনই ছিঁড়ে ফেলতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।’

পাণ্ডেজী বললেন, ‘এটাতো আমারও লজ্জা। কিন্তু আমি ডেমোক্রেসিতে

বিশ্বাস করি। হুট করে কিছুর করলে পরে আফশোষ হয়। প্রথমে ঠিক হোক, নাগেশ্বর শিউশরণের জেনানার গায়ে হাত দিয়েছিল কিনা! কোন প্রমাণ আছে?’

ঘরের মধ্যে ইঁদুরের বুক নিয়ে দাঁড়ানো নাগেশ্বরের মনে হল পাণ্ডেজীর মত মানুষকে চেনা যায় না প্রথমে। সে মনে মনে পাণ্ডেজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। একজন বলল, ‘এতরাতে কে দেখবে? শিউশরণের বউ যখন বলছে তখন সত্যিকথাই বলছে! কোন মেয়েছেলে ফালতু নিজের বদনাম দেবে না!

পাণ্ডেজী বললেন, ‘জরুর। তবে কিনা একটু প্রমাণ চাই। আমি বলি কি, শিউশরণের বউ যদি তার স্বামী—অ, স্বামী তো এখন তারকেশ্বরে, তাহলে স্বামীর জামা ছুঁয়ে হলফ করে বলুক যে সে যা বলছে সত্য। স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় হল স্বামী এ কথা মনে রেখে সে যেন কথা বলে।’ হৈ চৈ পড়ে গেল শিউশরণের জামা আনবার জন্য। সবাই এখন চুপচাপ। তারপরেই কান্নাজড়ানো গলা শোনা গেল, ‘যা বলছি সব সত্য।’

সঙ্গে সঙ্গে গজ’নটা ম্বিগুণ হল। তারপরেই পাণ্ডেজীর গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠল, ‘আপনারা কি চান? এই লোকটা এখানে থাকুক না চলে যাক!’ ‘ওর খুন চাই’ ‘ওকে মেরে ফেল,’ ইত্যাদি চিৎকার উঠল।

পাণ্ডেজী বললেন, ‘না তা হয় না। আমার বাড়িতে খুন হোক এটা আমি চাই না। পুলিশ তোমাদের ছেড়ে দেবে না। তার চেয়ে ওকে চলে যেতে বলাই ভাল।’

নাগেশ্বর দরজায় প্রথম আঘাত শুনল, ‘নাগেশ্বরজী, দরজা খোল।’ গলা শুকিয়ে গিয়েছিল নাগেশ্বরের। বাইরে উত্তেজিত সংলাপ চলছে। পাণ্ডেজীর প্রস্তাব কেউ মানতে পারছে না। সাড়া দিল না নাগেশ্বর। কয়েকবার ডাকাডাকির পর পাণ্ডেজী উত্তেজিত হলেন, ‘আরে নাগেশ্বরজী, তুমি সাড়া দিচ্ছনা কেন? আমরা তো সবাই জানি তুমি ঘরেই আছ।’

এবার প্রাণপণে চিৎকার করল নাগেশ্বর, ‘ও যা বলছে সব মিথ্যে কথা। আমি সন্ধ্যা থেকে ঘরের বাইরেই যাইনি।’

পাণ্ডেজী বললেন, ‘তাহলে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? বাইরে বেরিয়ে এস।’

ঠিক সেইসময় একটা লাঠি জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসতেই নাগেশ্বর তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল। অবিরাম দরজায় শব্দ হচ্ছে, মচমচ করছে পাল্লা। যেকোন মূহুর্তেই ভেঙ্গে পড়তে পারে সেটা। তার ঘরের চারপাশে উত্তেজিত শব্দ পাক খাচ্ছে।

নাগেশ্বরের সমস্ত শরীর এখন ঘামে জ্বজ্ববে। হৃদয়ে পড়া জন্তুর মত তার শরীর কঁকড়ে ঘরের মধ্যে আগ্রয় খুঁজছে। কিন্তু সে অনুভব করছিল এই দরজা বা জানলা মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়ির বাইরে যে কোলকাতা শহর সেটা একদম আলাদা। সেখানে কেউ জাত নিয়ে মাথা ধামায় না। যদি একবার সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায় তাহলে—।

নাগেশ্বর উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল। নানারকম শলাপরামর্শ চলছে বাইরে। সে নিঃশব্দে ছিটকিনি এবং খিল সরাল। তারপর আচমকা দরজা খুলে তীরের মত বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সবাই কিছন্ন বন্ধে ওঠার আগেই নাগেশ্বর সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ উঠল, ‘ভাগতা হায় ভাগতা হায়।’

সেই গভীর রাতে একদল মানুষ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে লাঠিসোটা হাতে কোলকাতার রাজপথে ছুটে যাচ্ছিল শিকারে। যে শিকার সে তখন উন্মত্তের মত দৌড়ে যাচ্ছে সম্মুখে। ওদের মধ্যে দ্রুত ক্রমশ কমে আসছিল। যেহেতু কোলকাতা সারারাত জাগ্রত থাকে তাই পথের বাসিন্দারাও এই উত্তেজনায় অংশ নিল। এই মানুষ শিকার-পর্ব শেষ পর্যন্ত কারণ পালটাতে একটা সাদাসাপটা চেহারা নিয়ে ফেলল। নাগেশ্বর জানত না উত্তরপ্রদেশ কিংবা ভারতবর্ষের যে কোন জায়গার সঙ্গে কোলকাতার তফাৎ এখানেই।

নশ্বুরতা ঢেকে একটা মানানসই পোশাক চাপালে লোকে অন্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে এখানে, যুক্তির প্রয়োজন হয় না। পাণ্ডেজী সেকথা জানতেন। সমস্যাটাকে ঘরের বাইরে দিয়ে তাই তিনি নিশ্চিন্ত।

সেই যে, কে যেন বলেছিলেন, ‘অনেক হল, এবার মরণের পাশে শ্বুতে চাই নিশ্চিন্তে।’

কেউ জবাব দি়েনিছিল, ‘এখনই ! তাহলে যে মরণও গভ’বতী হবে !’

চমকে উঠেছিলেন তিনি। ভেঁ কাটা ঘুড়ির স্মৃতিটাকে গুঁটিয়ে নেবার মত মদুখ করে নিজের মনেই বলেছিলেন, ‘হায়, তাহলে যে আর একটি সন্তান জন্ম নেবে এবং নিঃসন্দেহে জানি তার নাম শয়তান !’

তিনি ঠিক জানতেন না, মরণের কাছেই তো সবাই জীবনকে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেই অর্থে তো মরণের বিরাট বন্ধকী কারবার। যে জানে সে জানে মরণই পারে জীবনকে ফিরিয়ে দিতে। শ্বুধু তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা জানতে হয়। যেমন, এই শহর যে কিনা সেই অর্থে মৃত (যদি পাশাপাশি কোন ঝকঝকে নগরকে রাখা যায়), তার কাছে আসুন। দেখবেন ফিরে যাওয়ার সময় একটা জীবনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন যদি ঠিক চাবি ঠিকঠাক ঠিক তালার পড়ে।

সব দেশ ঘুরে যখন পকেট আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না তখন এইরকম আহ্বান এল। পড়েই মনে হল, বাহ চমৎকার। এরকম ডাক তো অন্যদেশের ট্যুরিস্টবন্ডারো দেয়নি কখনো। কাজের তাগিদে আমাকে পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে হয়। পাঁচ বছরে একবার! অথচ এই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়িনি কখনও যদিও কতবার ওই শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি। পকেটে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তা দিয়ে দুটো রাত কোন হোটেলে থাকা যায়। তার মানে একটা বিরাট দিন হাতে থাকবে দেখবার এবং ওই যে বলেছে ঠিকঠাক তালটা যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া হলেও হতে পারে।

কাল রাতে এই শহরে পা দি়িয়েছি। রাতের বেলার সব আকাশের মোটামুটি দুই চেহারা, মেঘ থাকলে এবং না থাকলে। ঘুমুলে যেমন বেঁচে থাকার ঠিকুংবা মরে যাওয়া সমান সমান। কথাটা কথায় জড়িয়ে হোঁচট খেলো বোধহয়, সমান সমান হয়েও সমান নয়। ঘুম তো স্বপ্ন দেখার, এইটুকুও ওর বাড়তি স্বভাব।

হিসেবে দেখা গেল দু’রাতের হোটেল খরচ চালিয়ে সুমন্যিই থাকবে আমার। কি আছে এই শহরে যা আমি কোথাও দেখিনি তাই দেখে নিতে পারি। হোটেলের রিসেপশনে নামলাম ব্রেকফাস্ট খেয়ে। ঝকঝকে তরুণকে আয়নার মোড়া চারধার। যেদিকেই তাকাই নিজের পঁয়ত্রিশ বছরের মদুখটুকু দেখি। মানুষের শূন্যেই অনেক মদুখ থাকে, আমার কটা ?

এখানে শীত এবং নেই গরম পড়ে না বলেই নেই। এতদিন বাদে একটু হালকা

হয়েছি পোশাকে। চোশ পাজামা আর চাপা পাজাবিতে বোধহয় এখানে আমি একক। কারণ বদ্বতে অসুবিধা হয় না, নজর কেড়েছি এর মধ্যেই অনেকের। হোটেলের অভ্যর্থনাকারীরা এত হাসি কোথেকে সংগ্রহ করে কে জানে। কাল রাতেও দেখেছি, এখনও, এদের বোধহয় হাসির পুঁজি ফুরোয় না।

বললাম, ‘আপনাদের ট্যুরিস্টব্ল্যুরের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ায় এই শহরে এসেছি।’
কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে ছেলোট জবাব দিল, ‘আমাদের সৌভাগ্য।’

বললাম, ‘বলুন তো কি কি আছে এখানে দেখবার। আজ সারাদিনে সেসব ঘুরে দেখে নিতে হবে।’

ছেলোট হাসল, ‘একদিনে দেখতে চান! তাহলে বেশ পরিশ্রম হবে।’

বললাম, ‘তা হোক। দেখবার জন্যেই তো এসেছি।’

ছেলোট জানাল, ‘এত ছোট বড় জিনিস চারধারে ছড়িয়ে আছে যে একদিনে একা একা সব দেখে উঠতে পারবেন না। তাছাড়া কোন জিনিসকে এমনি দেখলে একরকম আবার তার গোপন কথা জানলে আর একরকম হয়ে যায়। তার জন্যে আপনার একজন গাইড নেওয়া দরকার।’

গাইড! চমৎকার। জীবনের প্রতি পায়েই কেউ না কেউ আমায় গাইড করেছে। যখন করেনি তখনই হোঁচট খেয়েছি। বললাম, ‘গাইড কোথায় পাব?’

‘আপনি নেন?’

‘হ্যাঁ।’

ছেলোট টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে এনে আমায় দিন। পনেরটা নাম পরপর, তাদের বয়স এবং দৈনিক দক্ষিণা। দক্ষিণার চেহারা দেখে আমার চোখ কপালে। এ যে আমার দু'রাতের হোটেল ভাড়ার সমান। পকেটে যা আছে তা দিয়ে এদের দু'ঘণ্টার বেশি পাওয়া যাবে না, দিন তো দু'রের কথা। তারপরেই মনে হল হয়তো এখানে লিখতে হয় বলে বেশী লেখা আছে, দর করলে হয়তো আমার সাধের মধ্যেই পেয়ে যাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এদের যেকোন একজনকে পাওয়া যাবে?’

‘চেষ্টা করতে পারি।’

‘কত দিতে হবে?’

‘নিশ্চয়ই কম হবে।’

ছেলোট আমাকে বড় বড় চোখে দেখল। যেন এরকম প্রস্তাব সে জীবনে শোনেনি। কথা বলছে না দেখে আমি বললাম, ‘দক্ষিণাটা আমার পক্ষে বেশ বেশী।’

‘দুঃখিত, এটাই ন্যায্যমূল্য।’

‘বেশ। এরা ছাড়া আর একটু সস্তা দরের গাইড পাওয়া যাবে না?’

‘সস্তা গাইড। না, তাদের সন্ধান আমার জায়গায় নেই।’

মাথা নেড়ে হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলেই একদল দালাল আর ট্যান্ডি ড্রাইভার এসে ছেকে ধরে।

কিন্তু এখানে ওরা কেউ নেই। ট্যান্ডিওয়ালারা খুব নিজস্ব চোখে আমাকে দেখল। রাস্তা বন্ধক নয় আবার নোংরা ও বলা যাবে না। বাড়িঘরদোর দেখলে মনে হচ্ছে আমি যেন হঠাৎ ভুল করে জুলিয়াস সিজারের আমলে চলে এসেছি। এমনকি রাস্তা দিয়ে যেসব মানুষ যাচ্ছে তাদের হাঁটাচলায় ব্যস্ততা নেই এবং পোশাকও মোটেই আধুনিক নয়। কিন্তু হোটেলওয়ালারা অথবা ট্যান্ডিওয়াইভার তো আর পাঁচটা দেশের মতনই একই চেহারার।

চোখের সামনে অন্যরকম দৃশ্য তাই কোঁতুহল বাড়ল। রাস্তায় নামলাম, ধুলো নেই কিন্তু লালচে ভাব আছে। একটা গাইডম্যাপ রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে চেয়ে আনলে হতো। কোন অলস ছোকরাকে দেখছি না। পেশাদার গাইডের চেয়ে ওরা কম কাজের হয় না। দোকানপাটগুলো দেখে আরো অবাক হলাম। চেহারায় তো আধুনিক মোটেই নয় এমনকি বা সব জিনিস বিক্রী করছে তাদের এখন কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। প্রাচীন রোম কিংবা মদিনায় এইসব দোকান দেখা যেত। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা সিনেমার সেটে এসে পড়েছি এবং একটু পরেই এখান দিয়ে ক্লিপেট্টো চলে যাবেন। তবে একটা কথা ঠিক, লোকেরা আমার দেখছে। মদ্য নয় পোশাকটাকে। মেয়েরা কি এইসময় খুব কম বের হয়? কারণ খুব সুদ্রী অল্পবয়সী মেয়ে চোখে পড়ছে না।

একটু বাদেই আমি দিশেহারা এবং সেই সময়েই চোখে পড়ল। ওটা কি পানশালা? এই পরিবেশে রেস্টরাঁ শব্দটাকে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে। ওপরের সাইনবোর্ডে কিছু একটা লেখা রয়েছে যার ভাষাটা আমার কাছে অবোধ্য। লম্বা কাউন্টার; তার ওপাশে দাঁড়িয়ে পাকা আমের মত এক বৃন্দ স্থলিত চোখে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার চেনা ভাষাটাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললেন, ‘কিফ খাবেন?’

ত এমন দরকার ছিল না। কিন্তু ওই যে লম্বা টুলটার বসতে পারার লোভে মাথা নাড়লাম। ঘর নয় কারণ তার তিনদিক খোলা থামের ওপরে মাথার ছাদটা আটকানো। মাঝে মাঝেই লম্বা লম্বা টুল রাখা আছে। এটা তাহলে কিফের দোকান। মদের হলেই বরং বেশী মানাতো।

হুকুমটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বৃন্দ এবার আমার পাজাবীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অনেক যত্ন করে আমার চেনা দর্জি সেখানে কাজ করেছে আরো সুতো দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘নতুন এসেছেন এই শহরে?’

বললাম, ‘হ্যাঁ। আজ একটু ঘুরে দেখতে চাই।’

কিফ এল।

‘আমার একজন ভাল গাইড চাই। কিন্তু বেশী টাকা দিতে পারব না।’

‘তা কি হয়? যে আপনাকে পথ চেনাবে তাকে আপনি উপযুক্ত সম্মান দেবেন না?’ তাহলে সে ভুল পথ চেনাবে, ক্ষতি তো আপনিই।’

‘তা ঠিক। তবে কিনা আমার পকেটে বেশী পরস্যা নেই কিন্তু ইচ্ছে আছে শহরটা দেখবার। বলছিলাম কি, আপনার জানা কোন বেকার ছেলে আছে যে এই

শহরটাকে চেনে ?

‘থাকবে না কেন ? কিন্তু তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা তো আপনি বুঝবেন না । ওকে ভাড়া করে কোন লাভ হবে না ।’

ব্যাপারটা বুঝলাম । এখানকার খুব কম মানুষই অন্য ভাষা শিখেছে । তাই ধারা শিখেছে তারা তো মূল্যবান হবেই । এইসময় একটু খসখসে অথচ সুন্দর গলা কানে এল, ‘আপনি কোথেকে আসছেন ।’

আমি ঘাড় ঘুরিয়েই মূখ্য হলাম । এত সুন্দরী মেয়ে এই শহরে আছে ? আহা শহরটাই যেন সুন্দরতর হল । মেয়েটি আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে । বিনীত গলায় বললাম, ‘ভারতবর্ষ ।’

মেয়েটি এক মুহূর্তে চিন্তা করে নিল, তারপর খুব নিরাসক্ত গলায় বলল, ‘যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার সমস্যাটা জানতে পারি ?’

আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ‘উনি একজন গাইড চাইছেন আমাদের শহরটাকে দেখবেন বলে । কিন্তু ওর পকেটে যা আছে তাতে— ।’ যেন একটুকরো ভাঙ্গা হাসি আমার সুতোটাকে কেটে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ।

‘গাইড আপনার পক্ষে খুব দামী হয়ে যাচ্ছে ?’

‘হ্যাঁ, এই মুহূর্তে । আমি অনেক জায়গা ঘুরে দেশে ফিরতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসে পড়েছি । আমাকে আবার পাঁচবছর পরে এখানে আসতে হবে । তখন শুরু করব এই শহর দিয়েই যাতে টাকা পয়সা কোন সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায় ।’ আমি ঘোষণা করলাম ।

মেয়েটি এবার চুপচাপ ক্রি়া শেষ করল । মাথায় একরাশ সোনালী চুল, চোখ-দুটো আশ্চর্যভাবে গভীর । মুখের আদলে একটা নরম আনন্দ । কিন্তু তার সঙ্গে কেমন একটা বিষন্ন ছায়া চিবুকে এবং চোখে জড়ানো । পায়ের পাতা ঢাকা এক কাপড়ের তিলে পোশাক মেয়েটির শরীরকে আড়াল করেছে । কোমরের কাছে একটা ফিতে সরু হয়ে এঁটে আছে, দুই কাঁধে পোশাক দুই বাঁধনে আটকানো । মেয়েটির বয়স বোঝা গেল না কিন্তু ও যে ভরা যুবতী তা বুঝতে অসুবিধে নেই ।

ক্রি়া খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি রুমালে ঠোঁট মুছলো । সঙ্গেই ঝুলি থেকে একটা আয়না বের করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখে নিল । তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, ‘এই শহরে আমি পঁয়ত্রিশ বছর আছি । শেষবার শহরটাকে দেখেছিলাম কুড়ি বছর বয়সে । অনেকদিন এই শহরটাকে আমার দেখা হয়নি ।’

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম । সেটা লক্ষ্য করেই সে বলল, ‘পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে আমি জন্মেছিলাম ।’

‘ও ।’ মেয়েটি আমার সমবয়সী । অথচ কত ছোট দেখাচ্ছে ওকে ।

‘দেখুন, আজ আমার সারাদিনে তেমন কোন কাজ নেই । আমি যদি গাইড করি তাহলে কেমন হয় ?’ মেয়েটি মিটিমিটি হাসছিল ।

‘আপনি ?’

‘না না ভয় পাবেন না। আমি যখন পেশাদার গাইড নই তখন আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার কথা শুনে মনে পড়ে গেল অনেকদিন এই শহরটাকে দেখা হয়নি, পনের বছর কম সময় নয়। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আপনাকে সময় দেব। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?’ মেরেটি এবার কফির দাম দিচ্ছিল।

আমি বাধা দিলাম, ‘দয়া করে ওটা আমাকে দিতে দিন।’

দাম দিতে হয়নি বলে মেরেটি কিন্তু একটুও বিমর্ষ হয়নি। বলল, ‘আজ সারাদিন যা খরচ হবে তাহলে তা আপনিই মেটাবেন?’

‘সাধ্যমত চেষ্টা করব।’

‘ব্যাস। তাহলে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল।’

এইরকম সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আজ আমার সারাটা দিন কাটবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কখন যে কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা আগাম জানা যায় না বলেই জীবনটা এত সুন্দর রহস্যময়। ঢিলে আলখাল্লায় শরীর ঢাকা স্বেচ্ছা বুরুতে পারছি ওর সম্পদ সাধারণের ঈর্ষার বস্তু। লক্ষ্য করলাম ওর অনেক কুচি দেওয়া পোশাকের বাঁ দিকটা হাঁটু অবধি কাটা, বোধহয় হাঁটাচলার সুবিধার জন্যেই।

চোঁমাথায় এসে মেরেটি দাঁড়াল। ‘প্রথমে আমরা ঠিক করে নিই কোথায় কোথায় যাব! উম্ হ্যাঁ, চলুন, শেষ থেকে শুরুর করি। তার আগে বলুন তো এই বাবদ আপনি কত ব্যয় করতে পারবেন?’

এই প্রথম আমি একটু সন্দেহের চোখে ওকে দেখলাম। সারা পৃথিবী ঘুরি আমি, ঠগ-জোচ্চোরদের নানান ফন্দির কথা আমার জানা আছে। যা পারি তা থেকে কামিয়ে ওকে বললাম। শুনে একটু চিন্তা করে ও রাস্তার পাশে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার গাড়িকে আসতে বলল। গাড়িগুলো অশুভূত। ঘোড়া এবং তার সওয়ার আগে, গাড়িটা বেশ পিছনে। কোচোয়ানের সঙ্গে ওদের ভাষার কথা শেষ করে মেরেটি বলল, ‘উঠুন।’

খুবই ছোটগাড়ি, টুসিটার। মদুখোমদুখি বসতেই হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো।

মেরেটি বড় চোখে তাকাল।

এ চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। বুরুর ভেতর কখনো টলানি শুরুর হয়েছে বুঝিনি, এই মদুহুতে ধরা পড়ল। মদুখ নামিয়ে বললাম, ‘আমরা কিন্তু এখনও আমাদের নাম জানি না।’

সে বলল, ‘নাম? একদিনের জন্যেই তো আলাপ, বিকেল পাঁচটা অবধি। তারপর তো নাম স্মৃতি হয়ে যাবে। আমি আর স্মৃতির স্মৃতি ভারী করতে একটুও রাজী নই।’

গাড়িটা থামল একটা ছোট পাহাড়ের তল্লাহে। এদিকের পাহাড় যেমন হয়, একটাও গাছ নেই। এত নেড়া যে চোখের আরাম হয় না। দূরজনে সেই পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলাম। মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখানে কি দেখার

আছে ?'

‘দেখার কি কিছু থাকে, দেখে নিতে হয় ।’ ও হাসল ।

পাহাড়ী পথটায় মানুষের হাঁটার সন্নিবিধে আছে কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ছে না । বেশ কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে ওপরে উঠতেই গর্জন কানে এল । যত এগোচ্ছি তত সেটা বাড়ছে । এবার আর রাস্তা নেই । এ পাথর ডিঙিয়ে ওই পাথরের খাঁজ ধরে এগোতে হয় । কেউ পথ না দেখালে আমি কোনকালেই এখানে আসতে পারতাম না । শেষ পাথরটার আড়াল সরতেই দৃশ্যটাকে দেখতে পেলাম । পাহাড়ের একটা গহবর থেকে বিশাল জলরাশি রামধনুর মত ছিটকে উঠে এসে আবার বেঁকে নীচের গহবরে ঢুকে গেছে । অর্ধবৃত্ত এই জলের ধারার তলায় স্বচ্ছন্দে দাঁড়ানো যায় । শব্দটি জলের ওঠা পড়ার জন্যেই হচ্ছে । এই বিশাল ধারার রঙ নীল ।

আমি মূগ্ধ চোখে দৃশ্যটি দেখছিলাম । পৃথিবীর কোথাও এমন সাজানো ছবি আমি দেখিনি ! সাজানো কারণ গহবর থেকে বেরিয়ে আর একটা গহবরে প্রবেশের সময় এই বিশাল ধারাটির ক্ষুদ্র অংশও বাইরে পড়ছে না । আবিষ্কার করলাম আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই ।

মেয়েটি বলল, ‘একজন মানুষ প্রতিজ্ঞা করেছিল সে মরবে না, দেবতারা যেমন মরেন না । অনেক সাধনার পর দেবতারা রাজী হলেন । তবে তাঁরা একটা শর্ত দিলেন, সুখ পেতে গেলে দুঃখকে আগে জানতে হবে । মানুষটি বলল, এত সোজা কথা । দুঃখ জানতে আর কষ্ট কিসের । সেদিন থেকেই সে দুঃখ জানতে লেগে গেল । পৃথিবীর সব দুঃখ জানতে জানতে লোকাটির শরীর নীল হয়ে গেল । এত বিষ ধারণ করার ক্ষমতা তার ছিল না । নিজের শরীরের জ্বালা নিবৃত্ত করতে সে এই পাহাড়ের গহবরে আশ্রয় নিল । কিন্তু পাতালও তো পৃথিবীর দুঃখ সইতে পারে না । সে মানুষটিকে ঠেলে ছুঁড়ে দিল শূন্যে । স্বর্গের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে দেবতারা বিপদে পড়লেন । স্বর্গে দুঃখ যদি একবার প্রবেশ করে ! তাঁরা তাড়াতাড়ি মানুষটাকে আবার পৃথিবীর তলায় ঢুকিয়ে দিলেন । সেই থেকে ওই জলের আকার নিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে আবার ডুবে যাচ্ছে ।’

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সব দুঃখ জেনেও মানুষটি অমর হল না কেন ?’

মেয়েটি হাসল, ‘একটা দুঃখ তার জানতে বাকী ছিল । লক্ষ্য করে দেখুন একদম ওপরে অত নীলের মধ্যে একটা সাদা জলের রেখা বইছে । ওইটুকুই ওর অজানা । কিন্তু দেবতারা বললেন তবু সে অমর থাকবে । ততদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এই জলের ধারা বেঁচে থাকবে ।’

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘না জানতে পারা দুঃখটি কি ?’

মেয়েটি বলল, ‘দুটো মানুষের মন অবিকল হয়ে ওঠে না কেন ?’

‘কেন ?’

মেয়েটি হাসল, ‘ওটা তো আমিও জানিনা । ভালোবাসা মানে যদি সুখ তবে তা থেকে এত দুঃখ পায় কেন মানুষ !’

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম নীলজল স্পর্শ করতে কিন্তু মেরেটি পেছন থেকে আমার হাত টেনে ধরল, ‘কি করছেন?’

‘ওই জলে হাত দেব।’

‘পাগল! সাধ করে কি কেউ দৃষ্ণকে ছোঁয়?’

নীচে নেমে এলাম।

মেরেটির হাঁটুতে আমার হাঁটু চ্যারিয়ট ছুটছে। সে এখন শূন্য চোখে বাইরে তাকিয়ে। খুব নরম এবং বিষম দেখাচ্ছে ওকে। ইচ্ছে করছিল ওর একটা হাত দুহাতে নিই। কিন্তু মেরেটির শরীরের চারপাশে একটা ব্যক্তিত্বের বর্ম আছে যা ভেদ করে কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়।

রথ যেখানে এসে থামল সেটা একটা উদ্যান। মেরেটি বলল, ‘আসুন, এবার আমরা অনন্ত যৌবন দেখব।’

বিস্মিত এবং আগ্রহী হয়ে মেরেটিকে অনুসরণ করলাম। চারপাশে অজস্র ফুল। পৃথিবীর সব রঙ উজাড় করে তাদের সাজানো হয়েছে। এদের অনেককেই আমি চিনি না কিন্তু ফুল কি কখনো অনায়াস হয়? মেরেটি বলল, ‘এদের কোন গন্ধ নেই।’

‘নেকি! এত সুন্দর তবু গন্ধ নেই?’ বলতে বলতে অবিশ্বাসে গোলাপের বদিকে নাক রাখলাম। না, মেরেটি ঠিকই বলেছে।

বললাম, ‘একটাও মোঁমাছি কিংবা ভ্রমর দেখছি না কেন?’

মেরেটি জবাব দিল, ‘কারণ এই সুন্দর ফুলেদের বদিকে মধুও নেই।’

যে ফুলের গন্ধ এবং মধু নেই সে কেমন ফুল? কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চোখ সরতে হয়। মেরেটি হাসল, ‘এই হল অনন্ত যৌবন।’

‘কি রকম?’

‘স্বর্গের অস্বরীরা লুকিয়ে চুরিয়ে আসতো পৃথিবীতে। হয়তো রক্ত মাংসের মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে তাদের ভালো লাগতো। দেবতাদের তো সব আছে শুধু রক্ত মাংস নেই। তাই বোধহয় মধু বদলাতো অস্বরীরা। একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। দেবতারা বললেন, ‘বেশ তাই হোক, তোমরা পৃথিবীতেই থেকে যাবে।’

অস্বরীরা বলল, ‘তাই যদি হয় তাহলে আমাদের যৌবন কেড়ে নিও না।’

দেবতারা বললেন, ‘অবশ্যই। তোমরা অনন্ত যৌবন পাবে।’

অস্বরীরা এখানে এসে দেখল তাদের মানুষ-প্রেমিক প্রকৃতির নিয়মে বড়ো হচ্ছে, মরে যাচ্ছে কিন্তু তারা একই থেকে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য প্রেমিকের ছেলেরা যুবক হয়ে আবার তাদের সঙ্গে প্রেম করছে। তখন তাদের দেবতারা এখানে এই ফুলের চেহারায় সাজিয়ে দিল। যে যৌবন অনন্তভাবে কোন রহস্য নেই। অনেক বলেই দেওয়ার ক্ষমতা শূন্য। সে শুধুই শোভা তাই ভ্রমর আসে না, সুবাস ছড়ায় না। এই যৌবনের অন্য নাম অভিশাপ।’

আমি হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলতে গেলাম, মেয়েটি বাধা দিল, ‘কি করছেন ! সাধ করে কি কেউ অভিশাপ নিয়ে যায় ?’

দেশলাই কাঠি জ্বলতে জ্বলতে শেষ পর্যন্ত আগুনের স্পর্শ লাগল আগুনে। সময় ফুরিয়ে আসছে। আজ আমি জীবনের অন্য এক আলো দেখতে পেলাম। এখানে না এলে এদেখা হতো না। এই মৃত শহরে এত জীবন গচ্ছিত ছিল ?

মেয়েটিকে যত দেখছি তত মন্থতা বাড়ছে। দুপুরে একসময় সে আলখাল্লা খুলেছিল স্বস্তি পাওয়ার জন্যে। তার তলায় পা ঢাকা ঢিলে সিলেকের জামা। সুন্দর এবং রুচিময়। কিন্তু তার যৌবন যে টলটলে তা বুঝে আমি ক্রমশ উত্তাল হচ্ছিলাম। কি করে মেয়েটিকে বলি আমি তাকে কামনা করছি ! কি করে ওর মন পাওয়া যাবে ? মন পেলেই শরীর সহজেই আসবে। যেহেতু আমার পকেটে কিছু নেই তাই আগামীকাল ফিরে যেতে হবেই। থাকলে নিশ্চয়ই ওকে পেতে চেষ্টা করতাম মদ্য ঘষছে বৃক। মেয়েটি কি আমার মনের কথা বুঝেছে ? না হলে সে অমন করে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে কেন ? ওর বৃকের ভাঁজ যে আমাকে দমবন্ধ করে দিচ্ছে ! ওকি তা বুঝে না ? বোধহয় বুঝে বলেই এমন করেই বোঝা চাপায়।

বিকেল নাগাদ আমরা শহরের মাঝখানে ফিরে এলাম। এখন বেশ ব্যস্ততা চারপাশে। একটা ছোট পাঁচিলের আড়ালে ওটা কি কোন মন্দির। মেয়েটি বলল, ‘আর আমার সময় নেই। পাঁচটা বেজে এল। চলুন, এইটে দিয়ে আমাদের দেখা শেষ করি।’

চাতালের মধ্যে বিরাট একটা মূখ। এ মূখ মানুষেরও নয় আবার পশুরও নয়। একই সঙ্গে হিংসা, ভয়, আনন্দ এবং কান্না মেশানো রয়েছে অভিব্যক্তিতে। চমকে সরে আসতে হয় আবার সরেও যাওয়া যায় না। তিনমানুষ লম্বা একটা পাথরের চাঁই কেটে যেন মূখটাকে তৈরী করা হয়েছে। তার মূখের গহবরে অন্ধকার। মেয়েটি বলল ‘এর নাম মহাকাল।’

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম।

মেয়েটি বলল, ‘আমরা বিশ্বাস করি ওর মূখের ভেতর হাত রেখে যদি কোন কিছু প্রার্থনা করা যায় তাহলে অবশ্যই তা পূর্ণ হবে।’

অবিশ্বাসে তাকালাম, ‘সত্য ?’

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, ‘বিশ্বাসই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।’

আমি শিহরিত হলাম। বেশ, এবার পরীক্ষা হয়ে যাক। এই মুহূর্তে আমি মেয়েটিকে ছাড়া তো আর কিছুই কামনা করতে পারি না। মেয়েটি বলল, ‘অনেকদিন এখানে আসা হয়নি। আপনি কিছু প্রার্থনা করবেন !’

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মহাকালের মূখে হাত রাখলাম। শীতলতম এ কোন স্পর্শ প্রার্থনা সেরে ফিরে আসতেই মেয়েটি এগিয়ে গেল। তারপর চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে সে তার প্রার্থনা সেরে নিল।

বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি বলল, ‘এবার আমাকে যেতে হবে। আপনি কি হোটেল ফিরতে পারবেন?’

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

সে বলল, ‘যদি কিছু মনে না করেন তাহলে জানতে পারি কি আপনি কি প্রার্থনা করলেন?’

আমি ঘাড় নাড়লাম, ‘নিশ্চয়ই। আমি পাঁচ বছর পর এই শহরে আসব। প্রার্থনা করলাম, তখন যেন আমি একমাত্র আপনার দেখা পাই।’

মেয়েটি যেন কেঁপে উঠল। তারপর অশ্রুত মায়াবী চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামাল। তার ঠোঁট দাঁতের তলায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কি প্রার্থনা করলেন জানব?’

মেয়েটি মুখ ফেরালো। ওর বুক নড়ে উঠল। তারপর বলল, ‘প্রার্থনা করলাম আজ থেকে যেন প্রতি রাতে তিনজন খন্দের পাই।’

চমকে উঠলাম।

মেয়েটি হাসল, ‘পাঁচবছর পর যখন আপনি আসবেন তখন আপনার বয়স মাত্র পাঁচ বছর বাড়বে। কি আর এমন। কিন্তু আমার যে পনের বছর বেড়ে যাবে। আপনার একটা রাত মানে যে আমার তিনটে রাত।’

জন্মবৃত্তান্ত

‘একটু আশ্তে হাঁটো !’

‘ঠিক আছে ।’

‘উঁহু ঠিক নেই । অত জোরে হাঁটা এইসময় ঠিক নয় । বরং চলো, ওই বেণুটার বসি ।’

‘না, ওখানে কে একজন বসে আছে ।’

‘থাকুক, তাতে আমাদের কি এসে গেল । আজ অনেক হাঁটা হয়েছে ।’ সুনীত নীপার হাত ধরতে চাইলে সে ছাড়িয়ে নিল । এখন রাস্তার আলো জ্বলে গেছে । শীতের আকাশটা ময়লাটে । চারধারে একটা ধোঁয়াটে ভাব । সুনীত দেশবন্ধু পার্কের মাঝখানে যে ফিনফিনে অন্ধকার সেখানে চোখ রাখল, ‘শালা, উত্তর কোলকাতায় বেড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই । আমাদের গাড়ি থাকলে তোমার গাড়ের মাঠ কিংবা লেকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম ।’

‘থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না ।’ নীপা চাপা গলায় বলল ।

‘আদিখ্যেতা ? এটা আদিখ্যেতা হল ? ডাক্তার তোমাকে রোজ বেড়াতে বলে নি ?’

‘ওসব ডাক্তাররা বলেই থাকে । তুমি এমন করছ যেন আর কারো—’

নীপা কথাটা শেষ করল না । ওরা বেঁগের কাছে এসে গিয়েছিল । একজন বৃদ্ধ বিহারী সেখানে বসে আছে দেখে সুনীত নিশ্চিন্ত হল । এইসময় বেশীক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে নীপার অসুবিধে হয় । সুনীত ঠিক করল দশ মিনিট বসেই বাড়ি ফিরবে । এখান থেকে ওদের ফ্ল্যাট বেশী দূরে নয় । টু-রুম ফ্ল্যাটটার একটাই সুবিধে, সুন্দর দক্ষিণমুখো ব্যালকনি আছে । ইদানীং নীপা বিকেলে বেরুতেই চায় না । রাস্তার লোকরা নাকি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে । সেটা অবশ্য সুনীতেরও চোখ এড়ায়নি । ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তখন । কিন্তু কিছু করার নেই । মানুষ তার অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা খুব দ্রুত ভুলে যায় ।’

এই সময় নীপার কাছে কারো থাকা উচিত । এখন অশিষ্ট বসে খুব চিন্তা হয় । সুনীতের মা নেই, দিদিরা দিল্লীতে । দূর সম্পর্কের এমন কোন আত্মীয়া নেই যাকে এই সময় আনা যায় । আর নীপা তো ওর খুঁপের বাড়িতে মাঝেই না । রেজিস্ট্রী করে বিয়ে হবার পর তাঁরাও সম্পর্ক রাখেননি । এতদিন কোন মর্শাকিল হয়নি । বরং কেউ নেই বলে খুব ভালো লাগত । শব্দ অফিসটরু ছাড়া ওদের ছাড়াছাড়ি হয় না । নীপাকে এই দূরত্বের ধরে দারুণ ভালোবেসেছে সুনীত । সে সময় আর কারো উপস্থিতি অসহ্য হতো ।

‘এই তুমি রোজ রোজ অত ফলমূল আনবে না !’ নীপা চাপা গলায় বলল।

কেন ?’

‘বন্ড বেশী খরচ করছ। সামনে আরো বড় খরচ আসছে।’

‘সে আমি বুঝব। ডাক্তার সেন বলেছেন এই সময় মেয়েদের শরীরে রক্ত কমে যায়। অ্যানিমিয়া হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না।’

‘আমি কি না খেয়ে আছি ? আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে।’

সুনীত নীপার হাতটা ধরল, ‘উঁহু, অ্যান্ডিন তুমি নিজের জন্য খেতে আর এখন আর একজনের কথা ভাবতে হবে।’

নীপা সঙ্গে সঙ্গে চিমাটি কাটলো, ‘অসভ্য !’

সুনীতের ব্যথা লাগলেও হাসল। ‘বাই বলো, যত দিন যাচ্ছে তুমি সুন্দর হচ্ছে।’

‘ছাই !’ নীপা মুখ তুলে আকাশ দেখলো, ‘আচ্ছা, আমি যদি নাসিংহোম থেকে না ফিরি তাহলে তুমি ওকে ভালোবাসবে ?’

সুনীত মুখ ফিরিয়ে নিল। সম্প্রতি এই এক বদলি হয়েছে। শুনলেই বৃকের মধ্যে ক্ষরণ শব্দ হয় সুনীতের। প্রথম প্রথম প্রবল। প্রতিবাদ করত, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি যদি না ফিরি তাহলে এই শাড়িগুলোর কি হবে ? আমি যদি না ফিরি তাহলে এই খাটে প্লিজ শয়্যানা ; এই শোন, আমি যদি না ফিরি তুমি আবার বিয়ে করবে ? এইসব শুনতে শুনতে এক ধরনের বিষাদে ডুবে যায় সুনীত। মাঝে মাঝে মনে হয় এইসব শুনতে হবে জানলে কে সন্তান চাইতো। কিন্তু শোনার জন্যেই বোধহয়, মাঝে মাঝে সুনীতেরও মনে হয় যদি তেমন ঘটনা ঘটে ? কি করে সহ্য করবে সে ? নীপা নেই একথা ভাবা যায় না। কাগজপত্রে পড়েছে এখন শিশুমৃত্যুর হার খুব কম এবং মায়েরা হাজারে একজন দুর্ঘটনায় পড়ে। সেই একজন যদি নীপা হয় !

সুনীত উঠল, ‘চলো।’

অনুভূত সুন্দর হাসল নীপা, ‘রাগ করলে ?’

‘না, কথাটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগল।’

‘তোমরা ছেলেরা সব পার। আমার মেশোমশাই মাসীমা মারা যাওয়ার ছ’মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলেন। ছোট বাচ্চা থাকলে তাকে দেখাশোনার দায়িত্বই দেয় সবাই।’

‘সে যে করে সে করে, আমাকে দলে ফেলছ কেন ?’

নীপা উঠল। তারপর খুব ধীরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘নাগো, তোমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু ভয় হচ্ছে খুব।’

‘কেন ?’

‘কদিন আগে যেন মনে হল কিছন্নড়ছে।’

‘কোথায় ?’

‘আঃ। কোথায় আছে জানো না ?’

সদনীত খতমত খেল। নীপার শরীরের সব কিছুর সে জানে। কোথায় হাত রাখলে কাতুকুতু লাগে কোথায় হাত দিলে আরাম পায়—সব। কিন্তু এই কথাটা জানা ছিল না তো। সে একটু উদ্ভ্রাণ গলায় বলল, ‘ডাক্তারকে বলেছ?’

‘তখন হয়েছিল নাকি? খুব সামান্য।’

‘উঁহু ভাল কথা নয়। এখনই নড়ানিড়ির কি আছে।’

‘রাখো তো! তুমি কিছুর জানো যে মাথা ঘামাচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটের মাসীমা বলেছেন এই সময় নাকি শরীর হয়।’

‘কালকেই চলো ডাক্তার সেনের কাছে।’

‘এখনও তো মাস শেষ হয়নি।’

‘তা হোক।’

প্রত্যেক মাসের এক তারিখে সদনীত নীপাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সেই তৃতীয় মাস থেকে এই চলছে। ডাক্তার সেনের মন্থতা মনে পড়লেই বন্ধুর ভেতরটা অবশ্য চিনচিন করে। ব্যাটা প্রণবের পাল্লায় পড়ে এই দুরবস্থা। এমন করে প্রশংসা করতে লাগল ডাক্তারের যেন ধন্বন্তরি। নিজেরই নাসিংহোম, কোন অসুবিধে নেই। তা অবশ্য সদনীতদের ফ্ল্যাট থেকে নাসিংহোম রিকশায় মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু ওর ইচ্ছে ছিল কোন মহিলা গাইনিকে দিয়ে কাজটা করায়। নীপাও তাই চেয়েছিল। প্রথম দিন ডাক্তার সেনের কাছে গিয়ে নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ভিজিটার্স রুমে অন্তত গোটা দশকে মা হতে যাওয়া মহিলা অপেক্ষায় ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা রয়েছেন। শরীরের গড়নের জন্যে তৃতীয় মাসে নীপাকে কিছুর বোঝা যায়নি। কিন্তু ওদের মধ্যে বসে থাকতে রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছিল। টেবিলের ওপর জড়ো করা ম্যাগাজিনের একটা তুলে নিয়ে আড়াল করেছিল নিজেকে। আর মজার ব্যাপার, ওইসব মহিলারা সবাই নীপা এবং ওকে দেখছিলেন। ডাক্তার সেনের ঘরে যখন ডাক এল তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সে।

ঘরের ভেতর নীলচে আলো এবং মোটাসোটা নার্স। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ডাক্তারের বয়স এবং বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা। চশমার আড়ালে চোখ দুটো বেশ ঝকঝকে এবং ঠোটে সর্বদাই হাসি ঝোলানো। ওদের বসতে বলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বলুন?’

সদনীত নীপার দিকে তাকালো। মন্থ নামিয়ে বসেছে ও। সদনীত গলা পরিষ্কার করল, ‘আমাদের দু’বছর বিয়ে হয়েছে এই প্রথম।’

‘আচ্ছা! কি নাম আপনার?’

স্লিপে সদনীত নিজের নাম লিখেছিল। ডাক্তারের প্রশ্ন যদিও নীপার উদ্দেশ্যে কিন্তু সে চটপট জবাব দিল ‘নীপা মিত্র।’

ডাক্তার একবার সদনীতের দিকে তাকিয়ে আবার নীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘শেষ কবে।’

নীপা মৃদু তুলছিল না। ডাক্তার সেন হাসলেন, ‘লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনি নিঃসঙ্কেচে কথা বলুন।’

সুনীত উত্তর দিল, নিজেই সময়টা জানিয়ে দিল। সেটা শোনার সময় কি ডাক্তারের মূখে একটু বিরক্তির ভাঁজ পড়েছিল? বোঝা যায় নি, সুনীত কিন্তু সেই মৃদুত থেকে ডাক্তারকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। তারপর কয়েকবার নিয়মিত ব্যবধানে শ্রুত্ব যাওয়া আসা। পরের দিকে নীপা অনেকটা স্বচ্ছন্দ। ডাক্তার বেশ জমিয়ে কথা বলেন। ওঁরই নার্সিংহোমে নীপার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু শেষবার সুনীতকে বেশ অস্বস্তি নিয়ে ফিরতে হয়েছে। নীপাকে একটা মেয়েলি প্রশ্ন করতে বেচারি খতমত হয়ে গিয়েছিল দেখে সুনীত নিজেই জবাবটা দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল, ‘মিস্টার মিত্র, আমি ওকে প্রশ্ন করছি তাই ওঁর মৃদু থেকেই জবাবটা শুনতে চাই।’

বেরিয়ে এসে নীপা বলছিল, ‘তুমি খামোকা কথা বলতে যাও কেন?’

‘বাঃ, তুমি উত্তর দিচ্ছ না আর আমি জানি তাই।’

‘জানলেই বলতে হবে? শোভন অশোভন বলে কিছু নেই?’

নীপার কথাটা শুনে ডাক্তারের ওপর তার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। নীপার মনের সমস্ত আনাচ-কানাচ, শরীরের সব রকম রি-অ্যাকশন সে মতটা জানে নীপা ততটা জানে কিনা সন্দেহ। অতএব সে কথা বললে দোষ কি? যেহেতু নীপা সুন্দরী তাই ওর সঙ্গে কথা বলার মতলব লোকটার। এই জন্যই সর্বপ্রথম ওর লেডি ডাক্তারের কথা মনে এসেছিল। ব্যাটা প্রণবের জন্য। অন্য সময় হলে কি করত ঠিক নেই কিন্তু এখন অপমানটা হজম করতে হল। নীপা এর মধ্যে কোন অন্যান্য দেখতে পাচ্ছে না সেটাই আশ্চর্যের কথা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে সুনীত ঘরে ঢুকল। ইদানীং, রাত্রে রান্নার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে ওরা। শ্রুত্ব রুটিটা করে নেয় নীপা। কিন্তু বাকী কাজ সব সুনীত করে। অনেক কষ্টে নীপাকে এটা মানতে বাধ্য করেছে সে। একে শীতের সময় তারপর এই অবস্থায় নীপাকে দিয়ে পরিশ্রম করাতে চায় না সে। নীপা অবশ্য সামনে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। গরীব দুঃখীদের তো করতেই হয়। কত গল্প শোনা গেছে, ধান কাটতে কাটতে বেদনা উঠল, মেয়ে নিজেই মেরে গিয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে এসে আবার ধান কাটতে লাগল। কিন্তু এসেছে ভুলবার পাত্র সুনীত নয়। কোন ভারি জিনিস তুলতে দেয় না, এমন কি পারবে নীপার নিজস্ব কাজেও হাত বাড়ায়।

নীপা শ্রুত্বছিল। ঘরে নীল আলোটা জ্বলছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল সুনীত। শীতের হাওয়ার জন্যে সব কটা জিনিস বন্ধ। এই বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া নীপার ক্ষতি করতে পারে। কোথায় যেন পড়েছিল গভর্নমেন্ট ব্রুগ নাকি সিগারেটের ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয়। কথাটা মনে আসতেই সুনীত সিগারেট টেবিলে রেখে সটান নীপার কাছে চলে এল, ‘কি হয়েছে?’

চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল নীপা, সামান্য হাসল, 'কেন ?'

'অমন করে শূন্যে আছ ?'

'এমনি ।'

সদুনীত খাটে বসে নীপার খোলা পায়ের পাতায় হাত রাখল । কেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে । চমকে পা সরিয়ে নিল নীপা, 'ইস্, ছি ছি, পায়ের হাত দিচ্ছ কেন ?' কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'কি যে কর ।'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

'একটু ।'

'আগে জানলে—!'

'কি ?'

'এসব চাইতাম না ।'

'পাগল ! তোমার ওপর খুব চাপ পড়ছে অবশ্য ।'

'মোটাই না ।' সদুনীত ঝুঁকে পড়ে নীপার গলায় চুমু খেল । ওখানে চুমু খেলেই নীপার চোখ বন্ধ হয়ে যায় । হাত আপনি উঠে আসে সদুনীতের পিঠে । সেই অবস্থায় সদুনীত বলল, 'তোমার ছেলে আর কষ্ট দিচ্ছে না তো ?'

'ছেলে ?'

'যে নড়িছিল ?'

'ছেলে ভাবছ কেন ? মেয়েও তো হতে পারে ।'

'তুমি তো ছেলেই চেয়েছিলে ।'

'চাইলেই কি সব পাওয়া যায় ?'

'যায় । যে চাইতে জানে তার নাকি কোন অভাব হয় না ।' হেসে সদুনীত বলল কথাটা । তারপর মৃদু সরিয়ে নিয়ে আলতো করে নীপার পেটে কান রাখল । নীপা মাথাটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না । তারপর হাল ছেড়ে দিল । শোয়ার সময় নীপা একটু আলগা হয়ে শোয় । শরীর বড় হবার পর আর আঁটোসাঁটো হয়ে থাকতে পারে না । সদুনীত সেই মসৃণ পেটের ওপর কান রাখল । না, কোন তৃতীয় সত্তার উপস্থিতি টের পাচ্ছে না । বেশ কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর সে হতাশ গলায় বলল, 'কই, কিছু নড়ছে না তো ।'

'নীপা হাসল, 'তুমি আড় পেতেছ জেনে চুপ করে গেছে । তোমারই ছেলে তো ।'

রিকশার রাস্তা কিন্তু ট্যান্ডি নিল সদুনীত । এখন সামান্য ঝাঁকুনি মোটেই সুখকর নয় । নীপাকে দেখে ড্রাইভার আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেল এটা বুঝতে পারল ওরা । মাড় দেওয়া সদুনীতের শাড়ি পরেছে নীপা, এতে নাকি আরও অনেক বাড়ে । ট্যান্ডিতে বসেই নীপা চোখ বন্ধ করে চোখ চাপল ।

'কি হল ?' সদুনীত ওর হাত চেপে ধরতেই নীপা হাসবার চেষ্টা করল, 'কিছু না ।' তারপর একটু বাদেই সহজ হল ।

সুনীতের ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। আজ অফিসে গিয়ে প্রণবকে ঘটনাটা বলেছে। প্রণব হেসেছিল, ‘এ রকম তো হবেই, পেটের ভেতর বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়বে না? তবে তোমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেন একটু আর্লি হচ্ছে।’

‘তাই বা হবে কেন? কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না তো? এই চিন্তাটা ক্রমাগত সুনীতের মাথায় পাক খেতে লাগল।

ভিজিটার্স রুম দেখে আজও মেজাজ খিঁচড়ে গেল। এত লোকের একসঙ্গে বাচ্চা হয়? প্রণবের কাছে শুনছে, সভা মানদ্বারা নাকি শীতকালেই সন্তান জন্ম দিতে পছন্দ করে আজকাল। তাই? এখন নীপা এখানে অনেক স্বচ্ছন্দ। কয়েকবার এসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নতুন কোন মেয়ে এলে সেই হাসি চোখে তাকায়।

ডাক এলো আটটা নাগাদ। ডাক্তার সেন টেলিফোনে কথা বলছিলেন। ওদের ইঙ্গিতে বসতে বলে কথা শেষ করলেন। তারপর সেই মিনিট ঠোঁটে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি ব্যাপার? আপনাদের কি আজকে আসার কথা ছিল?’

সুনীত বলল, ‘না। কিন্তু একটা প্রবলেম হওয়াতে—’

‘প্রবলেম? কি হয়েছে আপনার?’ ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল। নীপা সুনীতের দিকে তাকাল। কিভাবে কথাটা বলবে বুঝে উঠছিল না বোধহয়। সুনীত বলল, ‘পেইন ফিল করে। ভেতরে বোধহয় নড়ছে।’

ডাক্তার সেন কিছুক্ষণ সুনীতের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর নীপাকে বললেন, ‘হচ্ছে আপনার কণ্ঠ আর আমি ওঁর মূখে শুনছি। সেই চালু কথাটা যেন না শুন, আপনার পেইন উঠলে উনি আপনাকে জানিয়ে দেবেন। ভেতরে আসুন।’

ডাক্তারের চেয়ারের পেছনে আর একটা ঘরের দরজা। নীপাকে ইশারা করে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। নার্সিটি এবার ডাক্তারকে অনুসরণ করল। নীপা ইতস্তত করছে দেখে নার্স বলল, ‘কি হল? চলে আসুন।’

নীপা উঠে দাঁড়াতে সুনীতও উঠল। ভেতরে নীপার কি দরকার তা ওর বোধগম্য হচ্ছিল না। নীপার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত যেতেই নার্স বলে উঠল, ‘আরে, আপনি আসছেন কোথায়? যান, চেয়ারে বসে থাকুন।’

সুনীত দেখল ডাক্তার একটা পাতলা গ্লাভস পরছেন। ঘরের ভেতর ছোট্ট কিন্তু উঁচু খাট এবং জোরালো আলো রয়েছে। কথা বলতে গিয়েও সে ফিরে আসল। নীপাকে ওই ঘরে একা ছেড়ে আসতে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। শেষে চেয়ারে বসতেই নার্স ঘরের পর্দা টেনে দিল। সুনীত প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো। এইরকম ব্যবহার সে মোটেই আশা করেনি। স্ত্রীমণী হিসেবে স্ত্রীর সঙ্গে থাকার তার সব সময় অধিকার আছে।

কয়েকটা টান দেবার পর আচমকা নড়ে উঠল সুনীত। কানের পর্দায় এখনও নীপার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা আছাড় খাচ্ছে। তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা হয়েছে নীপার। সে কী ওই ঘরে যাবে। একটু শ্বিথা করে সে কান পাতল।

না, আর কোন শব্দ হচ্ছে না। কয়েক মৃদুহৃৎ বাদেই পদাটো সরিয়ে নীপা বেরিয়ে এলো। মুখে রক্ত জমেছে, চোখ নিচের দিকে ফেরানো হাঁটছে খুব কষ্টে আড়ষ্ট পায়ে। সুনীত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরল। নীপার হাত ঠান্ডা, খুব নাভাস হয়ে পড়লে ওর এমনটা হয়। সুনীত জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

নীপা মাথা নাড়ল, কিছু হয়নি।

‘কিন্তু তুমি চিৎকার করলে কেন ?’

‘চুপ করো।’ নীপার গলায় ধমক না অনুরোধ ?

এইসময় ডাক্তার তোয়ালেতে হাত মূছতে মূছতে বেরিয়ে এলেন। মুখে সেই হাসি যা দেখলে পিঁপ্টি জ্বলে যায় সুনীতের, ‘না, সব ঠিক আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে মনে হচ্ছে আপনারা ডেট গোলমাল করেছেন।’

সুনীত বলল, ‘না, মানে আমরা তো বেশ নিশ্চিত।’

ডাক্তার সেন প্যাডে কিছু লিখতে লিখতে বললেন, ‘আপনারা লাস্ট যেটাকে ধরছেন সেটা ফলস্ হতে পারে। আমি এই ওষুধগুলো লিখে দিলাম, আজ রাত থেকেই পারলে খাওয়াতে শুরুর করুন।’

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে সামান্য দেখে সুনীত একটু নাভাস গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে ওর ?’

‘কিছুই হয়নি। রক্ত দরকার শরীরের, মাথা ঘোরে বললেন, সেটাও। তবে মনে হল ওর পেলভিস বোন ছোট আছে। সেক্ষেত্রে ডেলিভারির সময় আমাদের অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।’

‘সিজার ?’ প্রায় আতঁনাদ করল সুনীত।

ডাক্তার বললেন, ‘সেকি ? আপনি অত নাভাস হচ্ছেন কেন ? বিদেশে এখন মায়েরা নিজে থেকেই সিজার করাতে চান। নর্মাল ডেলিভারির চেয়ে ওটা কম কষ্টকর এবং ফিগার ঠিক থাকে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা নর্মালের জন্যে চেষ্টা করব প্রথমে—।’

‘কিন্তু আপনি সিজার হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন কি করে ?’ সুনীত অনুভব করল ওর দুটো পা কেমন নিঃসাড়।

ডাক্তার সেন এবার ধীরে ধীরে বদ্বিষিয়ে দিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়। তবে সব কিছুই প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া। প্রথমে ধরে নেওয়া হয় নর্মাল ডেলিভারি হবেই। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে তবুও এই প্রশ্ন আসে। অতএব এখনই এই নিয়ে চিন্তা করবার কিছু নেই।

প্রায় নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলো সুনীত ; সঙ্গে আড়ষ্ট নীপা। এই লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো ? সুনীত শুনেছে অনেক নর্মাল ডেলিভারির কেসও নাকি ডাক্তাররা পয়সার লোভে সিজার করে থাকে। কথটার সত্যাসত্য যাচাই করার পথ তার জানা নেই। এই ডাক্তার সেরকম কিছু করছে কি না কে বলতে পারে।

ট্যান্ডিতে উঠেই সে জিজ্ঞাসা করল, ‘তখন কি হয়েছিল ?’

নীপা প্রশ্ন করার সময় তাকিয়েছিল, শব্দে চট করে বাইরের দিকে মূখ ঘোরালো। সুনীত লক্ষ্য করল ওর ঠোঁটের একটু হাসি চলকে উঠল। ওরকম আত্ম চিৎকারের পর এই হাসি আসে কি করে বুঝতে না পেরে সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এই, কথা বলছ না কেন?'

নীপা মূখ ঘুরিয়েই বলল, 'জানি না যাও।'

সুনীত খুব হতাশ হল, 'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

নীপা এবার সহজ হতে চেষ্টা করল, 'ইন্টারন্যাশনাল পরীক্ষা করছিল। আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম তাই!'

সঙ্গে সঙ্গে সুনীতের চোখাল শক্ত হয়ে গেল। ইন্টারন্যাশনাল পরীক্ষা? ওর চোখের সামনে ডাক্তারের গ্লাভস পরা হাত ভেসে উঠল। সে নীপার দিকে আবার তাকাল। আজ অবধি সে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ নীপার শরীরে হাত দেয়নি। আর ওই লোকটা তারই কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার স্ত্রীর— মাথা ঘুরে গেল সুনীতের। বন্ধুবান্ধব কেউ বলেনি ডাক্তাররা এসব করে। কাউকে একথা জিজ্ঞাসাও করা যাবে না। হাসপাতালে যাদের বাচ্চা হয় তাদের নিশ্চয়ই এইরকম অভিজ্ঞতা হয় না। সুনীত ঠিক করল, কোন লেডি ডাক্তারকে টেলিফোন করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে এটি অবশ্যই করণীয় কিনা! সে নীপার দিকে তাকাল। নীপার মূখ এখন অনেকটা অস্বাভাবিক। আশ্চর্য! একটি স্ত্রী পরপুরুষ কিছুদ্ধাগে এমন আচরণ করা সত্ত্বেও এমন স্বাভাবিকভাবে আসে কি করে? সুনীত এর আগের সাক্ষাৎকারগুলোর কথা ভাবতে লাগল। না, ডাক্তার এবং নীপার মধ্যে সামান্য গোলমাল সে দ্যাখেনি। তাহলে নীপার সমস্ত শরীর বা কিনা সুনীতের একদম নিজস্ব তা অন্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও নীপা এমন নির্বিকার কেন? হ্যাঁ, তখন চিৎকার করেছিল বটে, আড়ষ্ট পায়ে লজ্জিত হয়ে হেঁটেও ছিল, কথাও বলতে পারেনি বেশ কিছুক্ষণ। ব্যাস! তারপরই তো যে কে সেই।

বাড়ি ফিরে সুনীত প্রথম কথা বলল, 'শোন, এই ডাক্তারকে আমার ভাল লাগছে না।' নীপা জামা কাপড় ছাড়বে বলে এগোচ্ছিল, থেমে গেল।

'কেন!'

মনে হচ্ছে কোন গোলমাল আছে। তুমি পাশের ফ্ল্যাটের মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করো তো এইসময় ইন্টারন্যাশনাল একজামিনেশন করে কি না! সুনীত চেয়ারে বসে ব্যালকনির দিকে মূখ করে কথাটা বলল।

নীপা হেসে ফেলল, 'কি পাগলের মত যা তা বকছ!'

সুনীত কঠিন গলায় বলল, 'তুমি এতে খুশি হতে পার কিন্তু আমার কণ্ঠ হচ্ছে।'

'কি বললে?' নীপার গলা তীক্ষ্ণ হল।

'একটা লোক তোমার শরীরের ভেতরে হাত দিচ্ছে অথচ তোমার কোন

রি-অ্যাকশন নেই? তাজ্জব ব্যাপার।' সুনীত ঝাঁঝিয়ে উঠল।

‘ছি ছি! তোমার মন এত নীচ!’ নীপা কাঁপছিল।

‘ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুর জানো তুমি? এইসময় ঐ রকম পরীক্ষা করাটা নিয়ম। তাতে পরে বিপদে পড়তে হয় না। আর তুমি একজন ডাক্তারের ওপর জেলাস হচ্ছে? রি-অ্যাকশন! মেয়েরা শরীরে কোন পদ্রুকের স্পর্শ পেলেই বদ্ব্যবহারে পারে তার মন কি বলছে। উনি পরীক্ষা করলেন অথচ আমি এরকম নির্লিপ্ত হাত এর আগে দেখিনি। যে মানুষ আমার উপকারের জন্য কর্তব্য করেছেন আমি তাকে খারাপ ভাবব কেন? আসলে তুমি আমাকে সন্দেহ কর। তোমার মনে অন্ধকার। ছি ছি!’

শেষের দিকে কথাগুলো এমন উঁচু পর্দায় উঠে গেল যে বিরত চোখে সুনীত মুখ ফিরিয়ে ছিল। আর তখনই নীপা দ্রুত হাতে নিজের মাথা ধরে টলতে লাগল। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে এক লাফে সুনীত এগিয়ে এসে যদি নীপাকে জড়িয়ে না ধরতো তাহলেই দ্রুত টানাটা ঘটে যেত। সুনীত চিৎকার করে নীপাকে ডাকল। এখন ওর বন্ধুর কাছে নীপার মুখ নিঃসাড়ে নেতিয়ে রয়েছে। দাঁতে দাঁত আঁটা, শরীর শিথিল। কোনরকমে সে নীপার শরীর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কয়েকবার ডাকল। নীপার কোন সাড়া নেই। বন্ধুর মধ্যে কনকনে হিম জমতে লাগল সুনীতের। নাকের কাছে আঙ্গুল নিয়ে গিয়ে বন্ধুর নীপা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কি করা উচিত বদ্ব্যবহারে পারছিল না সে। নীপা মরে গেলে পৃথিবীতে তার আর কিছুর থাকবে না। এটা বোধে আসতেই সুনীত ডাক্তারের কথা ভাবল। ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। যেতে হলে হয় দরজা খুলে নল পাশের ফ্ল্যাটের মাসীমাকে ডেকে যেতে হয়। এক ধরনের নার্ভাসনেস বা ওকে এতক্ষণ আছেন করে রেখেছিল তা কাটিয়ে ওঠার মদ্রুত নীপার শরীর নড়ে উঠল। এবং তার চোখের পাতা উন্মুক্ত হতেই সুনীতের মনে হল এর চেয়ে ভাল সময় ওর জীবনে আর কখনো আসেনি। সে দ্রুত নীপার পাশে এসে বসল, ‘কেমন লাগছে এখন?’

নীপা কোন জবাব না দিয়ে উঠে বসতে যেতেই সুনীত বাধা দিল, ‘উঠতে হবে না, চটপট শূন্যে থাকো! আমি ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি।’

খুব দ্রুত গলায় নীপা বলল, ‘না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, ঠিক আছি।’

সুনীত একবার সন্দেহের চোখে তাকাল। নীপার মদ্রুত ফ্ল্যাটের ভাবটা ক্রমশঃ সহজ হচ্ছে। কিন্তু তাকে মান্য করেছে ও, ওঠার চেষ্টা করেনি, তেমনি নেতিয়ে শূন্যে আছে। মদ্রুত একপাশে ফেরানো। সুনীত চটপট রান্নাঘরে চলে এলো। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে দ্রুত বসিয়ে দিল। মদ্রুত পড়ছে এই সময় ব্র্যান্ডি এবং দ্রুত খুব কাজে লাগে। বাড়িতে একটা ব্র্যান্ডি বসিয়ে হবে। এখন ওর নার্ভ সহজ হয়ে এসেছে। ঠান্ডা মাথায় সে বদ্ব্যবহারে ভাবল। মনে হচ্ছে নীপার আর কোন ক্ষতি হবে না। তবে ঘটনাটা ডাক্তারকে জানানো দরকার। ডাক্তারের কথা মনে হতেই সেনের মদ্রুত ভাসল। নীপা তার। সেখানে আর কোন

পদ্মব্রজের মাতব্বরী' সে সহ্য করতে পারবে না। ডাক্তার বলেই সাত খুন মাপ হবে এ কেমন কথা! লোকটা বলছে নীপার পেলভিস বোন ছোট। কই, সে তো কোন অস্বাভাবিকত্ব টের পায়নি। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে এজ্ঞ-রে করতে বললেই চলত, হাত দেবার কি আছে। সুনীত মাথা নাড়ল, লোকটা স্বামীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অন্য কোন লেডি ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিলে ব্যাপারটা ভাঁওতা বলে প্রমাণ করিলে একটা কেস ঠুকে দিলে কেমন হয়। মর্সকিল হল, এই সময় ডাক্তার চেঞ্জ করিয়ে সমস্যা বাড়বে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, সে একটা অন্যায় করেছে। নীপার এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না। সে রাগের মাথায় ফট করে ওই কথা বলে ফেলেছে। নীপা তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু সুনীতের মত নয় এ কথাটা কেমন করে বোঝানো যায়।

‘এটা খেয়ে নাও!’ সুনীত ডাকতেই নীপা মৃদু ফেরালো। আর তক্ষুনি সুনীতের মনে হল ওর কলজে কেউ খামছে ধরছে। নীপার দুই চোখের কোল জলে ভরে আছে। এত ব্যথা একসঙ্গে ওই দুইচোখের কোলে জমা হতে পারে সুনীত জানতো না। কাপ পাশের টেবিলে রেখে সুনীত দুহাতে নীপাকে জড়িয়ে ধরল। নীপা শক্ত শরীরে কাঠ-কাঠ গলায় বলল, ‘তুমি আমাকে সন্দেহ কর।’

‘না, মোটেই না। ক্ষমা করো আমি রাগের মাথায় বলে ফেলোছি।’ ডুকরে উঠল সুনীত। সে যেন বলতে চাইছিল এই মৃদুহৃতে যেকোন শান্তি তার অপরাধের জন্য নিতে রাজী আছে।

‘তাহলে ওই কথা বললে কেন?’

‘আমি ছাড়া তোমাকে কেউ জানুক আমি সইতে পারি না।’

‘তুমি আমার সব জানো?’ নীপার গলার স্বর এখন একদম অচেনা।

‘জানি।’

‘পাগল! কেউ কারো সব জানতে পারে।’ নীপা হাসল।

‘ওসব তত্ত্বের কথা। আমি তোমার সব জানি আর যদি কিছ্ অজানা থাকে তাহলে সেটা আমিই আগে জানতে চাই।’ সুনীত নীপার গলায় ঠোঁট রাখল। আশ্চর্য! আজ নীপার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। স্থির, তেমনি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সুনীত পাগলের মত ওর ঠোঁট, গলা, কপাল, বুকের চুমা খেতে লাগল। যেন প্রতিটি চন্দ্রবন দিয়ে সে নীপাকে সহজ করতে চায়। নীপা শেষ পর্যন্ত হাসল, ‘চিন্তা নেই, আমি এত সহজে মরাছি না।’ সুনীত থেমে গেল। ওর খুব অসহায় লাগছিল নিজেকে।

তারিখ পেরিয়ে গেল। সুনীত অফিস থেকে মাসখানেকের জন্য ছুটি নিয়েছে। নীপাকে সে এখন কোন কাজ করতে দেয় না। প্রতিটি মৃদুহৃতে ওর সজাগ নজর থাকে, নীপার সামান্য অসুবিধে ঘটতে দেখে। তারিখের আগের দিন মনে হইছিল এবার নীপার বাড়িতে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু ওর মৃদুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা তুলতে সাহস পায়নি। তারপরই মত পাঠে ছিল, সে একাই সব

দিক সামলাবে। নীপাকে কোন অভাব টের পেতে দেবে না। এখন নীপা আবার আগের মত স্বাভাবিক। ডাক্তার সেনের কাছে এখন প্রায় ঘনঘন যেতে হচ্ছে। নীপার আপত্তিতে সেই অজ্ঞান হবার ঘটনাটা সেনকে বলতে পারেনি সন্দেহ। কেন হয়েছিল সেটা বোঝাতে কিছু মিথ্যে কথা বলতে হতো। এর মধ্যে আর একবার নীপাকে ভেতরের চেম্বারে যেতে হয়েছিল। না, কোন চিৎকার ভেসে আসেনি কিন্তু সন্দেহ চোয়াল শক্ত করে বসেছিল। কি হয়েছে বা হয়নি এই নিয়ে পরে ওরা কোন আলোচনাই করেনি। সন্দেহের কয়েকবার ইচ্ছে হলেও সেই ঘটনার কথা ভেবে মূখ বৃজে থেকেছে।

দশদিন পার হবার পর ডাক্তার সেন চিন্তিত হলেন। বললেন, ‘ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আপনি কোন পেইন ফিল করছেন না?’

সন্দেহ জবাব দিল, ‘না।’

ডাক্তার সেন এবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, ‘আঃ, আপনি সব কথার জবাব দেন কেন?’

‘মানে, আমি সব জানি, তাই—।’

‘গুড গুড! ঠিক আছে, আপনি আসুন। আজই ডিসমিস নেব।’ নীপাকে ডেকে ডাক্তার ভেতরের চেম্বারে গেলেন। নীপা উঠল। এখন ওর শরীর এত ভারী যে হাঁটতে কষ্ট হয়। এক পা হাঁটতেই ওর মূখ বিকৃত হল। সন্দেহ চমকে বলে উঠল, ‘কি হয়েছে?’

কোনরকমে সামলে নিয়ে সন্দেহের হাতটা টেনে তলপেটে রাখল নীপা। এখন এই ঘরে কেউ নেই। নাস’ও ভেতরে চলে গেছে। হাতের চেটোর তলায় সন্দেহ শক্ত এবং উচ্চ কিছু অনুভব করল। তারপরেই নড়ে উঠে মিলিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নীপা বলে গেল, ‘পা কিংবা হাত।’

সন্দেহের রোমাঞ্চ হল। তার সন্তানকে সে এই প্রথম অনুভব করল। অন্যদিন অনেক নির্বিড় বা সেবার মূহুর্তেও সে ওকে টের পায়নি। বেচারী নীপার শরীরের অন্ধকারে ছটফট করছে এখন! চুপচাপ বসে সে স্পর্শটার কথা চিন্তা করতে লাগল। ওইটুকু শরীরে অত শক্তি!

হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার সেন চেয়ারে বসে বললেন, ‘সন্দেহ। আমি আর সাতদিন দেখব। তারপরেই অপারেশন করতে হবে। বাচ্চার হেড শক্ত হয়েছে।’

‘হেড?’ সন্দেহ অবাক হল, ‘কি করে বললেন?’

‘স্পর্শ করে। ও, আপনি তো সব জানেন কিন্তু একটা জানতেন না। দয়া করে আর জানার চেষ্টা করবেন না। সাতদিনের মধ্যে যদি পেইন ওঠে চটপট নিয়ে আসবেন।’ ডাক্তার সেন ঘাড় ঘুরিয়ে বোরিয়ে আসল নীপাকে দেখে বললেন, ‘অন্য কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?’

‘মাঝে মাঝে পা ফুলছে!’ নীপা বলল।

সন্দেহ শুধু কণ্ঠকে একবার স্ট্রীকে দেখল। ডাক্তার সেন ঘাড় নাড়লেন। তারপর

প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে সুনীত বলল, 'তোমার পা ফুলছে একথা আমাকে বলনি কেন?'

‘বললেই তো সাতপাঁচ চিন্তা করবে।’

সুনীত মৃদু ঘূরিয়ে নিল। খুব বিম্বাদ লাগছিল ওর।

গতরাতে একফোঁটা ঘুমুতে পারেনি সুনীত। নীপাও জেগেছিল অনেকক্ষণ। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে কিন্তু কেউ কথা বলছিল না। সাতটা দিন কেটে গেল। কোন লক্ষণ নেই তার আসার। আগামীকাল সকালে নীপাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে। একটু আগে নীপা ঘূরিয়েছে। ঘুমুনের আগে প্রথম কথা বলেছিল, ‘এই, আমাকে আদর করবে না?’

সুনীত চমকে উঠেছিল। তারপর আলতো করে নীপার কাঁধ ও পিঠে হাত রেখেছিল। নীপা বলল ‘উহু, আরো জোরে জড়িয়ে ধরো।’

সুনীত একটু দুর্বল গলায় জানালো, ‘তোমার লাগবে।’

‘লাগুক। আর হয়তো তোমার পাশে শুতে পাবো না। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, না? আমি না ফিরলে তুমি সব ভুলে যেও।’ শিশুর মত কাঁদতে লাগল নীপা। অন্য সময় সুনীত হলে কি করত জানে না কিন্তু এখন ও হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, ‘এই, কাঁদছ কেন বোকা মেয়ে। এই অপারেশন জলের মত সহজ, কেউ মরে না। এইসময় কাঁদলে ওর ক্ষতি হবে।’

অনেকক্ষণ বাদে নীপার কাঁপুনি কমল এবং তারপর একটু একটু করে ঘুমুে আচ্ছন্ন হল। কিন্তু সুনীতের আর ঘুমু আসছিল না। ঘরে পাতলা আলো জ্বলছে। নীপার মূখের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। না, তার আগে নীপা কখনই যেতে পারে না। এই মেয়ে তার আর এক অস্তিত্ব। তার মনে কোন কষ্ট হলে নীপা ঠিক বদ্বতে পারে। নীপার সামান্য অভিমান চাপা থাকলেও সে টের পায়। এই নীপাকে হারাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ওর পেটে যে দশমাস ধরে তিল তিল করে বড় হয়েছে সে যে অস্থির হয়ে উঠছে। অথচ বেরদ্বার পথ না পেয়ে বেচারী—। ডাক্তার সেন বলছেন, ওর মাথা শক্ত হয়ে গেছে। তার এবং নীপার রক্তে গড়া সৃষ্টির কোন তথ্য সে জানে না। পুরো ব্যাপারটাই যে ডাক্তারের ভাঁওতা এখন আর বলা যাচ্ছে না। লোকটার হাতে এমন নিঃশর্তে সমর্পিত হওয়া তার ভালো লাগছিল না। শেষ রাতটুকুতে সে খুব একা হয়ে যেতে লাগল।

বিকলে নীপাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেল সুনীত। বাইরে থেকে কোন খবর পেল না সুনীত। সুন্দর বিছানা। আজ খুব স্নান করছে ওরা নীপাকে। মাঝখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাইরে গিয়েছিল সুনীত কিছু জিনিসপত্র আনতে। ফিরে এসে দেখল নীপা মৃদু ঢেকে শুয়ে আছে। সুনীত জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে?’

নীপা লজ্জা লজ্জা চোখে তাকাল, ‘যাচ্ছেতাই। নাস’টা খুব অসভ্য।’

‘কেন কি করেছে?’ সুনীত বদ্বতে পারছিল না।

‘তোমার শূনে কাজ নেই। আমাকে পরিস্কার করতে এসে বলল, দেখুন এটা কি ন্যায়বিচার হল। তেনারা ক্ষুতি করবেন আর আমাদের এই কষ্ট সহ্য করতে হবে। তা ভাই, আপনার কতটিকে বলবেন ছেলে হলে নাম রাখতে অভিমুখ্য।’

সুনীত ঠোঁট কঁচকালো। নাসের এইসব কথা তার পছন্দ নয়। তবু বলল, ‘কেন?’

‘সহজে এসেছিল কিন্তু বেরদ্বার সামর্থ্য নেই।’ বলে হাসল নীপা।

সুনীতের কি হল সে নিজেই জানে না। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে নীপাকে জড়িয়ে ধরে ওর বদ্বকে মুখ রেখে স্থির হয়ে রইল। নীপার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে। আর একটু নীচে কান পাতলে আর একটি হৃদযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যাবে। ওরা এখন তিনজন অথচ পিতা, স্বামী হিসেবে সে কিছুই করতে পারছে না। পদতুলের মত তাকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

সেইরাতে একা ওই ফ্ল্যাটে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে ঘুমিয়ে পড়ল। বিশ্বের পর প্রথম দুজনে এখানে এসেছিল। একটি রাত্রে জন্যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেনি। রাত্রে ফিরে সুনীতের অসহ্য লাগছিল। অথচ কখন যে ঘুম এলো জানে না। শব্দ স্বপ্নটা তাকে ধড়মড় করে জাগিয়ে দিল। সুনীতের গলা শব্দিকয়ে কাঠ। দমবন্ধ হবার যোগাড়। চোখের সামনে এখনও ছেলেটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। ‘বাবা, তুমি মাকে ভালোবাসতে?’ হ্যাঁ, বাবা।

‘আমাকে ভালোবাস?’ হ্যাঁ, বাবা।

‘আমি যখন অন্ধকারে ছিলাম আর খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম, মা যখন আমার শরীর শরীরে নিয়ে খুব যত্নগা পাচ্ছিল তখন তুমি কি করছিলে?’ কিছু না, বাবা।

‘কেন?’ আমার ক্ষমতা ছিল না।

‘অন্য কেউ কাজ করবে এবং তুমি ফলের জন্যে অপেক্ষা করবে?’ তাই নিয়ম, বাবা।

‘তাহলে আমি তোমাকে বাবা বলব কেন? তুমি কি করেছ?’ দয়া কর, দয়া কর।

মুখ ভরতি ঘাম অথচ সারা শরীর ঠান্ডা, সুনীত কথাটা আবৃত্তি করল, দয়া করো, দয়া করো। তারপরেই তার হৃদয় এল। উঠে এক গেলাস জল খেয়ে চারপাশে তাকাল। ওই কোণের বাসুন্টা নীপা কিছুদিন আগে কিনেছে। ওতে কি রাখা আছে প্রশ্ন করেনি সুনীত কিন্তু সে জানে। কয়েকটা সুন্দর কাঁথা, কয়েকটা শিশুদের জামা ইজের। নীপার সংগ্রহ করে রাখা যাতে এসেই বিপদে না পড়তে হয়। মা তার সন্তানের আগামীকালের কথা ভেবেছে। বাবা হয়েছে বলে তার কোন করণীয় নেই। কিন্তু স্বপ্নটা যে চোখের মধ্যে আঙ্গুল তুলে দিয়েছে।

নীপাকে যখন ও-টিতে নিয়ে যাওয়া হল সুনীত তখন সেখানে দাঁড়িয়ে । মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে, চোখ বন্ধ । দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ডাক্তার সেনের দিকে । ডাক্তারের গায়ে এখন সাদা অ্যাপ্রন । সুনীতকে দেখে সেই মিষ্টি হাসলেন, 'দুর্দৃষ্টিতা করবেন না । সব ঠিকঠাক যদি চলে তাহলে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না ।' উনি ফিরে দাঁড়ালেন ।

'ডাক্তার বাবু !' সুনীত ডাকল ।

'বলুন ।'

'আমি ভেতরে যাব ।'

'হোয়াট ?'

'আমি অপারেশনের সময় থাকব ।'

'মানে ?'

'আমাকে ওর দরকার হতে পারে ।'

'নো নেভার ।'

সুনীত জেদের গলায় বলল, 'আমি যেতে চাই । আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাই ।'

ডাক্তার সেন কিছুটা হতভম্ব, 'দেখবেন, আমিই ডেকে দেখাবো ।'

'ও যেখানে আছে সেই জায়গাটা দেখতে চাই ।'

'হোয়াই ?'

'আজ না দেখলে কোনদিনই দেখা হবে না । আমি আমার সন্তানের জন্মের সাক্ষী থাকতে চাই ।'

'নো ! ইটস্ নট পসিবল । আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না । এরকম অশুভ অনুরোধ জীবনে শুনিনি ।' ডাক্তার চট করে ভেতরে ঢুকে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল । সুনীত বন্ধ দরজার গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ।

ওর সমস্ত শরীরে এখন কিম্বিমে ভাব । এখন নীপার শরীর কাটবে ওরা । ওর পেটের ভেতর অজস্র আবরণের আড়াল থেকে শিশুটিকে বের করে আনবে । দিলে জুড়ে দেবে নীপাকে । একটা সেলাই-এর দাগ সাক্ষী হয়ে থাকবে এই ঘটনার অথচ সে পিতা হয়েও জানতে পারবে না তার সন্তানের আবাস কিরকম ছিল । সে স্বামী হয়েও নীপার শরীরের অভ্যন্তরের খবর পাবে না । শব্দ উদ্বেগ এবং অস্থিরতা নিয়ে তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে ।

আশরীর ভালোবাসা এবং আবেগ নিয়ে সুনীত তাকিয়ে ছিল কাঁচের ঘরটার দিকে । তার এখন কিছুই করার নেই । ডাক্তার সেনের ওপর এই মহত্বের তার কোন দ্বন্দ্ব নেই । ওর মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর কোন সৃষ্টির কৃতিত্বের পেছনে পিতার কোন কৃতিত্ব নেই । এমন কি কোন স্বপ্নের আনন্দের ফলে এই সন্তান আসছে তাও সে জানে না । সন্তানরা নিজেরাই মাতৃশরীর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে

আগামীকালের পথে পা বাড়ায়। আমরা খামোকা পিতৃশ্বের দাবী বা বড়াই করি। আর এইখানেই নীপার কাছে হেরে গেল সে। আজ অবধি সব ব্যাপারে নীপার সমান সমান ছিল। এখন নীপা অনেক এগিয়ে গেল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে কখন জানে না সুনীত। একটি লাল রঙ চোখের সামনে ফুটেই সে সজাগ হল। ডাক্তার সেন দাঁড়িয়ে আছেন। ওর সমস্ত শরীরে রক্তের দাগ। মুখে হাসি। ডাক্তার সেন বললেন, ‘অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি বাবা হয়েছেেন।’

সুনীত তখন রক্ত দেখাছিল। নীপার রক্ত। এবং এই প্রথম লোকটাকে সুন্দর লাগছিল ওর। ঈশ্বরের মত সুন্দর। ও হেসে ফেলল, ঈশ্বরকে ঈর্ষা করা যায় না।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘খুশী তো! আপনার মেয়ে হয়েছে।’

সুনীত আবার হাসল।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘আপনার স্ত্রী ভাল আছেন। একটু বাদেই সেন্স ফিরে আসবে তখন কথা বলবেন। তবে এক মিনিটের জন্যে।’

সুনীত আবার হাসল।

ডাক্তার সেনের যেন অস্বাস্তি হল। বললেন, ‘আপনি আমার সঙ্গে আসুন।’ ওপাশের একটি বন্ধ ঘরের দরজা ঠেলে সুনীতকে নিয়ে ঢুকলেন তিনি। ছোট্ট একটা কটের সামনে দাঁড়াল ওরা। ডাক্তার সেন সুনীতের দিকে তাকালেন।

কটের ভেতরে তোয়ালে জড়ানো ছোট্ট শরীর। মাথাটি বোরিয়ে আছে। মাথা ভারি কৌকড়া চুল। মৃদুটিবন্ধ দুই হাত হঠাৎ উত্তোলিত হল। লাল টুকটুকে মুখে প্রতিবাদের ভাঁজ। সুনীত ঝুঁকে পড়ল। কুচকুচে কালো চোখ দুটো এবার ঢেকে গেল। এবং সজোরে একটা কান্না আছড়ে পড়ল সুনীতের ওপর।

সুনীত সোঁজা হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার সেন বললেন, ‘নতুন পরিবেশে যতক্ষণ না খাপ খাওয়াতে পারবে ততক্ষণ এইভাবে প্রতিবাদ করবে ওরা।’

সুনীত আবার হাসল। সে মনে মনে বলল, ঈশ্বর, কোনদিন যেন ও খাপ খাওয়াতে না পারে।

মেয়েটি বিষন্ন কিন্তু মলিন নয়, বললো, ‘তুমি আমাকে ভালোবাসো না ।’

ছেলেটি, এই অবস্থায় ছেলেরা যেমন হয়, কিছুটা নাভাস আবার প্রতিবাদে সোচ্চার অথচ মৃদু কোন শব্দ ঠিকঠাক যোগায় না, শুধু চাহনিতে বোঝালো, ঠিক নয়, কথাটা ঠিক নয় ।

মেয়েটি পায়ে পায়ে সরে এলো ছেলেটির নিঃস্বাসের কাছে, ‘তাহলে আমার আঁচল এমন বিবর্ণ কেন ? কেন সব রঙ হারিয়ে গেল অথচ তোমার চোখে পড়ল না ।’

ছেলেটি বলল, ‘এই কথা । আমি পৃথিবীর সব ফুল এনে দিচ্ছি, তারা রঙের সঙ্গে গন্ধও দেবে ।’

মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথা দোলালো যেমন করে বাতাস না বইলেও দেবদারুর পাতা কাঁপে, ‘সেতো আমি নিজেই আনতে পারি । পৃথিবীর ফুলেরা তো ছটফট করছে আমার স্পর্শ পেতে, সে আমি চাই না ।’

ছেলেটি এবার যেন কিছুটা নিঃস্ব, তার ঝুলিতে অন্যতর বিস্ময় নেই যা মেয়েটিকে নির্বাক করে দেবে । মেয়েটি মৃদু তুললো তার বুকের ঈষৎ বাইরে যেমন করে সূর্য ওঠার আগে পাখীরা প্রথম ডাক দেয়, ‘ওই বুকে যদি এত ভালোবাসা তাহলে আকাশটার দিকে তাকাও । ও কেন আমার আঁচলের চেয়ে সুন্দর হবে ? পারো না ছোট ছোট হীরের মত সব কটা তারাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে এনে আমার আঁচলে ঢেলে দিতে । আমি ওদের বেঁধে রাখব এখানে, বন্ধন সুন্দর করব ।’

ছেলেটি এবার হাসল । যেন এক লক্ষ ডেউ আর সামুদ্রিক ঝড় ডিঙিয়ে তার নৌকা সদ্য মাটি ছুঁয়েছে । বলল, ‘উঁহু, আমি কখনো ভাবতে পারি না তোমার আঁচল কুণ্ডিত হয়ে আছে ভারে ।’

মেয়েটি বলল, ‘বেশ, আমি ওই ছোট ছোট তারাদের আমার আঁচলে বসিয়ে দেব এমন করে যেন পূর্ণিমার আকাশ হার মানে ।’

মেয়েটির বুক এবার অঞ্জলির মত ছেলেটির হৃদয় স্পর্শ করছে । ছেলেটি মাথা নাড়ল, ‘না, এত ছোটই যা কিনা টুকরো টুকরো, মন ভরবে না আমার । যদি এনে দিতেই হয় তাহলে চাঁদটাকেই পেড়ে আনবো আকাশ থেকে । বসিয়ে দেব তোমার আঁচলে ।’

মেয়েটি বলল, ‘যার বুক জুড়ে এমন চাঁদ তার আঁচলে কি দরকার ।’ ছেলেটি দহাতের বেড়ে নিজেকে সমর্পন করার মনোভাৱে বলল, ‘তবে যে বলছিলে আমি তোমায় ভালোবাসি— ।’

মেয়েটি গ্রহণ পূর্ণ করল, ‘আমি যে আবার নতুন করে ভালোবাসলাম, তাই ।’

তিস্তা বলল, ‘কিরকম বোকা বোকা ব্যাপার সব।’

সুদ্রত কিন্তু আচ্ছন্ন ছিল। তিস্তার কথা কানে যেতেই মৃদু তুললো, ‘বোকা বলছ কেন? প্রেমের স্বাভাবিক এই অভিব্যক্তি তোমার পছন্দ হয়নি?’

‘স্বাভাবিক?’ তিস্তার চশমার কাঁচ চকচক করে উঠল, ‘তোমরা ছেলেরা একটু নরম কথা পেলেই গলে যাও। তাই তোমাদের প্রেমে পড়তে সমস্যা লাগে না।’

সুদ্রত কথার সূতো সোজা করতে চাইলো, ‘যাই বল, ছেলেমেয়ে দুটো কিন্তু খুব ভাল অভিনয় করেছে। এই নেপালী গানটাকে নাটক করা খুব সোজা নয়।’ কথাটা শেষ করে সুদ্রত আর একবার তিস্তার দিকে তাকালো। লম্বা, ঈষৎ ডিম্বাটে মৃদু, ফেঁপে ফুলে থাকা কাঁধ-ছোঁয়া চুল নলেগাঁও জঙ্গলের মত কালো, হাঁটে যখন তখন সুদ্রতর বদকে শিউলি ঝরার শব্দ হয়। এখন এখানে শীত দাঁত শানায় ভোর রাতে, দিনভর একটা গুম ছড়ানো থাকে। না গরম না শীত। পাহাড়গুলো যেন মেজেঘষে চমৎকার ফিটফাট হয়ে আছে। বিয়ের কদিন আগে থেকে মেয়েরা যেন নিজেদের সাজায়। তাই এই সন্ধ্যা পার হব হব সময়টায় কুশাশা নেই, মেঘ নেই এবং তিস্তার শরীরে কোন পশমের বাড়তি আবরণ নেই। হালকা নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে ওর ভরাট শরীর বর্ষার নদীর মত। বদকের দিকে তাকালেই মৃদু খোলার আগে টেটস্বদর গ্রান্ডিফোরার কথা মনে আসে। তিস্তার পাশে হাঁটলেই সুদ্রত অবশ হয়ে যায়। মাত্র আট মাসের আলাপ। আটমাস ধরে একটার পর একটা ঘর তুলতে তুলতে সম্পূর্ণ হয়েছে বদনন, শৃঙ্খল বোতাম বসানো বাকী।

বাজার এলাকা ছাড়লেই পৃথিবীটা শূন্য। তখন কোন মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। সুদ্রত হাত বাড়িয়ে তিস্তার আগুদল তুলে নিল। এত নরম যেন রক্তের চলাচল অনুভব করা যায়। তিস্তা বলল, ‘কি হচ্ছে কি?’

‘কেন?’

‘কেউ দেখে ফেলবে।’

‘ফেলুক।’

‘আহা, তোমার আর কি! আমাকে মেয়ে-কলেজে পড়াতে হয়।’

‘এত রাতে কেউ তোমাকে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।’ তিস্তা অবশ্য হাত সরিয়ে নেয়নি কিন্তু নিজের আগুদল নিষ্ক্রিয় রেখেছিল। এইরকম নিরাসক্ত তিস্তাই হতে পারে। আটমাসের প্রতিটি দিনে সুদ্রত বদকেই সে যতটা তিস্তাকে কামনা করে তার চেয়ে কম তিস্তা তাকে ভালোবাসে না। অনেক ছোট বড় প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এইরকম ভাবতে পারার। অথচ তিস্তা যেন সেই স্মার্টফোনের মত যা হাঁরের চেয়ে শক্ত। সুদ্রতর হাজার উচ্ছ্বাস ওকে শৃঙ্খল ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়, আপদত করে না। এখনতো বিবাহের দিন মোটামুটি স্থির। এখনও তার স্বাধীনতা শৃঙ্খল হাত ধরায়, কখনো সখনো চুষবে। শেষেরটিতে বড় আপত্তি তিস্তার। অথচ মাঝে মাঝেই তিস্তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বদকের হাড় করে নেবার বাসনা তীব্র হয় সুদ্রতর। ওর বদকের রঙ গন্ধ স্বাদ আকর্ষণ গ্রহণ করার জন্য আকুলি বিকুলি চলে রক্তে।

একবার ওর খোলা কোমরের নরম খাঁজে আঙ্গুল রেখেছিল স্দ্রত। চমকে সরে গিয়েছিল তিস্তা, বলেছিল, ‘এমন করো না।’

‘কেন?’

‘আমাদের সঙ্গে সারমেয়ের কি তফাৎ থাকবে তাহলে?’

শ্রুতিভত স্দ্রত কোনরকমে বলতে পেরেছিল, ‘কি আশ্চর্য, যাকে ভালোবাসি তাকে মনের মত করে আদর করতে পারব না?’

‘যাকে ভালোবাসো বলে মনে হয় তার শরীর কি শুদ্ধ ভোগের জন্যই?’

‘ভোগ বলছ কেন?’

‘স্দ্রত, সংঘত হলে সব কিছুই স্থির থাকে। প্লিজ। এবিষয়ে কথা বলতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি এসো।’ তিস্তা মৃদু নামিয়েছিল। নামিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল বুক নিংড়ে।

কিন্তু, সেই যে প্রবাদ, মাটির পাত্র একসময় পাষাণকে ক্ষইয়ে দেয়, স্দ্রত তিস্তার নরম এবং উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পেরেছিল একদিন। এবং ওই সময় তাকে সতর্ক থাকতে হতো যাতে একটুও বাড়াবাড়ি না হয়, যা কিনা অমানুষ করে তেমন কোন আচরণ না হয়ে যায়। তিস্তার চারিদিকে বাঁধ, সেই বাঁধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত জলের মত বয়ে যেতে হয় স্দ্রতকে।

আজও হাঁটতে হাঁটতে এই কথাগুলো চটচট করছিল স্দ্রতের মনে। ওর হাতে তিস্তার আঙ্গুল। আর মাথার ওপর প্রতিপদের চাঁদ হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে, প্রতীক্ষায়। বাক পেরোতেই ওদের পা প্লথ হল। একটু এগিয়ে রাস্তার কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। পেছনে পাহাড় সামনে অতলান্ত খাদ। সেই খাদ ডিঙ্গিয়ে ছোট ছোট পাহাড়কে টিলার মত দেখায় এখান থেকে। ডিমের খোলের মত জ্যোছনার মাখামাখি চৌদিক। সেই টিলাগুলোকে বেড় দিয়ে দুটো নদী এসে মিলেছে সামনে। চকচকে নয়, কেমন ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছে তাদের শরীর।

কবে কখন কোন পাহাড়ের বরফ গলে ঝরণা, ঝরণা জড়ো হয়ে বড় ধারা নেমেছিল একদিন। বড় পাথর ভেঙ্গে নুড়ি করে করে উত্তাল হয়ে ছুটে আসছিল নীচে। সহসা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল কোন কঠিন বাধা, ধারা বিভক্ত হল। দুই বিন্দুনির মত দুদিকে চলে গেল তারা। এ জানে না ওর খবর, ও পায় না একে, তারপর অনেক পথ ডিঙিয়ে আচমকা ওইখানে এসে দেখা হল দুজনের। একজন আর একজনকে দেখে লাস্যভরে বলে উঠল, ‘তিস্তা?’ এই পাহাড়ী শরীরের সরল অর্থ, এতদিন কোথায় ছিলে? সেই থেকে যাকে শুধোনো হল, তার শরীর একটু গভীর তার নাম হয়ে গেল তিস্তা। আর যে শুধালো, যার শরীরে দেখার আনন্দে রঙ বেজেছে তার নাম রাখা হল রঞ্জিত। একজনের জল স্নান, অন্যজনের জল ঘোলা, পুরুষ এবং প্রকৃতির যেমনটি হয়। রঞ্জিতকে প্রাস করে নিল তিস্তা।

এ-গম্প এখানে এসে নানান মূখে শোনা। স্দ্রতও যেমন তিস্তাও তাই। এই পথে হেঁটে গেলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নীচের ঝাপসা নদীদুটো দেখতে

ভারী ভাল লাগে। একদিন স্দরত বলেছিল, ‘চলো, রাস্তা খুঁজে নিলে পদের কাছ থেকে ঘুরে আসি।’

তিস্তা মাথা নেড়েছিল, ‘না। দূরে আছে বলেই ওরা রহস্যময়, কাছে গেলে হয় তো আর পাঁচটা নদীর মত সাধারণ হয়ে যাবে।’

আপত্তি করেছিল স্দরত, ‘বিশ্বাস করি না, তিস্তা কখনই সাধারণ হতে পারে না। ‘কেন নয়? তারও গঠন অন্য পাঁচজনের মতনই। ভালোবাসা দিয়েই তো আমরা রহস্যময় করে তুলি।’ বলে হেসে ফেলেছিল তিস্তা।

চমকে ফিরে তাকিয়েছিল স্দরত। কিন্তু মন মানেনি। মনে মনে জেনেছিল তিস্তার রহস্য কখনও শেষ হবার নয়। আকাশের মত, সমুদ্র নয় কারণ তারও তল আছে।

আজ প্রতিপদের জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রঞ্জিত-তিস্তার সঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্দরত ওর কাঁধ স্পর্শ করল। একটু কি কাঁপুনি জমল তিস্তার শরীরে?

তিস্তা নীচু গলায় বলল, ‘তুমি ঠিক ওইরকম, রঞ্জিতের মত।’

স্দরতর কণ্ঠ গভীর হল, ‘তোমায় বড় আদর করতে ইচ্ছে করছে।’

তিস্তা তাকালো। চশমাও যে মাঝে মাঝে গয়নার মত সুন্দর করে কাউকে। আর ওই সময় ইঞ্জিনের শব্দ বাজলো পাহাড়ে। একটা গাড়ি নামছে ওপর থেকে। চকিতে সরে গেল তিস্তা, বলল, ‘কি যে কর।’

স্দরত মনে মনে বলল, আর কটা দিন, তিরিশ দিনে যদি মাস হয়—।

ওরা চুপচাপ ওপরে উঠে আসছিল। প্রথম প্রথম এইরকম চড়াই ভাঙতে অসুবিধে হতো স্দরতর। এই শহরে তিস্তার বাস অবশ্য কিছুর আগে থেকে। ওর কলেজ বাসস্থান থেকে মিনিট দশেক হাঁটলেই। এই শহরে এখন বাড়ি পাওয়া মূশকিল। চন্দ্রালোক হাউসের পেছনে ছোট বাংলো বাড়িটা পেয়ে সুবিধে হয়েছে তিস্তার। ওর এক সহকর্মীণীর সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধে অনেক। মহিলা বয়স্কা এবং বোধহয় শূচিবাইগ্রস্ত। এই আটমাসে একটি বারের জন্যে সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি স্দরত। তিস্তা জানিয়েছে মহিলা আত্মীয় না হলে কারো প্রবেশ পছন্দ করেন না। একজন স্বাধীনচেতা অধ্যাপিকার এই মানসিকতা কি করে মেনে নেয় তিস্তা স্দরত জানে না। মহিলাকে দেখে তার পুরুষবিশেষী বলেই মনে হয়। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে তিস্তা ওখানে বেশ আরামে থাকে। শীতের ছুটি পড়লেই চলে যায় বরানগরে। বাপ মায়ের বড় আদুরে মেয়ে সে। ভবানীপুর থেকে স্দরতর বাড়ির লোক সেখানে গিয়ে শেষ তথ্যটি জেনে এসেছে।

স্দরতর চাকরী সরকারী হাসপাতালে। ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি জমেছে বেশ। প্রেমের পড়ার সময় পায়নি এতকাল পড়াশোনা এবং কাজের সুযোগ! এই পাহাড়ী শহরে এসে যার ঢেউ সব এলোমেলো করে দিল সে ওই তিস্তা। বরানগরের মেয়ের নাম পাহাড়ী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি রেখেছিলেন ত্রিমি অবশ্যই রসিক। এই আটমাস ধরে হিসাবটা একটু একটু করে মিলিয়ে আনাছিল স্দরত। এখন চূড়ান্ত ক্ষণের অপেক্ষা।

তিস্তার বাড়ি যদি এই পাহাড়ে তাহলে সুব্রতর ওই পাহাড়ে। মাঝখানে রাস্তাটা চিরে গেছে দুদিকে। অফিসের সুব্রত্রেই পাওয়া একতলা প্রায় কাঁচের বাড়িটা এখন একটু একটু করে সেজে উঠেছে। সামনের ছোট বাগানে বীরবাহাদুর রকমারী ফুলের আসর সাজিয়েছে। দুটো কপড়ের গাছের ফাঁক দিয়ে ভ্যালিটাকে অনেকখানি চোখের সামনে ধরা যায়। বর্ষার মেঘগুলো নেমে আসে সেখানে। ভোরে আকাশ যখনও মেঘে মদ্য খোয়ানি তখন কাগনজঙ্ঘাকে তাজমহলের চেয়ে সুন্দর দেখায়। আর আছে সুব্রতর প্রিয় ফুল গ্যাংডজ্জোরা। বিরাট কুঁড়ি যখন পূর্ণ হয়ে একটু একটু করে মদ্য খুলতে থাকে তখন বীরবাহাদুর হাতের নাগালে যাকে পায় তাকেই সুতো দিয়ে বেঁধে আসে। মদ্য বন্ধ তাই পেট পোয়াতি মেয়ের মত আদরে হয়ে যায় ফুলগুলোর। রাত বাড়লেই ওদের শরীর থেকে গন্ধ চুইয়ে পড়ে সমস্ত বাগানে ঘরে ঘরে। এই বাড়ি এখন যেটুকু অসম্পূর্ণ তা তিস্তা এলেই পূর্ণতা পাবে।

তিস্তা অবশ্য এখানে এসেছে। রোদ জড়ানো বিকেলে বাগানের মধ্যে ঢুকে যাওয়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বীরবাহাদুরের হাতের চা খেয়ে গেছে। ঘরে ঢোকেনি। সুব্রত অনুরোধ করলে হাত তুলে থামিয়েছিল, ‘সবই যদি এখন জেনে যাই তাহলে অধিকার নিয়ে যখন আসবো তখন জানার যে কিছুর থাকবে না।’

সুব্রত বলেছিল, ‘অধিকার কি এখন নেই?’

তিস্তা বলেছিল, ‘চোরের মত!’

কথা বাড়ায়নি সুব্রত। তিস্তার জিভে এক ধরনের বাঁকা ছুরি আছে, ঢুকে যাওয়ার আগে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বোঝা গেলে অসাড় হয়ে যেতে হয়।

এই শহরের প্রশংসা করেছিল তিস্তা। মানুষের লোভ সীমিত, চুরি-চামারি হয় না বড় একটা। মেয়েদের বেইজ্জত করার ঘটনা শোনা যায় না। যা কিছুর অসংলগ্ন তা ঘটে টুমরিষ্টরা এলে। কোলকাতার কোন ছেলে এখানকার মেয়েদের অসম্মান করলে পাহাড়ের মানুষরা তাকে ছিঁড়ে ফেলে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুদিন আগে। তিস্তা বলেছিল, ‘ঠিক হয়েছে। বরাহের উপযুক্ত শাস্তি।’

সুব্রত বিস্মিত, ‘বরাহ?’

তিস্তা কঠিন গলায় জবাব দিয়েছিল, ‘তাই। সমস্ত কলকাতাটাই তো এখন বরানগর। তা থেকে মাঝে মাঝে এইসব বরাহ ছিটকে আসে।’

মনে করিয়ে দিয়েছিল সুব্রত, ‘তোমার বাড়ি বরাহনগরে।’

‘তাইতো আমি এতটা বলতে পারি।’ তিস্তা অন্যমনস্ক হয়ে শিঁড়িয়েছিল।

পিচের রাস্তাটা ছেড়ে অনেকটা নীচে নামতে হয় তিস্তাকে। দু’পাশে বড় বড় গাছের সারি। বিকেল হলেই জায়গাটায় অন্ধকার নামে। সন্ধ্যাও আকাশে চাঁদ তবু এখানে জ্যোৎস্না ঢোকেনি। ব্যাগ থেকে টার্চ বের করে জ্বালালো তিস্তা। সুব্রত রোজ এখান থেকেই ফিরে যায়। আজ আরও কয়েক পা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল, বলল, ‘দরজা অবধি পৌঁছে দিই?’

তিস্তা বলল, ‘তোমাকে আবার উঠতে হবে।’

‘তা হোক ।’

সদ্রতর হাত থেকে অনেকক্ষণ আঙ্গুল সরিয়ে নিয়েছে তিস্তা । শেষবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল সদ্রতর । তিস্তা রাজী হল না, কিন্তু মদ্যে কোন কথাও বলল না । মোড় ঘুরে থামবিহীন লনটার সামনে আসতেই চোখে পড়ল বাংলোটো নিখুঁত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । কোন জানলায় আলোর ছিটে লেগে নেই । চট করে হানাবাড়ির মত মনে হয় ।

সদ্রত জিজ্ঞাসা করল, ‘এতো অন্ধকার কেন ?’

তিস্তা বলল, ‘আমাকেই আলো জ্বালতে হবে ।’

‘কেন, তিনি কোথায় ?’

‘স্বদ্বিভাসিটিতে গিয়েছেন । আজ রাত্রে শিলিগড়িতে থাকবেন ।’

‘সেকি ! তুমি একা থাকবে নাকি এত বড় বাড়িতে ?’

‘কেন ? এটাতো আর বরাহনগর নয় । তাছাড়া কাঙ্ক্ষি আছে ওপাশে ।’

কিন্তু সদ্রতর এটা ভাল লাগছিল না । এই শহরে কোন ঘটনা ঘটেনি মানে এই নয় যে কখনো ঘটবে না । কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে ? তিস্তা সদ্রতর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবে না আবার সদ্রতকে এখানে পাহারা রাখবেও না । দরজা খুলে তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল । তার বাঁ হাত সদ্বিভাসিটিতে কিন্তু আলো জ্বলছে না । এখানে লোডশেডিং হয় না বলা চলে । তিস্তা বিরক্ত গলায় বলল, ‘আলোটোর আবার কি হল আজকে !’

‘মেইন সদ্বিভাসিটি কোথায় ?’

‘কেন ?’

‘ফিউজ তারটা পাশটোতে হতে পারে ।’

‘তুমি এসব জানো ?’

সদ্রত উত্তর দিল না । তিস্তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলতে লাগল । পাশের ঘরে সেটাকে পাওয়া গেল । লক নামিয়ে আঙ্গুল দিয়ে স্ক্রু খুলে দেখল সন্দেহটা ঠিক । এখন তার পাওয়া যায় কোথায় ? তিস্তাকে কথাটা বলতে এক টুকরো জোগাড় হল । ঠিকঠাক করে দিতেই আলো জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধিয়ে । তিস্তা বলল, ‘ধন্যবাদ ।’

সদ্রত বলল, ‘শুকনো ধন্যবাদে চিড়ে ভেজে না । চা খাওয়াতে হবে ।’

তিস্তা বিরক্ত গলায় জবাব দিল, ‘এত রাত্রে চা খেতে হবে না ।’

‘এমন কিছু রাত হয়নি ।’

ঠিক সেইমুহুর্তে চটির শব্দ পাওয়া গেল, ‘কোন ?’

দ্রুত সদ্রতকে ওপাশের ঘরে ঠেলে দিল তিস্তা, ‘কেন ? কাঙ্ক্ষি ?’

‘জি মেমসাব ।’

‘তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ?’

‘জি ।’

‘শুয়ে পড় তুমি।’

এই ঘরে চমৎকার জ্যোৎস্না কিলবিল করছে। এটাই যে তিস্তার শোওয়ার ঘর বন্ধুতে অসুবিধে হচ্ছে না। টেবিলে যে ফ্রেমের ছবিতে তিস্তা হাসছে তা চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়। কিছুক্ষণ বাদেই তিস্তা এল, বেশ নার্ভাস গলায় বলল, ‘এটা কি করলে বলতো। যদি দেখে ফেলতো।’

‘আফটার অল তোমাদের ঝি। ওকে ভয় করার কি আছে?’

‘মিসেস সোম জেনে যেতেন। ব্যস হয়ে যেত।’

‘পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন চা খাওয়াও।’

‘দোহাই, প্লিজ, আজ আর বাসনা করো না। বিয়ের পর তুমি যত চাও তত চা করে দেব।’ দ্রুত এগিয়ে এসে তিস্তা যেন অনুন্নয় এবং প্রতিজ্ঞা করল।

মজা লাগছিল সুব্রতর। এই প্রথম তিস্তাকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে এমন। সে দু হাতে ওকে জড়িয়ে বুকে টানলো, ‘তাহলে অন্য কিছু খাওয়াও।’ তিস্তার যেন উভয়সংকট। কোনরকমে বলল, ‘তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তাড়াতাড়ি খাও।’

সুব্রত তিস্তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। উফ, জবাফুলের কেশরের মত গভীর নরম স্বাদ। ঠোঁট সরিয়েছিল না সুব্রত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাসফাঁস করতে লাগল তিস্তা। কিন্তু সুব্রত তার কাঁধ দু হাতে আঁকড়ে রেখেছে, মদুখের চাপে মদুখ। কোনরকমে ঠোঁট সরিয়ে তিস্তা বলল, ‘রান্সস। এভাবে কেউ চুমু খায়?’

‘কিভাবে খায়?’ তিস্তার শরীরের গন্ধ এবং ঠোঁটের স্বাদ সুব্রতকে ক্রমশ উফ করে তুলছিল। সে তিস্তার গলায় ঠোঁট রেখে শুধালো, ‘এইভাবে?’

দু হাতে ওর শরীরের কাঁপন অনুভব করল সুব্রত, তিস্তা অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ‘জানি না।’

‘তিস্তা, তোমায় না পেলে আমি মরে যাব।’

‘লক্ষ্মীটি, অধৈর্য হয়ো না, আর কটা দিন অপেক্ষা করো প্লিজ।’

‘কেন এখন নয় কেন?’

‘এখন যদি সব নিয়ে নাও তাহলে বিয়ের পর আমি তোমাকে কি দেব? আমি তো আর নতুন থাকবো না।’ দু হাতে সুব্রতর মাথা নিজের বুক থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হেরে যাচ্ছিল তিস্তা।

‘আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যদিও আমরা ভালোবেসেছি যদিও না তো বিয়ে। এতোদিন আমাদের কালরাত্রি গেল।’ দু চোখে শুধু তিস্তা আর তিস্তা। ওর বুকের গভীর খাদে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সুব্রত। জামার খাতব বাঁধনকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

‘এই, আমার জামা ছিঁড়ে যাচ্ছে।’

‘শাক। এক হাজার জামা দেব বদলে।’

বাইরের আবরণ যখন ঘুচলো তখনও নীচের আগল সুদৃশ্য। সুব্রত আনাড়ির

মত তার জট খুলতে ব্যস্ত। একটু একটু করে তিস্তার শরীর শিথিল হয়ে এসেছে। শেষবার বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে না?'

'ফিরবো।'

'না।'

'মানে?'

'এই রাত্রে এসব করে তুমি ফিরে যেতে পারবে না।' খুব স্পষ্ট এবং দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল তিস্তা। চমকে মূখ্য তুললো সদ্রত। এ কোন তিস্তাকে দেখছে সে। মূহুর্তের জন্য দুর্শ্চিন্তাগ্রস্ত হল, 'কিন্তু বীরবাহাদুর...।'

'আমি কিছু জানি না। আমাকে জাগিয়ে তুমি চলে যেতে পারবে না।'

মূহুর্তে যেন হাজারদুয়ারীর সব কটি দরজা হাট হাট করে খুলে গেল। কিংবা এমনও বলা যায় সমুদ্রের দেখা পেয়ে নদী যেন অশ্রুত শান্ত এবং ভরাট হয় তেমনি সদ্রতর দুই হাতের বাঁধনে তিস্তা টলটল করছিল। বৃকের বন্ধনী মূক্ত করতে বিব্রত যখন সদ্রত তখন তিস্তা কপট গলায় জানালো, 'তুমি সত্যি আনাড়ি।'

'ছিলাম। কাল থেকে থাকবো না।' সদ্রত দেখল অভ্যস্ত হাতে তিস্তা বন্ধন মূক্ত হল। চোখের সামনে পাকা বেলের স্বর্ণাভা, আধারচ্যুতির জন্যে কিছুটা নিম্নমুখী কিন্তু চম্কার। সদ্রত শিশুর মত কাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। জননীর মত তাকে আশ্রয় দিল তিস্তা। তার শরীর কাঁপছে, দ্বিধা বোঁকে সে মূখ্য নামালো সদ্রতর ঘাড়। বলল, 'আমাকে মূক্ত করে নিজে সেজেগুজে বসে আছ।'

পাউডার না অন্য গন্ধ সদ্রত জানে না কিন্তু মূখ্য তুলতে ইচ্ছে না হলেও সে ছুলল। তিস্তা বলল, 'না এখন থাক।'

শৈশবে মায়ের স্মৃতি অথবা পথেঘাটে দেখা সুন্দরীদের বক্ষ এতদিন যে আকর্ষণ করত তা এখন হাত এবং মূখের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ। সদ্রত জানছিল সুখ কাকে বলে। পৃথিবীতে কত রকমের সুখ রয়েছে কিন্তু এই সুখ চিরকালের না হলেও চিরকালই মানুষেরা পেয়ে এসেছে।

তিস্তা বলল, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি গো।'

সদ্রত জবাব দিল বৃক এবং পেটের জমিতে মাথা রেখে, 'আমিও।'

'তুমি আমাকে কি দেবে?'

'জানি না। তবে তারা কিংবা চাঁদ পেড়ে আনতে পারবো না।'

হাসলো তিস্তা, 'তুমি আমাকে তোমার মত একজনকে দিও।'

'এটা একটু বোকা বোকা কথা হল না?'

সদ্রতর গলায় এখন সেই ঠাট্টা। তিস্তা আদরুরে হল, 'হোক, আর কেউ তো শুনছে না।'

সদ্রতর মনে হল, সন্ধ্যাবেলার ওই চরিত্রদ্বয়ের স্ফূরণ কি তিস্তার কথাই, অন্য সবাই শুনছিল বলে বোকা বোকা হয়ে গিয়েছিল? তিস্তার হৃদপিণ্ড তখন সদ্রতর কানে শব্দ তুলল, ঠিক ঠিক।

আয়োজন সম্পূর্ণ। জ্যোৎস্নার আলো এখন মশারীর মত মোহিনী।

তিস্তা ডাকল, ‘এসো।’ তিস্তা এখন একটু একটু করে গলে গলে শেষ ঢেউ-এর প্রতীক্ষায়। মাতাল, মদ না খেয়েও মানুষ যখন সবচেয়ে বেশি মাতাল হয় তেমনি, সুদূরত নিজেকে মত্ত করে বিলিয়ে দিতে এবং গ্রহণ করতে হাত বাড়ালো।

তিস্তা চাপা গলায় বলল, ‘পদাটো টেনে দাও, জ্যোৎস্নাটো বন্ড জ্বালাচ্ছে।’

সেকথায় কান নেই সুদূরতর। তিস্তার শরীর থেকে শেষ আবরণ সরিয়ে ফেলে সে যখন তীব্রতর হল সেই মূহুর্তেই নজর স্থির হল। ওকি। পলকেই সমস্ত শরীর স্থির। যেন আচমকা বরফ ঘষে দিয়েছে কেউ। নিজের অভ্রাতেই শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তিস্তা অসহিষ্ণু হল, ‘কি হল, এসো।’

সুদূরত চোখ বন্ধ করল। তার শরীর ততক্ষণে তলানিতে এসে ঠেকেছে। চোখের পাতায়, এমনকি এই বন্ধ চোখেও, বিশ্বচরাচর জুড়ে, এখন তিস্তার নরম তলপেট। সেখানে সরসরু ক্রিমির মত সাদা সাদা দাগ জ্যোৎস্নায় ঠাস হয়ে আছে। ওপর থেকে নীচে ফাটা ফাটা হয়ে আছে জঠর।

তিস্তার গলা কানে এল, ‘কি হল?’

সোখ খুলল সুদূরত। ওই শরীর তার নয়। কোন ডাক এই মূহুর্তে শরীরকে চাকর করতে পারছে না। এতদিন যে তিস্তাকে সে কামনা করে এসেছে এখন চেষ্টা করলেও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই। সাদা দাগগুলো কিলবিল করছে সামনে। বরাহনগরের মেয়ের চুপচাপ প্রতারণাকে উপেক্ষা করার সাধ্য তার শরীরের নেই। বৃকের মধ্যে টনটন করছিল সুদূরতর।

আর তখনি তিস্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দ্রুত হাতে কাপড় সংযত করে বালিসে ঝুঁক গুঁজে কেঁদে চলল একটানা।

সুদূরতর মনে হল, তিস্তা তার বৃকের কান্নাটাকেও চুরি করে নিয়ে কাঁদছে।

ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ

চেয়ারে বসে দুলছিল শ্বিজদাস। সেই ভোর রাত থেকে জোর খাটুনি গেছে, আজ এখন সামনের শো-কেসগুলো ভর্তি, চট করে দেখলে সাজানো বাগান মনে হয়। বাইরে তাকাল ও, বিকেল হতে একটু দেরী আছে। রোদের তেজ মরেছে। শ্বিজদাসের এই দোকান ‘সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে’ বসে ভূটানের পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। নড়ে চড়ে বসল শ্বিজদাস। হাতলছাড়া চেয়ার, শ্বিজদাসের হাতল থাকলে বসতে অসুবিধে হয়। বড় চর্বি জমে যাচ্ছে শরীরে। আঙ্গুল দিয়ে বৃকের তলায় খাঁজ ধরে না। এই শালা মিষ্টির গন্ধে গন্ধে শরীর ফুলছে। কথাটা ভাবতেই নরেশের দিকে নজর পড়ল ওর। খেঁকুরে চেহারা, অথচ দিনরাত মিষ্টি বানাচ্ছে ও। কার যে কি হয়। খালি গা, এই শীত আসা সময়টাও গায়ে কাপড় রাখতে পারে না। ওপরের দিকে তাকাল সে। কাঠের সিলিং-এর ওপরে মৃদু পায়ের শব্দ ঘোরাফেরা করছে। সাজগোজ হচ্ছে বোধ হয়। সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিকান ঠাকুর দেখতে যাবেন। শ্বিজদাস যার কাছে হাতি—স্নেহহস্তী। মৃদু ঝামটা দিয়ে দু’বছর আগে যে বলত, ‘সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে সাদা হাতি বৃকে তুলবো।’

সকাল থেকেই ঢাক বাজছে পুজো-মণ্ডপে। বোল পালটালো দু’পুঁর থেকে। সীতাদেবী সন্ধ্যা গিয়েছিলেন বরণ করতে। তারপর থেকেই ঢাক বলছে, ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর মা’বি বিসর্জন। একঘেয়ে বেজে যাচ্ছে ঢাক দুটো। এই স্বর্গছেঁড়ার পুরোনো ঢাক। এখনও মাইক ঢুকতে দেয়নি শ্যামাকাকারা। আশেপাশের জালগাগুলোর মধ্যে স্বর্গছেঁড়ার পুজোর নামডাক বেশী। পুজোটা বনেদী।

ঠিক এইসময় শ্বিজদাস দেখতে পেল হারু ঘোষ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে। সোজা-হয়ে বসল ও। শালা এদিকে আবার আসে কেন? সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকাকারদের মৃদু মনে পড়ে গেল ওর। আজ সকালেই দল বেঁধে এসেছিল ওরা।

হারু ঘোষ এক লাফে দোকানে উঠে এল। তারপর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে শ্বিজদাসের দিকে হাত বাড়াল, ‘দেশলাইটা দিন তো?’

পা থেকে মাথা অবধি চিড়বিড় করে উঠল। ভীষণ ঝড় বেড়ে গেছে তো আজ-কাল। কিন্তু ততক্ষণে ওর হাত চলে গেছে ড্রয়ারের মধ্যে। সিগারেট খায় না। নিজে কিন্তু পেছনের দেওয়ালে রাখা গণেশের পিঠে দাবলা ধূপ জ্বালতে হয়। শ্বিজদাসের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরাল হারু। তারপর সামনের টেবিলে একটা পা ভাঁজ করে বসল, আজ সকালে ওরা এসেছিল কেন?’

‘কারা?’ চমকে উঠল শ্বিজদাস। শালারা খবর পায় কি করে!

‘শ্যামাকাকাদের গুন্টি! আমাকে তাড়াতে বলল?’

‘হুঁ!’ মাথা নাড়ল শ্বিজদাস, ‘গেলেই তো হয়।’

‘বাড়িটা কার? ভাড়া দিই কাকে? ওদের বলে দিতে কি হয়েছিল। সেখানে গিয়ে কথা বলতে। সে হিম্মত তো কোন শালার নেই।’ ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ল হারু, ‘সব শালার কেছা জানি আমি। ট্যান্সি ড্রাইভার রতনা সাক্ষী দেবে। এখন এসেছে সতীষ মারাতে। যাক, আপনাকে সাক্ষ বলে দিচ্ছি, এসব ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আজ বিকেলে ওদের ঠাণ্ডা করবো আমরা।’ যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল ও। তবে এবার ভেতর দিকে। দোকানের পেছন দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। একটু পরেই হাসির আওয়াজ শুনতে পেল শ্বিজদাস। সীতা না রমলা? রমলা সীতার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। কিন্তু এখন গলার স্বরে পার্থক্য বোঝা যায় না। পেছন থেকে দেখলে শ্বিজদাসই মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে। ছেলেবেলায় রমলা বলত আমি মায়ের মেয়ে। এখন বলে সীতা ঘোষের মেয়ে। না হাসিটা তরিই, রমলা না, তিনিই হাসছেন।

শ্যামাকাকারা বলে গেছে হারু ঘোষকে নোটিস দিতে। সামনের পয়লা থেকে ঘর খালি করে দেয় যেন? স্বর্গছেঁড়ার তেরাস্তার মোড়ে এই দোকান, দোকানের উপর কাঠের বাড়ি, পেছনে বাগান আর বাড়ি—শ্বিজদাসের বাবা ধর্মদাস ঘোষ করে গিয়েছিলেন। আর কি জানি কেন মরার আগে বড়োর কি ভীমরতি হয়েছিল ভালোবেসে বউমাকে সব লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তখন অবশ্য বউ মাথায় ঘোমটা দিত, হারু ঘোষ আসেনি স্বর্গছেঁড়ায়।

এই স্বর্গছেঁড়ায় জন্মেছে শ্বিজদাস। জন্ম অবধি জায়গাটাকে ও একটু একটু করে বাড়তে দেখেছে নিজের মত। ধর্মদাসের আমলে সন্ধ্যার পর তেরাস্তার মোড়ে আসত না কেউ। পাশের খুঁটিমারির জঙ্গলে তো এখনও হাতি আসে, খাস টাইগার দেখা যেত তখন। রাস্তাই ছিল না বলতে। একটু একটু করে সব হল। পাশের জঙ্গলের কাঠ কেটে তস্তা বানাতে মিল বসল, মিলিটারিদের ক্যান্টনমেন্ট বসছে কয়েক ক্রোশ জমি জুড়ে বিনাগুড়িতে। বাস, স্বর্গছেঁড়ায় হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে লাগল। সেলুন, দাঁজর দোকান এমন কি রেডিও সারাই। সন্ধ্যার পর জমজমাট। আর তেরাস্তার মোড়ে আগে যেখানে ভবানী মাস্টারের ভাঙ্গা ঘর ছিল সেটাই ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুঁছিয়ে দোকান করতে এল এই হারু ঘোষ। ফটোর দোকান। জলপাইগুড়ির ফটোর দোকানে কাজ শিখে এই প্রথম নিজের বাসায় শুরু করেছে। শুরুরে তো অবাক শ্বিজদাস। স্বর্গছেঁড়ায় ফটো তুলবে কে? সব তো মাদিসিয়া কুলিকামিন। জন্ম থেকে চা বাগানে খাটে। তাই শ্বিজদাসের তখন মাথায় ঘোমটা দিতেন অবশ্যই বাইরে বেরুলে। মা মেয়েতে ছবি তুলিয়ে এলেন প্রথম দিনই। সেই হল কাল। পেছনের বাগানটা খালি পড়ে ছিল। মাসিক দশ টাকা ভাড়া নিয়ে চলে এল হারু ঘোষ। সেদিনটা স্পষ্ট মনে আছে শ্বিজদাসের শতরঞ্জিতে বাঁধা

বিছানা আর একটা এয়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে দোকানে ঢুকেছিল হারু। তারপর সেগুলো মাটিতে রেখে প্রায় পেন্সাম করতে এসেছিল হাত বাড়িয়ে। ‘হাঁ হাঁ করছ কি’—প্রায় ছটকে উঠেছিল শ্বিজদাস। তখনও এত চাঁব জমেনি শরীরে।

‘বউদির শরীরে বড় মায়া। ওই ছোট দোকানঘরে কি থাকা যায় বলুন! উনি তো অবাক। ও, আমার নাম হারু ঘোষ—ছবি তুলি। তা আপনাদের বাগান-ঘরটা বউদি আমায় ভাড়া দিয়েছেন। উনিই তো এই সীতা মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক—না?’ মৃদু কান্নামাছু করে বলেছিল ছোকরা।

বিস্ময়ে চোখদুটো রসচেপা রসগোল্লা হয়ে গিয়েছিল শ্বিজদাসের। ভাড়া দিয়ে দিল ঘর আর তাকে জানালো না। তাও আবার এই লপেটা ফটোগ্রাফারকে। ততক্ষণে দশটা টাকা পকেট থেকে বের করে হারু গিয়ে ধরেছে, ‘নিন অ্যাডভান্স।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো শ্বিজদাস, ‘যে ভাড়া দিয়েছে তাকেই দেবেন।’

‘ও!’ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সযত্নে টাকাটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল হারু। তারপর বোঁচকা দুটো দ্ব-হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল সটান। যেন চৌদ্দপুরুষের বিছানা এটা। হাঁটাটা এত ফুটানিমায়া। হাঁক শুনিয়েছিল শ্বিজদাস, ‘বউদি এসে গেলাম, এবার চা খাব একটু।’

হারু ঘোষের বয়স পঁচিশের নিচেই। পনের বছর আগে শ্বিজদাস ওরকম চেহারার ছিল। ছিমছাম চেহারার শ্বিজদাস। এটুসখানি বউ সীতাকে নিয়ে ধর্মদাস জলপাইগুড়ি থেকে ছবি তুলিয়ে বাঁধিয়ে এনেছিল। রাত্তির বেলায় ঘরে ঢুকে শ্বিজদাস দেখে ছবির কাঁচের ওপর সীতার কপাল জুড়ে গোল সিঁদুরের টিপ। নিচে লালচন্দন দিয়ে লেখা পতি পরম গদরু। আর তখন রাত হত সন্ধ্যা থেকেই। ইলেকট্রিক আসেনি তখনও স্বর্গছেঁড়ায়। সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দরজায় খিল দিত সীতা—কিছুতে হ্যারিকেন নেভাবে না। তারপর সেইবছর না ঘুরতেই রমলা হয়ে গেল। রমলা এসে সীতাকে সুন্দর করে তুলছে দিন দিন। মেয়েছেলের অমন সুন্দর উপড় করা কড়াই-এর মত পিঠ দেখতে চাইলে সীতাদেবীকে দেখতে হয়। ফুড ইনসপেক্টর এসে দোকানের মালিকের নাম উচ্চারণ করেছিল—সীতাদেবী। আর তারপর থেকে কখন কেমন করে সীতাদেবী হয়ে গেছে—শ্বিজদাস এখন বইকে সীতাদেবী বলে ভাবে। ডাকাডাকি চুকে গেছে অনেক দিন। কথাবার্তা হয় কি হয় না। তেমন দরকার পড়লে রমলা আসে। তবে রোজের হিসেব—মানে এই দোকানের বিক্রি-বাটার টাকা রাত্তিরে গিয়ে দিয়ে আসে ও নিজেই। রাত দশটার সময় দোকান বন্ধ করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে শ্বিজদাস। রেডিওতে খবর হয় তখন। হিসেবের কাগজ আর টাকাটা গাটারে বেঁধে টেবিলের ওপরে রেখে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় সে। কাঠের বাড়িতে শ্বিজদাসের পায়ের শব্দ শরীরের ভায়ে মচ্ মচ্ করে। বড়ো বাপ মরার আগে এ নিয়ম করে গিয়েছিল—‘যা কিছু বিক্রি হবে তা এই বউমাকে দেবে রোজ। লক্ষ্মী বাঁধা থাক লক্ষ্মীর কাছে। খরচা রাখবে নিজের কাছে—লাভ বউমা জমা করবেন।’ সীতাদেবী এসে নাকি সব

কিছু সোনা করে দিয়েছে—বুড়োর এরকম ধারণা ছিল। তা একদম—কি যে সব হয়।

ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন—দশ আংগুলে টেবিলে বোল তুলল ম্বিজদাস। পেটে বায়ু হচ্ছে আজকাল। এক জায়গায় বসে থাকা, একদম নড়াচড়া নেই। বায়নার কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলালো একবার। মোট দু হাজার চারশো ত্রিশ টাকার বায়না আছে। মাল নিতে আসবেন বাবুদা ঠাকুর জলে পড়লেই। আর তখন খুচরো বিক্রি অনেক সময় বায়নাকে ছাড়িয়ে যায়। নিঃশ্বাস ফেলার জো থাকে না তখন। অবশ্য নরেশ দশ হাতে সব ম্যানেজ করবে নিশ্চিত। তবু শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে হবে ম্বিজদাসকে।

রোদের তেজ কমছে। একটু একটু হাওয়া ছাড়ছে উত্তর দিক থেকে। শিশুর দাঁতের মত হিম মেশানো তাতে। ভূটানের পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় কুয়াশা চাঙড় বাঁধছে। নতুন জামাপরা বাচ্চাগুলো হই-চই করছে মোড়ে। কিন্তু ওরা কেউ নেই এখন। ভাল করে দেখল ম্বিজদাস হারু ঘোষের দল আজ তেমাথায় আন্ডা দিচ্ছে না। হঠাৎ একটা জীপের আওয়াজ কানে এলো, ম্বিজদাস দেখল পাদানীতে একটা ঠ্যাঙ বের করে বসে বড়বাবু আসছেন। সাত মাইল দূরে হৃদয়পুরে থানা। ম্বিজদাস তাড়াতাড়িতে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা ফতুয়া উল্টো করে পরতে পরতে সামলে নিল। শালা পেটের কাছে বোতামটা কখন ফস হয়ে গেছে। অনেক-খানি সাদা চামড়া লোম নিয়ে উদ্যম হয়ে থাকে।

শব্দ করে জিপটা এসে থামল দোকানের সামনে। কোনরকমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ম্বিজদাস হাতজোড় করল, ‘আরে কি সৌভাগ্য, বড়বাবু যে, আসুন আসুন।’ মাথা থেকে টুপি খুললেন বড়বাবু, তারপর চারপাশে একবার নজর ঝুলিয়ে বললেন, ‘খবরটবর কেমন?’

একটু চুপসে গেল ম্বিজদাস। কি খবর, কিসের খবর! দোকানের পেছনে ভিয়েনের পাশেই রেশন দোকান থেকে ব্র্যাকে আনা এক মণ চিনি পড়ে আছে যে। কি আশ্চর্য নরেশটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান হয়। মাথা দোলাল ও, ‘ভাল, আপনার আশীর্বাদে—।’

‘কিসব মান্তান ফাস্তান নাকি এসেছে—তারা কোথায়? পৌদের চামড়া তুলে ঢাক বানাবো—বলে দেবেন সব কটাকে। কে এক হারু ঘোষ নাকি আছে—সে কি করে? বড়বাবু জিপে বসেই চোখ কোঁচকালেন। পাশে শব্দ হতেই ম্বিজদাস দেখল নরেশ একটা প্লেটে চারটে আট আনা সাইজের কমলাভোগ আর চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুমো খেতে ইচ্ছে হলো শব্দটুকোটা, শালা ঝুলিয়ে রাখা ফতুয়ার মাথার মত মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। চট করে প্লেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবুর সামনে ধরল সে, ‘ফটো তোলে।’

‘ফটো তোলে?’ নথর মিষ্টিগুলোর ওপর চোখ ঝুলিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি বিঁধিয়ে মিষ্টি তুললেন বড়বাবু। রস টপ টপ করে পড়ছে।

কাঠির ডগায় মিষ্টিটাকে নাচিয়ে মদুখে পদুরে চোখ বন্ধ করে বললেন, ‘লীলা করেন বলুন।’ মিষ্টির জন্য কথাগুলো জড়িয়ে গেল। প্লেট ধরে থাকল শ্বিজদাস। বড়বাবু এক এক করে তুলে নিচ্ছিলেন এমন সময় কান্ডটা ঘটে গেল হঠাৎ। কোথেকে একটা কাক ছৌঁ মেয়ে শেষ মিষ্টিটা তুলে নিয়ে গেল আচমকা। তার ডানার স্পর্শে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে শ্বিজদাসের হাত থেকে প্লেটটা মাটিতে পড়ে উপদ্রুত হয়ে থাকল। ভয়ে ভয়ে কাকটার দিকে তাকাল শ্বিজদাস। ওরই দোকানের সাইন-বোর্ডের ওপর বসে মিষ্টি ঠোকরাচ্ছে সেটা। আর তখনই একটা হই হই হাসির শব্দ কানে এলো ওর। কে হাসে? কোন দোকান থেকে? কিছুই হয়নি এমন ভান করে রুমালে মদুখ মদুহতে মদুহতে বড়বাবু বললেন, ‘গলাটা কার, চেনেন?’ ঘাড় নাড়ল শ্বিজদাস।

‘কি চেনেন তাহলে, রাবিশ!’ বলে জ্বাইভারকে ইশারা করলেন বড়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিপটা চলে গেল শ্যামকাকাদের বাড়ির দিকে।

ঠিক বদুতে পারাছিল না শ্বিজদাস, বড়বাবু এলেন কেন? শালা কাকটাও শত্রুতা করার সময় পেল না! ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। বোল তুললো সে দশ আঙুলে। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করল ও। হবে হবে, আজ শালাদের চামড়া ছাড়াবে। আহা হো হো। খুব আনন্দ হচ্ছে বন্ধুর মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখল রমলা দাঁড়িয়ে সামনে। থতমত হয়ে গেল ও। মেয়েটা দোকানে কেন? বেশ লম্বা হয়েছে তো। ঠিক মায়ের মত চুলের গোছ। ‘কিছু চাই মা?’ আদুরে গলায় বলল শ্বিজদাস। মাথা নাড়ল রমলা, ‘না, মা বলল, দুটো টাকা বিক্রীর খাতায় জমা করতে। চারটে কমলাভোগ।’ বলে গট গট করে ভেতরে চলে গেল। রমলার পেছন দিকে তাকাতে কেমন কান্না পেয়ে গেল শ্বিজদাসের।

টুকটাক গোলমাল চলছিল অনেক দিনই। ধর্মদাস বেঁচে থাকতেই। তখন বদমায়েসী করত অন্যভাবে! রান্ধিরে হিসেব চুকিয়ে ওপরে উঠে ঘরে গিয়ে দেখত সীতাদেবী শূন্যে আছেন। গরমকালে এখানে বেশ গরম পড়ে। ছোট রমলা মায়ের গা ঘেঁষে শূন্যে। জায়গা কম বলে পাশের খাতে শ্বিজদাস। বড় গরম সীতাদেবীর। রান্ধির বেলা শোবার সময় শূন্য তলার জামা পরে শূন্যে। কদুতুকতু চোখে দেখতে নিজের খাতে শ্বিজদাস। হ্যারিকেন জ্বলতো ঘর। তারপরে এক সময় উঠে গিয়ে চুপি চুপি সীতাদেবীর পাশে বসত। শরীর তখন মোটা হতে আরম্ভ করেছে। উত্তেজনায় হাঁপ ধরত বন্ধুকে। ঘাপটি মেয়ে শূন্যে থাকতো সীতাদেবী। কোনরকমে হাতটা ছোটো জামার উপর রেখেছে কি না রেখেছে ভাঁ করে কেঁদে উঠতো রমলা। চিমাটি কেটে মেয়েকে তুলে দিত সীতাদেবী। তারপর উঠে বসে কোলে তুলে নিতো মেয়েকে, ‘আহা কেঁদোনা, কেঁদোনা—বাবা এসেছে দ্যাখো, তোমাকে আদর করবে বলে এসেছে—আহা হা—’ সুর করে করে বলত তখন। গলাটা থাকত বেশ উঁচুতে—অন্য ঘরে ধর্মদাসের কানে যেতে অসুবিধে

হতো না কথাগুলো। চুপচাপ ফিরে আসতো শ্বিজদাস নিজের খাটে। খুব জোরজারি করলে মূখ ঝামটা দিত সীতাদেবী, ‘সাকাসে নাম লেখাইনি তো যে বৃকে সাদা হাতি তুলবো।’

ধর্মদাস মারা যেতে প্রায়ই জলপাইগুড়ি যেত সীতাদেবী রমলাকে নিয়ে। বাপের বাড়ি। তখন লোকজনের মধ্যে শুনতো সে আজ রূপশ্রী কাল আলোছায়া—সীতাদেবী সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসতো নতুন নতুন সাজগোজ নিয়ে। এই স্বর্গছেঁড়ায় সীতাদেবীর মত স্টাইলিস্ট মেয়ে একটাও নেই। বড়বাবু একবার পুজোর সময় দেখে শ্বিজদাসকে বলেছিলেন, ‘আপনার ওয়াইফ তো মশাই বেশ মডার্ন।’ আর তখন থেকে খোঁজ নিতে শুরু করেছিল ও আসল ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই কেউ আছে পেছনে, সীতাদেবী যাকে নিয়ে মজেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কারো হৃদিস পায়নি ও। চরিত্রের এই দিকটা পুজোর বাসনের মত পরিষ্কার সীতাদেবীর। তখন একদিন ধরে বলেছিল ও, ‘কেন এমন করছ—আমি কি করেছি তোমার?’ মূখ ঝামটা দিয়েছিল সীতাদেবী, ‘আঃ প্লে করো না তো। আমার কাছে একদম ভিড়বে না বলে দিচ্ছি। ক্ষ্যামতা না থাকলে পুরুষ-মানুষ ভেড়ার যুগ্ম—মাথা কি সিঙ্গাড়ার পুর পোরা যে বোঝ না।’ আর তখন মনে মনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল শ্বিজদাস। শরীরটা যত মেদে ভরে যাচ্ছে ততই সব কিছুতেই হাঁপ ধরে যায়। সীতাদেবীর কথাটা এতটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে—চাঁবি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূতির তলায় আঁড়ারওয়ার পরার দরকার হয় না আজকাল। অবশ্য দোকানে ওর সাইজ কিনতেও পাওয়া যায় না ছাই।

শেষপর্যন্ত এই হারু ঘোষ এল। যেন এর আসার জন্যেই সীতাদেবী এত বছর ধরে এত সব কান্ড করেছে। এর আসার জন্যেই যেন ছিপছিপে শ্বিজদাসের এখন হাঁটতে কষ্ট হয়। সব কানে আসে ওর—তোমাথায় দোকান, কান খাড়া রাখলেই সব সেন্দেয়। প্রথম প্রথম ছোকরাগুলো বলত রমলা নাকি হারু ঘোষের লভে পড়েছে। হারুকে ঘরজামাই করবে সীতাদেবী। তারপর শোনা গেল সীতাদেবী স্বয়ং নাকি জলপাইগুড়িতে গিয়ে হারু ঘোষের সঙ্গে একা সিনেমা দেখেছেন। রমলা ছিল না সঙ্গে। দুপুরে রমলা যখন স্কুলে যায়; দোকান বন্ধ করে খেতে আসে হারু ঘোষ। খেয়ে সীতাদেবীর বিছানায় গুছায়। আর এই সব কথা যত ছড়াতে লাগল ভেতরে ভেতরে তত খুশী হল শ্বিজদাস। এইবার লোকে ধনু দেবে সীতাদেবীর মূখে। আঙুল তুলে দেখাবে, পুজোমন্ডপের কাজ করতে দেবে না—বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে না কেউ। এককালে স্বর্গছেঁড়ায় এসব নিয়ম ছিল। আর তখন এই শ্বিজদাসের পা ধরে দাঁতের হবে সীতাদেবীকে—সে দৃশ্য বৃকের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল শ্বিজদাস। কিন্তু এই চেনা স্বর্গছেঁড়াটা কখন যে এমন পাশে গেছে এটা জানা ছিল না ওর। বাইরে থেকে হু হু করে আসা লোকজন এই কথাগুলো কদিন আচার খাওয়ার মত ভোগ করল। বেমালুম চাপা পড়ে গেল সব। কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সীতাদেবী সবার

সঙ্গে হেসে কথা বলে—হাসে সবাই। এখন কালেভদ্রে হারুর সঙ্গে দেখা হয়। অথচ দৃষ্টিতেই একই বাড়িতে আছে।

কদিন আগে যখন ফটোর দোকানে কেছাটা হয়ে গেল তখন শ্বিজদাস ভেবেছিল এবার সীতাদেবীর ছানি কাটবে। বানারহাটের দূরটো মেয়ে নাকি এসেছিল ছবি তুলতে। দোকানে বসে শ্বিজদাস তাদের দেখেনি। ছবি তোলায় সময় হারু-ঘোষ ওদের গায়ে হাত দিয়েছে—সেই নিয়ে চিংকার চেঁচামেচি। কিন্তু সবার চেয়ে হারু ঘোষের গলা ছিল ওপরে। মেয়ে দূরটো যত চেঁচায় হারু তার চেয়ে বেশী। শেষপর্যন্ত পাঁচজন গিয়ে থামিয়ে দিল। এই পাঁচজন আবার হারুরই সাক্ষরদ। রাত্রি বাড়ি এলে সীতাদেবী হারুকে বলেছিল, ‘মেয়ে দূরটোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কী চিজ—একটু ভাল রকম শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল।’ কুয়োয় জলে মূখ ধুতে ধুতে নিজের কানে শুনছে শ্বিজদাস। শূনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছে। ইদানীং যত উঠতি মেয়ের দল ভীড় জন্মায় ফটোর দোকানে। শাড়ি পরব পরব কি ছবি তোলা চাই। তাজমহল আঁকা পদার সামনে বসিয়ে হারু নাকি ছবি তোলে। চিবুকে হাত দিয়ে মূখ ঠিক করে দেয়। এই শ্যামাকাকার ছেলে নতুন বিয়ে করে বউকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়েছিল ওখানে, তখন নাকি দূবার শাটার টিপেছিল হারু। শ্যামাকাকার সন্দেহ দূবার ছবি তুলেছে ও প্রথমবার দৃষ্টির, শ্বিতীয়বার ছেলেকে বাদ দিয়ে শুধু বউয়ের—বুঝতে দেইনি ছেলেকে।

দোকানে ভীড় বাড়ছে। মিষ্টি বিক্রী শুরুর হয়ে গেল। ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং ড্যাং—বানারহাটের ঠাকুর লরিতে চেপে এসে গেল। রাস্তায় নেমে পড়েছে লোকজন। ভাসানের ঘাটে চলছে সবাই। বিরাট মেলা বসে ঘাটে। ভেঁপু বাজিয়ে তেচাকার সাইকেল রিক্সাগুলো ছুটোছুটি করছে এখন। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর এখনও মন্ডপে—ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। মাথার ওপরে কোন শব্দ নেই কেন? সাজগোজ হয়ে গেলে তো এবার বেরিয়ে পড়ার কথা। কাঠের সিলিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে বিক্রীর পয়সা গুনতে লাগল শ্বিজদাস। ‘হাত চালাও হে নরেশ বিসর্জন হলো বলে।’ চেঁচিয়ে বলল ও যেন ওপরের ঘরে তেনার কানে যায়। শ্যামাকাকার আজ তৈরী। এই স্বর্গছেঁড়া নিজের হাতে করে গড়েছেন শ্যামাকাকার। সেখানে এই সব ভুঁইফোড় ছোকরারা যা হচ্ছে করবে তা হতে দেওয়া যায় না! সকালে শ্যামাকাকা বলছিলেন রেজার সাহেবের মেয়ে আর পোস্টঅফিসের একটা ছোকরাকে নিয়ে হারু গিয়েছিল খুঁটিমারীর জঙ্গলে ছবি তুলতে। কয়েকটা মদেসিয়া নাকি দেখেছে। বিব্রী বিব্রী ছবি সব সিনেমার মত। আজ রাতে হারুর দোকান তল্লাসী করা হবে।

এইটে শোনার পর কেমন ভাল লাগছিল না শ্বিজদাসের। সে জানে ছোকরার ডাক'রুমে তার কি ছবি আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়। রেজার সাহেব এসেছিলেন শ্যামাকাকার সঙ্গে। পোস্ট অফিসের ছোকরাকেও আজ ছাড়া

হবে না। গত বছর ভাসানের দিন ওরা মদ খেয়ে মেলায় কার গান্নে হাত দিয়েছিল। এবার সেইরকম একটা কিছু করলেই হয়। হবে, কারণ কাল হারু এক বেলা সামাচি গিয়েছিল এয়ারব্যাগ নিয়ে। সামাচিতে মদের কারখানায় সস্তায় সব পাওয়া যায়—এ খবর পেয়ে গেছেন শ্যামাকাকারা।

নড়েচড়ে বসল শ্বিজদাস। ঢাক বাজছে জোরে। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর মণ্ডপ ছেড়ে বের হল। ডাকের সাজ—মা মা আবার এসো। মনে মনে বলল শ্বিজদাস। তেমাথায় এসে গেল ঠাকুর। মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয়। সবার সামনে শ্যামাকাকারা হেঁটে যাচ্ছেন। ঠাকুর যাবি বিসর্জন—মা দুর্গা যেন ছলছল চোখ করে শ্বিজদাসকে দেখে গেলেন। পেছন পেছন ঢাকি চলে যেতেই তেমাথা চুপচাপ হয়ে গেল। রাজ্যের লোক গিয়েছে ভাসানের ঘাটে। এখন ঠাকুর আসছে আশেপাশের বাগানগুলো থেকে।

এই সময় শ্বিজদাস উঠে দাঁড়াল। ওপরে সাড়াশব্দ নেই কেন? যাবে না কি? এরকম তো হয় না। বুকের ভিতর ছটফট করছে শ্বিজদাসের। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। আহা ভাসানের ঘাটে যদি ও থাকতে পারতো! কিন্তু এখন এই দোকান ছেড়ে যাবে কি করে ও।

সময় চলে যাচ্ছে। ভূটানের পাহাড়গুলো আকাশের নীলে মিশে গেছে এখন। সন্ধ্যার অন্ধকার আসতে না আসতেই জলঢাকা থেকে আসা বিদ্যুৎ রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময় সেই পার্থিব শব্দ কানে এল শ্বিজদাসের। ভাসানের ঘাটে হই হই শব্দ। কি হল? উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে ওর। দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল অনেকে ছুটে আসছে। কি হয়েছে হে? চিৎকার করল শ্বিজদাস। মারামারি—জোর মারামারি বেধে গেছে! বড়বাবুর জিপটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, সাঁ করে মোড় ঘুরে ঘাটের দিকে চলে গেল। ছেলে বড়ো বাচ্চা মেয়ে সব পালিয়ে আসছে ঘাট থেকে। ফণী পিওনকে দেখে কাছে ডাকল শ্বিজদাস, 'কি ব্যাপার হে?'

'শ্যামবাবুর মাথা ফেটেছে। ওদের তিনজন শুলেছে। একটা লাঠি আছে আপনার কাছে, লাঠি?' উত্তেজনায় কাঁপছিল ফণী পিওন।

আর তারপরেই দেখতে পেল শ্বিজদাস। বিরাট একটা ভিড় এগিয়ে আসছে তেমাথার দিকে। ভিড়টার মাধ্যখানে বড়বাবুর জিপ। সেই সঙ্গে চিৎকার চলছে সামনে। ভীড়ের মধ্যগুলো দেখল ও—আঃ, সব চেনামুখ। হারু ঘোষ অ্যান্ড পার্টির কেউ নেই এর মধ্যে। এ তো রেঞ্জার সাহেব, দাশু রায়, স্কুলের মাস্টার-মশাইরা। জিপটা ঠিক তেমাথায় এসে দাঁড়াতেই শ্যামাকাকা নেমে দাঁড়ালেন। শ্বিজদাস দেখল কপালে ছেঁড়া কাপড় ব্যান্ডেজ করে বাঁধা। তার একটা পাশ লাল হয়ে আছে। শ্যামাকাকা পাশের একজনকে ক্রি বলতে সে ছুটে গেল রিকশা স্ট্যাণ্ডে। সমস্ত তেমাথা গিজ গিজ করছে লোক। এমন কি ওর এই মিষ্টি দোকানের সিঁড়িতেও লোক দাঁড়িয়ে। বৃত্তের মত ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই জিপটাকে

লক্ষ্য করছে। একটা রিকশাকে টানতে টানতে হাজির করা হল জিপটার পাশে। সবাই চুপচাপ দেখছে। আশেপাশের চা বাগানের দ্বারা ভাসানে এসেছিল তারাও আছে ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ শ্যামাকাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিপে বসা বড়বাবুর দিকে জোড়হাত করলেন, ‘হুজুর, সমবেত স্বর্গহেঁড়ার মানুষজনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আবেদন করছি হারামজাদাটাকে একবার রিকশার ওপরে দাঁড়াতে দিন। সবাই একটু দেখুক।’ বড়বাবু কি বলতে শ্যামাকাকা নিচু গলায় উত্তর দিলেন। তারপর হঠাৎ দেখা গেল হারদু ঘোষ জিপের পেছন থেকে নেমে আসছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে শ্বিজদাস দেখল হারদু ঘোষের জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গোঁজি ছিঁড়ে পেট দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল উম্মো খুম্মো। একটা চোখ ফুলে ঢেকে গেছে। কিন্তু শালা হাঁটছে দেখে—যেন শাজাহান। কারো দিকে না তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে এসে রিকশায় উঠে দাঁড়াল হারদু ঘোষ। আর কি আশ্চর্য রিকশায় উঠেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা হই-হই করে উঠল। অথচ কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সিগারেট টানতে লাগল হারদু। হ্যা হ্যা করে হাসছে অন্য বাগানের লোক। দাশু রায় আর পারলেন না, ছুটে গিয়ে চড় মারলেন হারদুর গালে। রিকশায় দাঁড়িয়েছিল বলে মাথাটা সরিয়ে নিল ও সময়মত। চড়টা কাজে লাগল না বলে আর একজন এগিয়ে এল। কে যেন চিৎকার করল, ‘বেচন হাজামকে ডেকে ওর মাথা কামিয়ে দিন।’ ওদিকে হারদুর ওপর অনেকগুলো হাত নামা ওঠা করছে। ঠাকদুর থাকবি কতক্ষণ—ঢাকের বোলের তালে তালে শরীর দুর্দুলিয়ে শ্বিজদাস কি মনে হতেই হাত বাড়িয়ে নরেশকে ডাকল। নরেশ আসতেই শ্বিজদাস উত্তেজনায় দুর্দুলতে দুর্দুলতে ফিস ফিস করে বলল, ‘ছুটে যা, গিয়ে শালাকে এক থাপ্পড় মারবি বাঁ চোখে। ওটা ফোলেনি।’

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল নরেশ। তারপর কাঠের দোতালার দিকে দেখল। ‘যা, আমি তোরা মনিব আমি বলছি।’ বৃকে হঠাৎ সাহস এসে গেল শ্বিজদাসের। দাবড়ানি দিয়ে ঠেলে পাঠাল নরেশকে। শব্দটুকো শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটে গেল নরেশ রিকশার দিকে। ‘মার মার’ মনে মনে চেঁচাচ্ছিল শ্বিজদাস হাতের নাগাল পাচ্ছে না নরেশ। শালা যা বেঁটে। দূর হাতে মূখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে হারদু। সমানে কিল চড় পড়ছে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়ছে না। লাফিয়ে লাফিয়ে বড়ো নরেশ হাত চালান, কিন্তু নাগাল পেল না। সারা শরীর দুর্দুলিয়ে হা হা করে উঠল শ্বিজদাস। যেন ও নিজেই মারতে পারছে না। কি করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে চলে এল নরেশ, ‘হাত পাচ্ছি না, দাদাবাবু বড় লম্বা।’ ‘দাদাবাবু’ সারা শরীর জ্বলে গেল শ্বিজদাসের। বাঁ পায়ে হেঁড়া চটিটাকে ছুঁড়ে দিল ও। ‘নে, শালাকে জুতো পেটা কর, আমার জুতো দিয়ে, আমি দেখব।’ না পারলে তোরা একদিন কি আমার।’ বেচন হাজামকে কে যেন ধরে আনছে। চোঁ চোঁ করে

ছুটে গেল নরেশ। রিকশার কাছে ভিড়ের ফাঁক গলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে শ্বিজদাসের—আহা! হাত তুলল জুতো নিয়ে নরেশ, এই পড়ল হারান্নর গালে, ওকি, ধরে ফেলেছে যে শালা। জুতো সুন্দর হাত ধরে ফেলেছে। ততক্ষণে ওকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে বেচন হাজামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে এল নরেশ, ধরে ফেলল, ‘ধরে ফেলল যে হাতটা। আমি কি করব।’ কাদো কাদো হল নরেশ।

‘আমার জুতো, জুতো কোথায় ফেললি হারামজাদা, নিয়ে আয়, আমার জুতো নিয়ে আয়—যা।’ চিৎকার করে উঠল শ্বিজদাস।

আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে ওপরের জানলা খুলে গেল। নরেশের ঘাড় ধরেছিল শ্বিজদাস, থমকে গেল। জানলা খোলার শব্দ হতেই আচমকা চুপ মেরে গেল তেমাথা। সবাই মূখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে ওপরে। শ্বিজদাসের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই গলাটা কানে এল, ‘নরেশবাবুকে বলো ছেঁড়া জুতো আর আনতে হবে না। তুমি ভেতরে এসো।’ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুং করে ঢুকে গেল নরেশ। গিয়ে শো-কেসের পেছনে বসে হাঁপাতে লাগল।

অসহায়ের মত শ্বিজদাস দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর পা টেনে টেনে ভেতরে এল। সারা শরীরে কুল কুল করে ঘাম দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তেমাথার জনতা এখন হারান্ন ঘোষকে নিয়ে ব্যস্ত। শ্বিজদাস চোখ তুলে দেখল পেছনের দরজার সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া পা, হাঁটু, কোমর, বুক, শেষে মূখ নেমে এল। সীতাদেবীর মাথায় ঘোমটা, জরির পাড়। মূখ নিচু করতে করতে শ্বিজদাস শুনতে পেল, ‘এই বয়সে এত উত্তেজনা তোমার মানায়—ছিঃ।’

ভাসানের ঘাটে দুর্গাঠাকুর একক্ষণে জলে নামলেন।

জিহ্মান মাছ

চা চুরির জন্য চাকরীটা চলে গেল বংশীর। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছুর
গুরুতর নয়, সবাই চুরি করে, কেউ সাধু নয়। মেয়েগুলোর সন্নিবেশে একটু বেশী,
আংুরার তলায় পুঁটলি বেঁধে বেশ নিয়ে যায়, চৌকিদার শালা তখন চোখ বন্ধ
থাকে। পোয়াতি মেয়েদের তো পোয়াবারো, তলপেটের সঙ্গে সাইজ মিলিয়ে
ওপর পেটে চা বেঁধে নেয়। বিরাট গুদামে পাহাড় করা চায়ের পাতা, কাঠি
বাছাই চলছে দিনরাত। গাদা গাদা কামিন আর বড়ো কুলিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
বসে। চারধার টাটকা চায়ের গন্ধে ম-ম করছে। বাছাই চায়ের প্যাকিং চলছে
একধারে। ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে পেরেকের। মাঝে মাঝে গুদামবাবু টহল দিয়ে
যাচ্ছে মশমশ করে পাতা ভিঙিয়ে। কামিনদের কাঁথের বাচ্চাগুলো পা ছড়িয়ে
সেই চায়ের ওপর গু-মুত ছড়াচ্ছে—তার বেলা কিছুর নয়, শব্দ বংশী যখন আর
না পেরে কয় মূঠো পাতা চা কৌচরে ভরে ছুটির ভেঁ বাজলে যেই বেরুতে গেল
সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদার শালা ওর পেট ধরল খামচে। এ্যাশ্বিন পাতা তুলতো বংশী।
পিঠে ঝুড়ি নিয়ে ট্রাকে চেপে চলে যেত খুঁটিমারী ডিম-ডিম্বার ধারে। সারা দিন
পাতা তুলে সম্ভ্যয় ফিরে আসতো গুদামে। পাতিবাবু ওজন করে পাতা নিতো
দেখে শব্দে। ব্যাস ছুটি। সেই কাঁচা পাতা কি করে চেহারা পালটে ম-ম গন্ধ
ছড়ানো চা হয়ে যায় কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। তাগড়া জোয়ানদের
গুদামের কাজে নেওয়া হয় না। কিন্তু সেদিন আংরাভানার গায়ে চা পাতা তুলতে
গিয়ে সেই শালা গোলাপটা এমন চোট দিল পায়ে যে তিনমাস হাসপাতালে ওষুধ
গিলতে হল ওকে। বেরিয়ে আসার পর হাঁটতে গেলে খোঁড়াতে হয়। দগদগে ঘা
শুকিয়ে গেলেও পা-টা হয়ে আছে কাঠির মতন লিকলিকে। শরীরে তাগদ বলতে
কিছুর নেই। কোনরকমে গুদামে কাজ মিলল ওর। আরামের চাকরী। হতা
গেলে পেট ভর্তি ভাতের টাকা মেলে, সুরজপ্রসাদের ভাঁটিখানায় এক ঘণ্টা
হাঁড়িয়াও কুলিয়ে যায়। তিন নম্বর কুলি লাইনের শেষ ঘরটায় সারা রাত নেশা
করে শুয়ে থাকে বংশী। বোটা ছেলের বয়সী একটা মিস্ট্রীর সঙ্গে ভেগে গেছে
বিনাগাড়ি। বেশী দূরে নয়, ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারে। কিন্তু
ইচ্ছেটাই হয় না। বোটা এ্যাশ্বিন ছিল বাঁজা, গতর টসকানি। উড়ো খবর আসে,
এবার নাকি বিয়োবে। যারা খবর দেয় তারা বংশীর দিকে তাকিয়ে মূর্চ্চক মূর্চ্চক
হাসে। ভাবখানা এমন, তোমার কেরামতি ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু সে সব ব্যাপার
নিয়ে মাথা ঘামায় না বংশী। মেয়েছেলের জাত পোষ মানে না কখনো। পুরুষ-
মানুষ যদি পেট আর দিলে সুখ রাখতে পারে—চাই কি আর! পেট ভরলেই তো

দিল ভরে। কিন্তু শালা সোনিরাম মৃদু লোভ দেখাল, ওরে বংশী শুনলাম গুদামে কাজ করছি, নিয়ে আয় চা মৃদু কতক দশ টাকা কিলো দেব।' ব্যাস লোভ শালা হলে সাপের মত লিকলিকিয়ে উঠল সারা গায়ে। মাত্র তিন মৃদু চায়ের জন্য চাকরী খতম করে দিল গুদামবাবু। এক বোতল হাঁড়িয়ার দাম হতো চা-টায়। কপালে যা বাঁধা তার বেশী চাইতে গেলেই ফেঁসে যেতে হয়—কেউ যদি এ খবরটা আগে বলে দিত।

ধরা পড়ার পরই হয়ে গেল কেচ্ছাটা। চৌকিদার তো ওর কোঁচরে হাত রেখে চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে, ছাড়াবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল বংশী। গেটের সামনেই নালি—সোজা চলে গেছে আংড়াভানায়। নালির ওপর সিমেন্টের বাঁকানো সাঁকোর ওপর চলছিল ধস্তাধস্তি। দৃশ্যটা দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে আসছে। মন্দোনিয়া কুলিকামিনের দল ভিড় করে মজা দেখছে। দাঁত বের করে মেয়েগুলো চলে পড়ছে। গুদামবাবু আর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকে এদিকে আসতে দেখে পেটের গিঁট খুলে দিল বংশী। আর সঙ্গে সঙ্গে বদুর বদুর করে পাতাগুলো পড়ল নালিতে, পড়ে ভেসে চলল। যদি ভুবে যেত তলায় তাহলে গুদামবাবু দেখতে পেত না, প্রমাণ থাকতো না কিছুর। সঙ্গে সঙ্গে নাম কাটা গেল খাতা থেকে। ছিঁচকেমির ব্যাপার বলে দশ মাইল দূরের থানায় খবরটা দিল না কেউ। ভিড় হালকা হয়ে গেলে বংশী দেখল বাবুরা ছুটি পেয়ে দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কুলিকামিনরা চা-বাগানের হাঁটা পথে ফিরে যাচ্ছে লাইনে। আর সামনের শিরিষগাছের একটা নিচু ডালে বসে বুক ফুলিয়ে একটা ঘুঘু ওর দিকে তাকিয়ে শেষ বার ডেকে নিচ্ছে।

সারাদিন ঘরে শুয়ে বসে কাটাল বংশী। সেই ভোরে ভোঁ বাজতেই লাইন খালি করে মেয়ে-পুরুষ বোরিয়ে গেছে কাজে। হাসপাতালে থাকতে এতো কষ্ট হয়নি আজ মটকা মেরে পড়ে থাকতে যেমনটা হয়েছিল। এই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আজ নয় কাল ওরা ছেড়ে দিতে বলবেই। বাগানে যারা কাজ করবে তাদের জন্য ঘর দেওয়া হয়। একাবেলা রাঁধে লাইনের সবাই। রাত্তিরবেলায় গরম গরম ভাত খেয়ে বাকিটা জ্বলিয়ে পরদিন কাজে নিয়ে যায়। কিন্তু কাল রান্না হয়নি কিছুর। মেজাজ ছিল না। দু'একজন এসেছিল উপায় বাতলাতে, ম্যানেজার কিংবা বড়বাবুর কাছে ধরাদার করতে। একটা ইউনিয়ন আছে ওদের, কিন্তু হাতেব্যাঁত ধরা পড়া চুরির কেস নিয়ে কিছুর করবে না ইউনিয়ন।

ঠা ঠা দুপুরে ঘরের বাইরে এল বংশী। বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলে পায়ের ব্যথাটা বাড়ে। হাঁটাচলার মধ্যে থাকলে ঠিক হয়ে যায়। খালি গায়ে একটু জ্বরো জ্বরো ভাব লাগছে। টানাটানিতে ধূতিটা কলি ফেঁসে ফেঁসে গিয়েছিল। পাত্তি তোলার সময় যে ঢলঢলে খাঁকি হাফপ্যান্টটো পরতো সেটাই গলিয়ে নিয়েছে এখন। প্যান্টে স্খ হয় না ওর। স্খ যে ছাঁই কিসে হয়, শুধু খাওয়া ছাড়া। গলা ভর্তি ভাতগুলো যখন পেটের মধ্যে বিজড়র কাটে তখনই স্খ হয় জব্বর।

খাওয়ার কথা মনে পড়তেই কণ্ঠ হল বংশীর। পেটের চামড়াটা শালা পিঠে লেগে যাবার ধান্দায় আছে। চাউল আছে ঘরে সেরখানেক, খেয়ে নিলেই তো শেষ হয়ে গেল। তিন দিন বাদে হস্তা। বংশী শেষপর্যন্ত উনুন ধরাবে বলে ঠিক করল। চারধার চুপচাপ শুদ্ধ মাঝে গলা ছেড়ে মোরগগুলো চেঁচাচ্ছে। ওখানে সব ঘরেই মুরগীর দঙ্গল। বংশীর বউ এককালে মুরগী পুষতো। বউ পালাতে বংশী সেগুলোকে রোজ রাতে একটা একটা করে কেটে খেয়েছে। আঃ, সেই দিনগুলোয় খাওয়াটা ছিল কী সুখের! মেয়েছেলের শরীরের চেয়ে মুরগীর মাংস স্বাদে জিভ জুড়িয়ে দেয়।

আনমনে হাঁটিছিল বংশী। একদম ন্যাংটাপোঁদা বাচ্চা আর খুঁশ্বুরে বড়োবুড়ি এদিক-ওদিক ছাড়িয়ে আছে। লাইনের শেষপ্রান্তে এসে খুঁটিমারী জঙ্গলের দিকে তাকাল ও। ঘন জঙ্গলটা ক্রমশ নিচ থেকে আরো নিচে নেমে গিয়েছে। একটু এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল বংশী। তেমাথায় বড়ো সিরিন গুলতি হাতে বসে। নড়বড়ে মুরঠায় গুলতির বাঁট নিয়ে পানসে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। বংশী ওর সামনে উবু হয়ে দাঁড়াতে বড়ো চোখ তুলল, তারপর চিনতে পেরে বলল, 'নোকরি গেলক রে তুর?' হুঁ।' বংশী ওর হাত ধরে আস্তে আস্তে তুলল, 'কা করতিস রে?'

বসে বসে বড়ো মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিল বোধহয়, বংশীকে পেয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বড়োর যখন ষাটবছর বয়স তখন চামুচির এক বিধবাকে বিয়ে করে। প্রায় তিরিশ বছরের ছোট বউটাকে বিয়ে করার কারণ বড়োর ছেলেরা সব বাপকে ছেড়ে আলাদা, বউ এসে বাগানে কাজ করে স্বামীকে খাওয়াবে। তা বলতে নেই বউটা বড়োকে দেখাশুনা করছে ঠিক মতন। মাঝে মাঝে একবেলার জন্য চামুচিতে গিয়ে সৎ মেয়েকে দেখে আসে এই পর্যন্ত। লোকে বলে অনেকের সঙ্গে নাকি ফণ্টি-নাণ্টি করে বউটা, চাঁদনী রাতে কেউ কেউ চাম্বাগানের মধ্যে দেখেছে পুরুষের সঙ্গে। তা কোন্ মেয়েটা এই লাইনের সতী হয়ে আছে বল? শুদ্ধ ফেঁসে না গেলেই হল আর বড়োকে তো কোন অম্ব করছে না—কারোর কিছুর বলার নেই। তা সেই বউ আজ দুদিন যেতে পারেনি কাজে। ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে। আজ জ্বর নেই বটে কিন্তু শরীর কাঁপছে। সকাল থেকে মাংস মাংস করছে। গুলতি দিয়ে বড়োকে বলেছে একটু ঘুঘু মেরে আনতে। শুকনো ধান খেতে ঘুঘুরা ভিড় করে ভর দুপুরে জোয়ান বয়স হলে বড়ো দশটা ঘুঘু মেরে দিত কিন্তু এখন ঢোঙাগুলো হাত ফসকে এদিক ওদিক চলে যায় যে!

ঘরের দরজায় এসে বড়োর যেন সম্ভবত এল। বংশী যত ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে চায় ও ঘাড় নাড়ে। খড়ের ছাউনি জুড়ে একটা নিচে নেমে এসেছে, ভেতরে ঢুকতে একটু হেঁট হতে হয়। ভেতরের খাটিয়ার মচমচ শব্দ হয় তারপর বড়ো সিরিনের বউ-এর আংুরার তলা দেখা যায়। বংশী বোঝে খালি হাতে বড়ো

ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। বড়োর বউ-এর সঙ্গে ওর কথাবার্তা তেমন নেই। বউ পালাবার আগে মাঝে মধ্যে ওর ঘরে অবশ্য গেছে। বংশীর সন্দেহ এরই পাল্লায় পড়ে বউটার মন বিগড়েছে। না হলে এ সদেশীয়া মেয়ে হয়ে হিন্দী কথা বলে! চামুচিঁতে একটা হিন্দী সিনেমা হয় শুনছে বংশী, তা বলে এত টং কিসের! আজকাল ওদের বাগানে মাসে দু'মাসে একটা করে পিকচার দেখানো হয় বড় সাহেবের কুটির সামনে—সিরিনের বউ-এর ঠাটঠমক সেইরকম।

‘ভাগ গেলোক সব চিড়িয়া—না রে’ সিরিনের বউ পাশে এসে দাঁড়াল। চুলগুলো রন্ধ, চেহারাটা থমথমে। হঠাৎ বংশীর মনে হল সিরিনবড়ো সত্যিই বড়ো। স্বামী না হয়ে বড়া-বাপ হতে পারত সহজেই। হঠাৎ যেন বংশীকে দেখে বউটা চোখ কপালে তুলল, ‘নোকরী খরতম, মরদ হজম’ বলে হাসল।

প্রথম কথাটার মানে বুঝলেও পরেরটা কেমন রহস্য হয়ে থাকল বংশীর।

‘তুম জোয়ান আদমী, তুমারা ডর কিয়া, বোলো?’ বউ ঠোঁট টিপে বলল।

‘যা বড়া ঘর যা।’ বংশী সিরিনের কাঁধে টোকা দিতে বড়ো সিঁধিয়ে গেল ঘরে। রন্ধ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বউ বলল, ‘কা কাম করতিসে রে?’

‘কুছ না।’ বংশী গুলতিটা নিয়ে হাত বোলালো।

‘দো চিড়িয়া মার দে, তুম ভি খায়গা হামরা ঘর মে।’ বউ বলল।

‘ঠিক হয়।’ বলে বংশী পা চালাল। এই মেয়েটার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। যেমন টিপটিপ করে বৃক।

বেছে বেছে অনেকগুলো টোঙা পকেটে পুরে লাইন ছাড়িয়ে নিচে নামল বংশী। যেখানটায় চাল শুকতে দেওয়া হয় সেখানে কয়েকটা কাক ছাড়া কিছুর নেই। ফ্যান্টারীর সামনে গেলে নিশ্চয়ই কয়েকটা পাওয়া যেত কিন্তু ওদিকে যেতে মন চাইছে না। লাইন ছাড়িয়া যেতেই জঙ্গলের শুরু। বাঁ-দিকের হাঁটা পথ ধরে খানিকটা গেলেই আংরাভানা নদী। এই ভর দুপুরে খাঁ খাঁ করছে চারধার। নদী ধরে কয়েক পা হাঁটতেই বৃষ্টি পাওয়া যাবে। এখন বড়জোর হাঁটু অবধি জল। জঙ্গলের পথ ধরতেই বংশী দেখল একটা মদেশিয়ার সঙ্গে বাবুমত লোক এদিকে আসছে। মদেশিয়াটা হাত নেড়ে ওকে থামতে বলছে। অবাক হল বংশী। বাবুটাকে ও জীবনে দ্যাখেনি। মদেশিয়াটাকে চেনাচেনা মনে হলেও ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে। গুলতি হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে আসতে দেখল বংশী। বাবুটা মদেশিয়াকে ফিসফিসিয়ে কি বলতে সে সম্মতি জানাল ঘাড় নেড়ে। বাবুটা বলল, ‘তোমারা নাম বংশী?’

ঘাড় নাড়ল সে।

‘কাল নোকরী চলা গিয়া তুমারা?’

‘হ্যাঁ।’

‘লেও সিগারেট পিও।’ একটা দেশলাই আর হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট ওর দিকে এগিয়ে দিল বাবুটা। বিড়ি খুব কম খায় বংশী, খইনি চলে। সিগারেট

খাওয়ার পরস্যা কোথায়? কিছু না বন্ধে হাত বাড়িয়ে ওগুলো খরল বংশী! ব্যাপারটা কি?

‘ঘাবড়াও মং, হামারা বাত শোন’, বাবুটা হাসল, ‘তুম রূপিয়া মাঙতা হয়?’

এ আবার কি রকম প্রশ্ন! টাকা কে না চায়? মদুখে বলল, ‘জী বাবু পেটকে লিয়ে রূপিয়া জরুরত হয়।’

‘ঠিক বাত। খানেকে লিয়ে, আচ্ছা কাপড়াকে লিয়ে, ডেইলি হাঁড়িয়াকে লিয়ে সব কষ্টকো রূপিয়া চাহিয়ে। মগর বংশী, তুমারা নোকরী তো খতম কর দিয়া সাহেব, আঁভ কেল্লা করেরা?’ বাবুটা বলল।

‘শোচা নেহি বাবু।’ বংশী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

‘ঠিক হয়, হাম শুনো তোমারা বাত। উ সাহেব লোককা দিল দেখো, মদুঠিভর পাতি নেহি ছোড়নে সেকতা। থুঃ!’ ঘেন্নায় থুতু ছড়ালো বাবুটা, ‘এইসা বাগানমে তুম কাম মং করো। তুম হামারা কামমে লাগো।’

‘আপকা কাম?’ একটা বাবু ওকে যেচে চাকরী দিচ্ছে ভাবা যায় না।

‘আরে ভাই হামারা চার পেটি পাতা চা চাহিয়ে। ও দারোয়ান শালা পরচান্তা নেহি। তুম চলো, কোনঠু পাতা চা ও বাক্সা ইয়ে হামারা আদমীকো বাতা দেও। সিরেফ চার পেটি, ব্যাস।’

‘কাঁহা? ফ্যাঙ্করী পর?’ অবাক হয়ে গেল বংশী।

‘দুসরা কাঁহা মিলেগা ভাই।’ দশ টাকার একটা নোট ওর হাতে গদুঁজে দিল বাবু, ‘কোই ডর নেহি। আজ রাত দো বাজে ইহাঁ চলা আনা, হামারা ইয়ে আদমী তুমকো সাথ লে যারগা। কাম খতম হোনেসে আউর চালিস রূপিয়া মিলেগা। আরে দারোয়ান ভি রূপিয়া লিয়া—কুছ নেহি বোলেগা।’

‘আরে বাপু, হাম মর যায়েগা।’ ঠক ঠক করতে লাগল বংশী।

‘আরে, কুছ ডর নেহি। উনলোক তুমকো ভাগিয়া দিয়া আউর তুম লেড়কিকা মাফিক বাত করতা। আরে বদলা লেও। যাদা কুছ করনে নেহি পড়েগা তুমকো। ব্যাস জবান পাক্সা? শুন, ইয়ে বাত দুসরা কিসিকো মত বাতানা। বেইমানকো হাম জিন্দা নেহি রাখতা।’ কেমন রক্ত ঠান্ডা করা গলায় কথাটা বলে চলে গেল বাবুটা সঙ্গীকে নিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন খাতটা ফিরে এল তখন বংশীর খেয়াল হল ওর হাতে সিগারেট আর দেশলাই এবং টাকাটা রয়ে গেছে। আজ রাতে ওরা চুরি করবে পেটি পেটি চা। নিয়ে যাবে কিসে? নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই চা-বাগানে এতকাল কাজ করে শেষপর্যন্ত ও এই কাজ করছে? মনের মধ্যে দ্দুটো লোক অনেকক্ষণ পাজা কবে শেষপর্যন্ত মাথা নাড়ল বংশী। দারোয়ান যখন ওদের দলে কেউ টের পাচ্ছে না যে বংশী এর মধ্যে আছে ওরা যখন ফাঁকিতালে কিছু টাকা ওকে পাইয়ে দিতে চায় ও নেবে না কেন? শব্দ তু পেটিগুলো চিনিয়ে দেওয়া—গদুঁড়ো চা থেকে পাতা চা আলাদা করে দেওয়া—এটা এমনকি অপরাধ!

আর নোকরী যখন খতম করে দিয়েছে ওর এটা করলে তেমন পাপ হবে না। অনেকটা হালকা হয়ে পকেটে সিগারেট আর টাকা রেখে দিয়ে ও সামনের দিকে হেঁটে গেল। কুল কুল করে অল্প জলের স্রোত বইছে। নদীর ওপাশে ঝুঁকে আসা একটা শালগাছের ডালে বৃক চিঁতিয়ে বসে আছে একজোড়া ঘুঘু। চকিতে ঢোঙা পরিয়ে গুলতিটা টিপ করল বংশী। ডান হাতে রবারটা কানের কাছে টেনে এনে ফট করে ছেড়ে দিতেই বটপট শব্দ হল গাছটায়। বংশী চেয়ে দেখল মাদী ঘুঘুটা একপাক খেয়ে আংরাভানার জলে গিয়ে পড়ল ধপাস করে। সাধ্যর বাইরে দ্রুত হেঁটে জলের মধ্যে নেমে পড়ল বংশী। যা স্রোত দেড় ঠ্যাঙে হাঁটা মদুশকিল। কোনরকমে পাখীটাকে ধরে ফেলল ও। জলে ডানা ভিজ়ে গেলেও বৃকের কাছটা কি গরম, ধোঁয়া ওঠা ভাতের মত।

ঘুঘুটাকে একটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলে শূকনো জালগায় বসল বংশী। চারধারে বিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। পাকা কাঁঠালের গন্ধ আসছে যেন। এই বনের ধারে কয়েকটা গাছ আছে কাঁঠাল, আমের। মানুষের ফেলা আঁটিতে গিজ়ে গেছে। পেট জুড়ে খিদেটা চনমনিয়ে গেছে। শালা বনে ফল আছে পাখী আছে — ঠিকই চলে যাবে। আর আজ রাত্রে ধরা পড়লে নির্বাং সদরে পাঠাবে। দারোয়ানটার মদুখ মনে পড়ল বংশীর। ও এর মধ্যে আছে? অথচ ওর তিন মূঠো চা ধরার সময় কি বীরত্ব দেখাচ্ছিল। মানুষকে চেনাই যায় না। রামজীকে গানা করে দারোয়ান। রামজী কে? কে জানে! না, এই চুরি ঠিক চুরি না। ফোকটে পঞ্চাশ টাকা পকেটে এসে যাবে। আর এসে গেলেই পাঁচশ সের চাউল কিনে রাখবে ও। একমাস নিশ্চিন্ত। না, তাতেই সব টাকা শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিশ সের চাউল আর দশ বোতল হাঁড়িয়া। ব্যাস, আর কি চাই! মনের মদুখে চোখ বন্ধ করে সরু পায়ে হাত বোলাতে লাগল বংশী।

খুঁটিমারী রেঞ্জের এই জঙ্গলটা চলে গেছে নাথুয়া ডিঙ্গিয়ে ভূটানের পাহাড়ের তলায়। এদিকে জঙ্গলের ঘনত্ব কম। পায়ে হাঁটাপথে ফালি ফালি করে জঙ্গল ছিঁড়ছে। হাতি ছাড়া ভয়ের কিছু জানোয়ার এদিকে আসে না। আর হাতি এলে খবর ছাড়িয়ে পড়ে বাতাসের মদুখে মদুখে। নিশ্চিন্তে বসে বংশী পাখীর ডাক শুনছিল। আংরাভানার জলের শব্দের সঙ্গে পাখীর ডাকগুলো কেমন মিলেমিশে যায়। আজ রাত্রে যদি ও কাজটা করে তবে কাল একবার বিরাগুড়ি গেলে কেমন হয়। পেট হওয়া বউটাকে দেখে আসবে। বউটার সঙ্গে ওর ঝগড়া ঝাঁটি হয়নি কোনদিন, অথচ না বলে কয়ে ফট করে কেমন চলে গেল। শূঘু বউটাকে বাচ্চা দিতে পারল না বলে ভেগে গেল? কিন্তু ওর শরীর তো ঠিকঠাক কাজ করে। শরীরের মেশিনটার ভগবান যদি জং ধরায় জুহু ও কি করবে? গুলতিটা হাতে তুলে নিল বংশী। কি আশ্চর্য, আবার ঐ শালগাছটার ডালে ঘুঘু এসে বসেছে। অন্য ঘুঘুরা কি একে খবরটা দেয়নি! গুলতিতে টিপ করে ঢোঙা ছাড়ল বংশী। তড়াক করে ঘুঘুটা ওড়ার চেষ্টা করেই বোঁটা খসা আমের মত

নিচের জলে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ পেল ও। বদ্বতে না বদ্বতে একটা শরীর তীরের মত ওর পাশ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনরকমে জল হাতড়ে ঘুঘুটাকে ধরে ওর দিকে ফিরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হাসল। ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে বংশী। সিরিন বড়োর বউ। ও এল কখন? ‘কা দেখিস রে?’ দ্ব-হাতে ঘুঘুটাকে ধরে ওপরে উঠে এল সে। নিচের আংরাটা ভিজে গেছে একদম, ওপরের রাউজে জলের ছাপ। জলে ভিজে বুক যেন আরো ফুলে উঠেছে।

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল বংশী। বউটা কাছে এসে আর একটা ঘুঘু দেখতে পেয়ে ঠোঁট ওলটাল, ‘মোটো দ্বটা? হামারা চারটো চাঁহিয়ে!’

বংশী বলল, ‘তুমারা বোখার হুয়া, পানিমে মং নামো।’

‘কিঁউ?’ চোখ তুলল বউটা, ‘বোখার ঠাংডা হো যাবেক! তুম একদম বদ্বদ্ব এতনা তুমারা ঘরমে হাম গিয়া তুম হামকো নেহি দেখা। মেরা নাম জানতা?’

ঘাড় নাড়ল বংশী। সিরিন বড়োর বউ বলে কি?

‘সে-রা’। টেনে টেনে উচ্চারণ করল বৌটা, ‘সেরা মেরা নাম। প্যার করনা কাম।’ বলেই কপট ঘাড় নাড়ল, ‘সবকো সাথ নেহি।’

‘তু ঘর যা।’ বংশী বলল।

‘কিঁউ।’ দ্ব তুলল সেরা, ‘তুমারা পসন্দ নেহি হোতা?’

উঠে দাঁড়াল বংশী। মেয়েটার মতলব খারাপ।

সেরা হাসল, ‘ও বড়ো মরবেক। এতনা ডর উসকো, থুং, তুম মরদ নেহি!’

‘এ্যাই।’ বংশী ধমকে উঠল।

চোখে চোখ রেখে এগিয়ে এল সেরা। হাতের ঘুঘুটাকে ছুঁড়ে দিল অন্যটার পাশে। তারপর বৃকের জামার সেপার্টা পিন টুক করে খুলে বংশীর হাত টেনে নিল। সেখানে, ‘দেখো হামকো, ক্যান্সা মরদ তুম?’ ঘুঘুর বুক কিংবা গরম ভাতের চেয়ে উষ্ণ দ্বটো তামাটে পাহাড় ছুঁয়ে দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে গেল বংশীর। মেয়েছেলের শরীর এত নরম হয়! ওর বউটার শরীরের এসব তো এমন করে ছিল না! কোমরে হাত রাখলে তো হাত এমন ডুববে যেত না! চমু খাবার সময় জিভ দিয়ে টোকা মারলে অশ্ব হয়ে যাওয়ার সন্খটা তো জানা ছিল না! শেষপর্যন্ত সমস্ত শরীর নিংড়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে চিং হয়ে শূন্যে পড়ল বংশী।

অনেক পরে সেরা নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে হাসল, ‘তুমার বহুটা বউ কথা বলে। তুম বহুং তেজী মরদ হ্যায়। লাও, একঠো সিগারেট পিলাও।’

চমকে উঠে বসল বংশী। হঠাৎ নেমে আসা শ্রান্তিটা ভেঁটে করে চলে গেল। ওর কাছে সিগারেট আছে জানল কি করে সেরা। কিছুক্ষণে প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে চোখের দিকে তাকাল বংশী। নিঃশব্দ হাতে দ্বটো সিগারেট ধরিয়ে একটা ওর দিকে বাড়িয়ে নিজেরটা টানতে লাগল সেরা। ওর জিভের রসে ভেজা সিগারেটে টান দিতে দিতে বংশী শুনল, ‘তুম হামকো শাদি করগ্যা?’

চমকে তাকাল বংশী, ‘হাম?’

‘হাঁ। আজ রাতমে চল চামুচি, নেহি, হাসিমায়া। উঁহা তুমারা কাম মিল যায়গা।’

‘সিরিন—!’ বংশী বলল।

‘ও বুদ্ধা মর যায়গা আজকাল। হায় ইঁহা নেহি রহেগা।’

‘কিঁউ?’

হাসল সেরা, ‘মরা পেটমে বাচ্চা আ গিয়া। দোসরা আদমীকে বাচ্চা। লাইনকা আদমীলোক হামকো মোর ডালেগা।’

হাঁ হয়ে গেল বংশী। সেরার পেটে বাচ্চা আছে! তবু ওর সঙ্গে এমন মজা করল। নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে ফেঁসে গিয়েছে। আর এখন ওকে শাদি করতে বলছে বাঁচবার জন্য? বংশী বলল, ‘হাম নেহি যায়গা।’

‘কিঁউ, তুমকো সুখ নেহি দিয়া হাম?’ আদুরে গলায় বলল সেরা।

‘দুসরা আদমীকা বাচ্চা—’ বলতে গিয়ে থেমে গেল বংশী। খিল খিল করে হাসল সেরা, ‘তো কেরা। আরে বুদ্ধ, জেনানালোক বাতানেসে তব তো মরদলোক সমঝতা বাচ্চা উসকো হায়। সমঝ লেও ইয়ে তুমারা বাচ্চা, ব্যাস। তুমারা বহুকো উপর বদলা লে লেও।’

ব্যাপারটা বুদ্ধতে পেরে বংশী বউটার কথা ভাবল। সেরা যা বলছে তা করলে বউটা জন্ম হয়ে যাবে। কিন্তু সিরিন বড়ো—

‘আজ রাতকো কাম খতম করকে পলুকা পাস চলা আও। হাম সামান লেকে উঁহা খাড়া রহেগা।’ উঠে দাঁড়াল সেরা।

‘রাতকো কাম?’ অবশ হয়ে গেল বংশী। রাতের কাজের কথা এ জানলো কি করে? উঠে দাঁড়াল ও।

‘পঞ্চাশ রুপিয়ারে রফা হুয়া না? হাম সব শুন্য। আরে ডরতা কিঁউ, হাম কিসিকো নেহি বাতায়গা। তুম মেরা বাচ্চাকো বাপ হায়।’ বলে বংশীর চিবুক এক হাতে নেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল লাইনের দিকে। খানিকটা গিয়ে আবার ও ঘুরে দাঁড়াল, ‘ইয়াদ রাখনা, পলুকা পাস হাম খাড়া রহেগা দো বাজে মে।’ তারপর রাণীর মত হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল আড়ালে। হঠাৎ বংশী ঘুরে পেল ওর ভাল পা-টা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে আর সরু পায়ে ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে উঠছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর। একটা হিম ভন্ন বুদ্ধের মধ্যে পদে আছে। সেরা নিশ্চয়ই ওর পেছন পেছন এসেছিল। তারপর আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবুটার কথা সব শুনছে। শালা। মেয়েছেলটা সাক্ষী থেকে গেল সেরার পারটার। ফাঁস করে দিলে আর রক্ষে থাকবে না। পা দুটো যদি ভাল থাকতো তবে থোড়াই কেয়ার করতো বংশী। এখন ওর কথা না শুনলে বংশীর কান্না পেয়ে গেল। কার সঙ্গে মজা লুটে ফেঁসে গিয়ে ওর ওপর ভর করতে চাইছে সেরা। এমনিতে মেয়েছেলটা এমন জিনিস কোনদিন টের পাইনি ও। তা বলে অন্য একটা বাচ্চার বাবা

সেজে ওকে চলতে হবে ? এও তো শালা এক ধরনের ছুরি। চামুচি কিংবা হাসিমারা যেখানেই থাক এই চুরিটাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। বসে পড়ল বংশী। ঘুঘু দুটো নিয়ে যার্নি সেরা ! কাঠ হয়ে পড়ে আছে সে দুটো। হঠাৎ ওর মনে হল সেরাকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে তো একদিন ভেগে পড়তে পারে সব যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন কে আর সেরাকে বিশ্বাস করবে ? নিজের বউ-এর ওপর বদলা নেওয়া হল, চাকরী খতমের বদলা হল আবার সেরাকেও টাইট দেওয়া হল। একটু খুশী খুশী মন হওয়ার সঙ্গে পায়ের ব্যাথাটা কমে গেল বংশীর। সামনের দিকে তাকাতে ও আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্যাপার কি ! ঘুঘুগুলোর কি আজ মরতে ইচ্ছে করছে নাকি। নাহলে শাল গাছের সেই নিচু ডালটার আবার একটা এসে বসেছে কেন ? আর বসে অমন বুকই চিতায় কেন ? গুলতিতে ঢোঙা পুরে টিপ করল বংশী।

চার চারটে ঘুঘু কাঠের আগুনে ঝলসামিছিল। গর্ত খুঁড়ে তিন ইন্টারের উনুনের ওপর ছাল ছাড়ানো পাখিগুলোকে ঢেনা যাচ্ছিল না। লকলকে আগুনের তাতে সাবধানী হাতে ঝলসে নিচ্ছে সেরা। একটা পোড়া গন্ধ বের হচ্ছে। আগুনের রঙ লেগেছে মেয়েছেলেটার গালে। বড়ুা সিরিন চিং হয়ে শূন্যে আছে। ওর দুটো পা ভাঁজ করে হাঁটু ওপরে তোলা। মাথার কাছে বসে বংশী দেখাছিল সেরাকে। বড়োর ঠ্যাং দুটোর মাঝখান দিয়ে সেরাকে দেখছে ও। ঠ্যাং দুটোকে হঠাৎ গুলতির বাঁটের মত মনে হল ওর। ও নিজে যেন ঢোঙা, এক্ষুনি সাঁই করে ছুটে যাবে সামনে ঐ আগুনে গাল লাল হওয়া ঘুঘুটার দিকে। খুক খুক করে হাসল বংশী। একটু একটু নেশা হয়েছে। সেরা ঘুঘু চারটে পেয়ে লুকোন বোতল বের করেছিল। নিজে খার্নি এক ফোঁটা। বড়ো তো আধ বোতল খেয়ে চিং হয়ে গেছে। শালি ভাগবার জন্য বড়োকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সন্ধ্যা থেকে। চোখে রঙ লাগছে বংশীর। মাথা নেড়ে নিজেকে ঠিক করল ও। মাথা সাফ রাখতে হবে। রাতের কাজটা গোলমাল না হয়। আজ সন্ধ্যাবেলায় সব মন্থাকিল হয়ে গেল। জঙ্গল থেকে আসবার সময় লাইনের লোকজন যারা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে দেখা। সবাই ওকে দেখে হই হই করে উঠল। অবাক, বংশী শুনল ইউনিয়ন থেকে গিয়েছিল বড়সহিবের কাছে। এক কথায় বড়সাহেব নাকি বংশীকে চাকরী ফির্সিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। তবে গুদামে নয় হাসপাতালের কাজে। কাল সকালে যেন বংশী ডাকদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কি করবে বুঝতে পারছিল না বংশী। দেড় ঠ্যাঙে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল। চাকরী আছে তার, এই বাগান এই বড়সহিব লাইন ওই পাতির গন্ধ যা সে ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসছে সেখানেই যে রাজার মত থাকতে পারবে— আঃ। তারপর একটু একলা হয়ে চারটে ঘুঘু বুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবটুকু আনন্দ খারায় মনটা হাওয়ার মত বোরিয়ে গেল ভুস করে। আজ রাত্রে পেটি পেটি চা

ছুরি করে ওকে সেরার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে। ইস, যদি কল্লেক ঘণ্টা আগে খবরটা সে জানতো। বাবুটা বলে গেছে বেইমানি করলে লাশ ফেলে দেবে। কি করবে ও।

নেশার চোখে সব কিছু সুন্দর লাগে। গুলতির বাঁটের মধ্যে দিয়ে ও সেরাকে দেখল। কি নির্লিপ্তের মত নুন মরিচ ছড়াচ্ছে মাংসের ওপর। এখন গন্ধটা বেরুচ্ছে দারুণ। এই সেরা আর জঙ্গলের মধ্যে শব্দে থাকা সেরার মধ্যে কোন মিল নেই— এইরকম যখন ভাবতে শব্দ করছিল ও ঠিক তখনই একটা কলাইকরা খালার ওপর মাংসগুলো রেখে ওর দিকে তাকিয়ে মূর্চক হাসল সেরা। ওর চাকরী ফিরে পাবার কথা শুনছে সেরা। বংশী সিরিন বড়োকে খবরটা দেবার সময় ওকে শুনিয়েছিল। বড়ো খুশী হয়েছিল। কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সেরা।

রান্না হয়ে গেলে দু-হাতে বড়োকে ঝাঁকাল সেরা, ‘ওঠ্ ওঠ্ এ বড়ো, ওঠ্।’ অনেক ঝাঁকুনির পর সিরিন চোখ খুলে ঢুলতে লাগল উঠে বসে। মাংসের খালাটা সামনে ধরতে দু-একবার মূখ খুবড়ে তার মধ্যে পড়ে যেতে সেরা এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে বড়োর মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। বড়ো কয়েকবার সেটাকে চিবোতে চেষ্টা করল। মাড়িতে জোর পাচ্ছে না, স্ স্ করে রস টানছে, কপালের রসগুলো তির তির করে কাঁপছে, চোয়াল নড়ছে না ইচ্ছে মত। শেষপর্যন্ত প্রায় আশ্র মাংসটা মাটিতে থু থু করে ফেলে দিয়ে নেশার ঘোরে কাঁদতে লাগল বড়ো। তারপরই বংশী একটা আজব ব্যাপার দেখল। সেরা আর একটা মাংস ছিঁড়ে নিজের মুখে পুরে সেটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে কাদা করে আবার মূখ থেকে বের করে সেই কাদাটা বড়োর মুখে গুঁজে দিল। চিবোতে হল না বড়োকে, জিভ দিয়ে সেটাকে নেড়ে চেড়ে কপাৎ করে গিলে ফেলল বড়ো। তারপর আশ্র আশ্র শব্দে পড়ল একটা হাত বালিশ করে। মাংস খাওয়া হয়ে গেল বড়োর।

মাংসের থলিটা সামনে রেখে সেরা বংশীর কাছে এসে বসল। দু-দু-সেই বট-গাছটার তলায় কারা মাদল বাজাচ্ছে—ডিম ডিমা ডিম, ডিম—তালটা এ ঘরে সোজা যেন চলে আসছে। ‘খালে মাংস’। সেরা বলল।

বোতল শেষ হয়ে গিয়েছিল বংশীর। মাংস খাওয়ার সময় ওরা কোন কথা বলল না। শব্দ করে পাখির নরম হাড় চূসছিল সেরা। খাওয়ার সময় মেয়েদের চেহারায় কোন গরমি থাকে না। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে পা ছাড়িয়ে বসল বংশী। কটা বাজে? একটার সময় গিয়ে দাঁড়াতে হবে লোকটার জন্যে। ও দেখল খালা সিরিয়ে সেরা আর একটা বোতল বার করছে। বাঃ মেয়েটার কাছে তো বেশ লুকোন মাল থাকে। সেরা বলল, ‘লে, মৌজ কর’।

ঘাড় নাড়ল বংশী, ‘না। নেশা হো যাবেক।’

‘হোনে দে।’ সেরা সামনে এসে বসল আবার। বংশী কি মেয়েটা? গদ্যমে অত বড় কাজ আছে, তারপর হেঁটে আজ রাত্রে চলে যেতে হবে হাসিমারার দিকে, নেশা করলে চলবে কি করে? ওর মনের কথা যেন শুনতে পেরেই সেরা হাসল, ‘তুমি আদমীটু সাচ্চা হয়। শুন, আজ রাতমে নোহি যানে পড়্গা তুমকো।’

‘কি’উ?’ থ হয়ে গেল বংশী।

‘পহেলে দেখি তুমি ক্যানসা মরদ হো। দো মাস বাদ হামলোগ যা শেকতা—বাকী ইসকা অন্তর তুমারা বাচ্চা হামারা ইঁহা আয়ে তো!’ বলে নিজের পেট দেখিয়ে হাসল সেরা।

হাসপাতালে থাকতেও শরীর এত অবশ হয়নি বংশীর। হাঁ হয়ে ব্যাপারটা শুনল ও। সেরা তখন স্নেহ মজাকি করেছে। ওর পেটে বাচ্চাটাচ্চা আসেনি। আজ অবধি কখনোই আসেনি। আগের স্বামী আর এইটে—দুটোই ক্ষমতা হারাবার পর বিয়ে করেছে। বংশীর ওপর ওর নজর ছিল। বংশীকে যাচাই করবার জন্য ও মিথ্যে বানিয়ে বলেছে। বলে দেখেছে বংশী সাচ্চা আদমী। এখন বংশীকে দুই মাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর মধ্যে বাচ্চা আসে তবে দুই নম্বর থালি চাঁদের দিন ওরা পালিয়ে যাবে।

ফট্ করে যেন আর একটা গিঁট খুলে গেল বংশীর। কিন্তু মনুষ্যের আনন্দের চেয়ে অন্য একটা সুখের লোভ ওর সবজি ঘিরে ফেলল সংসা। আঃ। একটা হাতে সেরার হাত ধরে বসে থাকল বংশী। সিরিনি বুড়োর নাক ডাকছে সমানে।

হঠাৎ সেরা বলল, ‘তুমি আজ গুদামমে মৎ যাও!’

এখন সত্যি আর যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। এতগুলো সুখের খবর একসঙ্গে পেয়ে আর ভাল লাগছে না বিপদের মধ্যে পা বাড়াতে। বংশী বলল, ‘উ শালা মার ডালগা!’

কি ভাবল সেরা। তারপর বলল, ‘লে দম ভর পি লে হাঁড়িয়া। উসকা বাদ যা। মাতোয়ালা আদমীসে উনলোক কাম নেহি করায়গা।’

দম ভর খেয়ে যখন বংশী বাইরে বেরুল তখন ওর পায়ের ব্যাথাটা কখন হাওয়া হয়ে গেছে। খোলা জায়গায় আসতেই ওর হঠাৎ মনে হল ঘর-বাড়ি আকাশ কেমন উলটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে সেগুলোকে ঠিক করল ও। ডিম ডিম্বা ডিম্বা মাদল বাজছে। চোখে কেমন ঝাপসা লাগছে সব। চোখ তুলে ও সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। খুঁটিমারীর জঙ্গলটা যেন ক্যালেন্ডারে দেখা শিব ঠাকুরের মত বসে আছে মাথায় একটা চাঁদ বুলিয়ে। আহা কি রূপ। দূ-হাত জড়ো করে প্রণাম করার চেষ্টা করল বংশী। চোঁয়া জ্যোৎস্নায় চারধারে হালকা সাদা ছড়াচ্ছে। উল্টে তলতে বংশী মোড়ের দিকে এগোল। তামাম কুঁলি লাইন নিশ্চয় এখন। শুধু মাদলটা বাজছে—ঘেউসির তো বহুৎ দেবী।

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বংশী আর দাঁড়াতে পারল না। সেবে হিম পড়া ঘাসে বসে পড়ে আশেপাশে তাকাল। জঙ্গল থেকে দলে দলে জেগে আসে ছাড়িয়ে পড়ছে মাঠে। ফিনিক ফিনিক টিপ পরাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে। কটা বাজে এখন? এখন সব ঠিকঠাক, চাকরী হল, সেরার মত মেয়েছেলে ওর বাচ্চা পেটে নেবার জন্য অপেক্ষা করছে, আর ওকে এখন চুরি করতে যেতে হবে। কান্নাটা হঠাৎই এসে গেল ওর।

অনেকক্ষণ পর সাইকেলের ঘণ্টা শুনতে পেয়ে তাকাল বংশী। অন্ধকারে টর্চ

জেলের কেউ সাইকেলে চেপে আসছে। ঠিক ওর সামনে এসে ওর মুখে আলো ফেলল লোকটা। তারপরই আচমকা পেটে একটা লাথি খেল বংশী, ‘ই শালা কুতাকা বাচ্চা, ফিন নোকরি মিলা তুমারা ? আঁ ?’ সেই মদেশিয়টা। হু হু করে কেঁদে ফেলল বংশী, ‘মু না জানলেক কছু সাচ্ কিরায়।’

লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, ‘লে দশ রুপায়্যা ধুমাকে দে।’ পকেট থেকে টাকাটা বের করে বংশী ওর দিকে তাকাল, ‘কাম ?’

হ্যাঁ মেরে টাকাটা নিয়ে লোকটা আবার সাইকেলে চাপল, ‘শালা দারোয়ান ফাঁসায় দেলেক। বেইমান। জানসে খতম হোগা ও।’ বলে পাই পাই করে চলে গেল সাইকেলটা।

পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু মনে লক্ষ লক্ষ চাঁদ ফুটে উঠল বংশীর। আঃ, বেঁচে গেছে ও, বেঁচে গেছে। প্রচণ্ড একটা ভয়ের সাপ এতক্ষণ যে জড়িয়ে রেখেছিল ওকে, হঠাৎ স্নান করে ওঠার মত হালকা হয়ে গেছে যেন। আনন্দে ডিগবাজি খেতে গিয়ে টলে পড়ল বংশী। শালা মাতোয়াল হো গিয়া।

লাফাতে লাফাতে হাঁটছিল বংশী। চাঁদ আর জোনাকিগুলো যেন মিছিল করে ওর সঙ্গে আসছে। আর দু মাস—ব্যাস। তারপর রাজা হো যায়গা। থাকি চাঁদকো রাত আ যাও পেম্বারে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন ও পুলের ওপর এসে পড়েছে বুঝতে পারেনি। এখানেই দু-মাস পর সেরা আসবে।

হঠাৎ আর একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। যদি নিজের বউটার মত সেরার পেটেও ওর বাচ্চা না আসে। যদি ওর শরীরের ভিতর বাচ্চা আনার যন্ত্রটা খারাপ থাকে ? নিজের বউটার তো বাচ্চা হবে এখন। প্রচণ্ড একটা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল বংশী। তাহলে তো সেরা আসবে না। বরং ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যালনা হাসি হাসবে। সারা জীবন এখনো চোরের মত থাকতে হবে। পুলের বাঁশটা দু-হাতে ধরে ওপর দিকে তাকাল ও। হঠাৎ পায়ের যন্ত্রণাটা ফিরে এল বংশীর। নেশাটা কেটে যাচ্ছে। ওপর দিকে তাকিয়ে চাঁদটাকে দেখতে দেখতে হাঁ করল ও। আয় চাঁদ—মেরা অন্তরমে আ যা।—গলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নাকে গিলতে চেষ্টা করছিল বংশী। একটু একটু করে সমস্ত চাঁদকে সারা শরীরে পুরে নিয়ে ওর মনে হল ও নিজেই খালি চাঁদ হয়ে গিয়েছে। শরীরটা হয়ে উঠেছে ফুলের মত। কি আরাম—আঃ। কিন্তু খালি চাঁদ হয়ে গেলেই তো বিপদ। আশ্তে আশ্তে আবার ক্ষয়ে যেতে হয়—পনের দিন পর পর একদম শেষ। তখন শুধু অন্ধকার। তখন শুধু কোনরকমে জিইয়ে রাখা নিজেকে।

দ্রুত পা চালান বংশী। নিজের কাছে চাঁদটাকে রাখা বড় বিপদ, বরং সেরার কাছে জমা করে দিলেই ভাল। রোজ রোজ জমা করে দেয় তাহলে হারাবার ভয় থাকে না। দু মাসটাও যে একদিন করে বেড়ে বেড়ে যায়। চাঁদটাকে উগরে দেবার জন্য ঢোঙার মত ছুটতে লাগল বংশী।

আমার বাবা আজকাল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। তাড়াতাড়ি মানে সাড়ে ছটা সাতটা। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কোন জরুরী কাজ ছাড়া বাবাকে কোনদিন সাড়ে নটার আগে ফিরতে দেখিনি। অফিস থেকে বেরিয়ে এই সময়টুকু বাবা কি করে স্পষ্ট করে বলতে পারব না তবে কখনও অসুস্থ হলে বাড়ি ফেরেনি। আমরা যে পাড়ায় থাকি সেখানে রাত করে যারা বাড়ি ফেরে তাঁদের অনেকেই টালমাটাল হলে হাঁটে বাবা এইসময় নেশা করে একথা কোন বড় শত্রুও বলতে পারবে না, মাও না।

বাবা যে তাড়াতাড়ি ফিরছে তার কারণ আমার মা খুব অসুস্থ। অসুখটা কাল অবধি এমন ছিল যে দিনরাত তার কাছে বসে থাকতে হবে তা নয়। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলে বাবাকে কেমন অসহায় দেখাত। কি করে সময়টা কাটাতে যেন বুঝতে পারত না। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মায়ের এমন বাড়াবাড়ি হল যে বাবা খুব ছোট্টাছুটি করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে নিষেধ করা হল। এখন আমার তিন বছরের ভাইটাকে নিয়ে আমি বাড়িতে আছি। স্কুলে তো যাওয়া হল না। আমাকে যে কোলে পিঠে করেছে সেই কমলামাসী ভাইকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

আজ আমার বয়স ষোল হল। ষোল মানে সুইট সিক্সটিন। আচ্ছা, ইংরাজীতে ষোলর আগে সুইট কথাটা বলে কেন? একমাস আগের আমার সঙ্গে এখনকার আমার তো কোন তফাৎ নেই। আমার শরীরের বাড় নাকি খুব বেশী। সবাই বলে আমি নাকি বাবার ধাত পেয়েছি। মা আমার কাঁধের কাছে পড়ে। মারামারি করলে মা নিশ্চয়ই হেরে যাবে কিন্তু পৃথিবীতে আমি মাকেই সবচেয়ে বেশী ভয় পাই। একটু আগে দুপুরের খাওয়ার সময় কমলামাসী আমাকে পায়ের খেতে দিয়েছিল। আজ সকাল থেকে বাড়িতে যেসব ব্যাপার চলছে তাতে আমার জন্মদিনটার কথা কারো খেয়াল থাকতে পারে না। কিন্তু কমলামাসী বলল মা নাকি গতকালই তাকে পায়ের করার কথা বলে দিয়েছিল। অন্যদিক্কার এই দিনটা এলে আমার খুব কষ্ট হত। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ি। আমাদের ক্লাসের মেয়েরা জন্মদিনে পার্টি দেয়। ক্লাসে কেবল গিফট নিয়ে যায়। মা সেটা একদম পছন্দ করে না। শুধু বাড়িতে লুচি আর পায়ের খেতে জন্মদিন করতে হয়। বিচ্ছিরি। কিন্তু আজ খেতে বসে ওগুলো দেখে আমার খুব কান্না পেয়ে গেল। সকাল থেকে যে কষ্টটা বুকের মধ্যে হচ্ছিল এখন যেন সেটা আরো বেড়ে গেল। মায়ের জন্য বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। আজ বিকেলে আমি বাবার সঙ্গে মাকে

দেখতে যাব।

আমার বাবাকে দেখতে বেশ সুন্দর। লম্বা, খুব ফরসা নয় কিন্তু হাসলে চমৎকার দেখায়। মা খুব ফরসা কিন্তু বেঁটে। রাগ করলে সেটা কয়েক মিনিট থাকে। মা কিন্তু সহজে নরম হয় না। কিন্তু মা খুব ভদ্র, মানে রুচি, আভিজাত্য এইসব মায়ের খুব আছে। আজ অবাধি কখনো মায়ের আচরণে কোন বে-নিয়ম দেখিনি। বে-নিয়ম মানে, স্বেচ্ছানুসারে জিনিস সেখানেই রাখতে হবে, ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, চোঁচিয়ে কথা বলা চলবে না। এইসব নিয়ম কিন্তু শুধু আমার আর মায়ের জন্য। বাবার ওপর এর প্রয়োগ নেই, মা তাকে কিছু বলে না। আমি জিজ্ঞাসা করি না কিন্তু কারণ আমি জানি। আমার বাবা ও মায়ের অনেক কথা আমি জানি আর সেটা ওরা জানে না। আমার যে একটা গোপন ব্যাপার আছে তা অবশ্যই বাবা জানে না, মাকে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমার। মাকে ঠিক বঝতে পারি না।

আমার মা আর বাবার মধ্যে সম্পর্কটা ভাল নয়। দিনের বেলায় এটা ঠিক বোঝা যায় না। বাবা ঘুম থেকে উঠে সোফায় বসে চায়ের কাপ নিয়ে কাগজ পড়ে। সেসময় আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হই। এতদিন হয়ে গেল তবু ভোর ভোর কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না। আমাদের স্কুল বসে ঠিক আটটায়। শ্যামবাজার থেকে ওয়েলিংটনে সরাসরি ট্রামে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু সেই কবে ক্লাস টু থেকে আমি মিসেস মৃধাজিঁর গাড়িতে যাওয়া আসা করছি তার আর ব্যতিক্রম নেই। মা মিসেস মৃধাজিঁকে সত্তর টাকা মাসে দেবে কিন্তু আমাকে বাসে ট্রামে যেতে অ্যালাউ করবে না। এখন আমি কচি খুকী নই যে রাস্তা হারিয়ে ফেলব। বাবা একবার বলেছিল, “এবার মৃধাজিঁর কোল থেকে ওকে নামিয়ে দাও। নিজে যাওয়া আসা করে পথঘাট চিনুক। নইলে চিরকাল বোকা হয়ে থাকবে।” মা উত্তর দেয়নি কিছু কিন্তু মিসেস মৃধাজিঁর আসা বন্ধ হয়নি। ঠিক সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই দুবার হর্ন বাজবে। তখনও যদি আমার জুতোর ফিতে বাঁধা না হয় ব্যাগ কাঁধে দৌড়ে নামতে হবে দোতলা থেকে। সাতটা থেকেই মা টিকটিক করে আমার পেছনে। এতক্ষণ বাথরুমে কি করছ, জামা পরতে এত দেরী কেন? কাল রাতে বইপত্র গুছিয়ে রাখতে পারে নি? ইস, জুতোটার কি অবস্থা করছ, রাশ করতে পারনি এতবড় খেঁড়ে মেয়ে। সেই সময়টায় হর্ন বেজে উঠতেই আমি ছুটতে থাকি। কয়েক পা নেমেই মনে পড়ে যায়, মায়ের হাতে ব্যাগটা দিয়ে আমি দৌড়ে আবার ঘরে ফিরে যাই। খবরের কাগজের আড়াল থেকে বাথরুম চোখ তখন দরজার দিকে। আমার পায়ের শব্দ যাওয়ামাত্রই বাবা অন্যমনস্ক ভাবে ভাগ করে। আমি এক হাতে কাগজটাকে সরিয়ে দিয়ে চট করে গালে হাম থেন্নে ফের ছুটে যাই। মা তখন নীচে বিরক্তিতে মাথা নাড়ছে। মৃধা কিছু বলে মিসেস মৃধাজিঁর সঙ্গে দেখান-হাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত।

আজকাল বাবাকে হাম খেতে আমার কেমন যেন লাগে। যেদিন থেকে স্কুলে

যাচ্ছি সেদিন থেকে বাবাকে হাম খেয়ে যাওয়া একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে। ছোট যখন ছিলাম তখন একরকম ছিল কিন্তু বড় হয়ে গেছি আমি এ কথাটা বাবা একদম খেয়াল করে না। যেদিন একটু সময় থাকে হাতে অথবা বাবার মেজাজ ভাল থাকে সেদিন আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বাবা বলে, “এই যে আমার টিগার্স মা, আমাকে আজকাল আদরই করতে চায় না।” আগে বাবা আমার ঠোঁটে হাম খেত। সেটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার। খুঁতু লেগে যায়। এখন শুধু গালে ঠোঁট ছোঁয়াই। একদিন আড়াল থেকে মাকে এ ব্যাপারে কথা বলতে শুনছি। মা বলছিল, “মেয়েটা বড় হচ্ছে খেয়াল রাখো।” বাবা অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, “সেটা তো তোমার ডিপার্টমেন্ট।” তারপর যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমনভাবে বলল, “তুমি কি হাম খাওয়ার কথা বলছ? সেটা ছাড়া আমি থাকতে পারব না। এটা একটা আমার এক্সপেরিমেন্ট। মেয়েরা বড় হলে বাপমায়ের কাছ থেকে তফাতে চলে যায় মানি, কিন্তু আজন্ম যদি তুমি একটা জিনিস প্রতিদিন করে যাও তাহলে তফাতে যাওয়ার সময়টা পাবে কি করে? ও রোজ আমাকে হাম খায় যেমন ভাত খায় টিফিন খায়।’ মা কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু বাবা জানে না আমি হাম আর চুমু খাওয়ার তফাৎটা বুঝে গেছি। হাম, হামি, হামু—বাবা যাই বলুক না কেন আসলে সবই চুমু খাওয়া। ভদ্রতা করে লোকে নিজের মত এবং সুবিধে অনুযায়ী একটা নাম দিয়ে নেয়। একটা সিনেমা দেখে ব্যাপারটা আমি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। এই সিনেমা দেখা ব্যাপারটা নিয়েও মায়ের নিয়ম-অনিয়ম আছে। সিনেমা দুই প্রকার বড়দের সিনেমা, ছোটদের সিনেমা। বড়দের সিনেমা আমার দেখা চলবে না। যেসব সিনেমায় নায়ক-নায়িকার ছবি থাকে সেগুলো বড়দের সিনেমা। মায়ের ধারণা ওগুলো দেখলে আমি বুঝতে পারব না। আসলে আমি যদি বকে যাই এই হল ভুল। আমার ক্লাসের মেয়েরা হরদম এসব ছবি দ্যাখে। টারজান, লরেল হার্ডি—এইসব ছবি আর কটা হয়। একবছর আগে মায়ের সঙ্গে একটা মনিং শো দেখতে গিয়েছিলাম। লরেল হার্ডির ছবি। সেখানে একটা বাসের মধ্যে একটা লোক তার সঙ্গের মেয়েকে খুব কায়দা করে চুমু খেয়ে অঙ্গান হয়ে যায়। আমি অশ্বকারেও মায়ের থমথমে মুখ বুঝতে পারছিলাম। লোকটা এমন করে চুমু খাচ্ছিল যে, আমার শরীর কেমন হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যদি ওরকম করে আমার চুমু খেত। বাবার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। তারপরই তো আমি সমীরদার লভে পড়ে গেলাম।

বাবামায়ের মধ্যে যে ব্যাপার আছে তা যে দিনের খেলার বোঝা যায় না, এটা কিন্তু আমার কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হয়। আসলে মা অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জিত বলেই এটা সম্ভব। আমার মনে আছে অনেকদিন আগে কমলামাসী একবার দেশে গিয়েছিল। তখন ওর বদলে একটা বাচ্চা মেয়ে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। সে একদিন কথায় কথায় খবরের কাগজ দেয় যে ছেলেটা তাকে খচ্চর বলেছিল। শুনে আমার কি অবস্থা। দৌড়ে মাকে গিয়ে বললাম, ‘ওকে একদুনি

ছাড়িয়ে দাও। মা কি হয়েছে জানতে চাইলে আমি কিছুতেই শব্দটা বলতে পারলাম না। তখন বিরক্ত হয়ে মা ধমকাতে ভাঁ করে কেঁদে ফেললাম। এখন যে কি হাসি পায় ব্যাপারটা ভাবলে। আসলে মায়ের রুচিতে আমি মানুষ বলে অমনটা হয়েছিল। বাবা একবার নিজের মনে বলেছিল শালা দিন দিন সিগারেটের দাম বাড়ছে। কথাটা শুনলে আমার চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি ও কথাটা বললে কেন?’ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘কোন কথাটা?’ আমি উচ্চারণ করতে না পেরে খাতা নিয়ে ইংরেজিতে এস এ এল এ লিখে বাবাকে দেখিয়েছিলাম। তা দেখে বাবার কি হাসি।

দিনের বেলায় তো বাবা মায়ের মধ্যে কথাই হয় না। শনিবার আমার ছুটি থাকে, সেদিন তো সব দেখি। কাগজ পড়ে বাবা বাজারে যায়। সংসারের তিনটি কাজ বাবা করে থাকে। বাজারে যাওয়া, ইলেকট্রিক বিল আর টেলিফোনের টাকা দেওয়া। ব্যাস। বাজার থেকে ফিরে চা খেয়ে দাড়ি কামাতে বসে বাবা। সে যে কি ব্যাপার না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রথমে জুলপিপির পাকা চুল স্না দিয়ে তুলবে তারপর আদর করার মত নিজের দাড়ি কামাবে। ততক্ষণে ভাইকে স্নান করিয়ে নিজে তৈরি হয়ে নেয় মা। সাড়ে নটা বাজতে না বাজতেই নীচে খেতে চলে যায় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। যাওয়ার আগে একবার যন্ত্রের মত জিজ্ঞাসা করে চাবির দরকার আছে কি না। খাওয়া হয়ে গেলে মা আর ওপরে ওঠে না। বাগবাজারের স্কুলে চলে যায়। বাবা বের হয় সাড়ে দশটা নাগাদ। হেলতে দুলতে ঘুমন্ত ভাইকে আদর করে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ‘কি আমার চিপসি মা?’ আমি একটু মোটা-সোটা বলে আদর করে চিপসি বলে ডাকা—দু চক্ষে দেখতে পারি না। আগে চাইতাম আজকাল ঘাড় নেড়ে না বলি। তখন গালে চুমু খেতে হয়—বাবা বেরিয়ে যায়। মা ফেরে বিকেল হতে না হতেই। বাবার ফিরতে রাত সাড়ে নটা দশটা। তখন মা আমার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। অতএব কথা বলার সময় নেই বা ইচ্ছে নেই বলে সময় নেই।

দিনের বেলা তো হল এইরকম। রাতের বেলায় সব অশ্রুত ঘটনা ঘটে। এই পনের দিন তো না হয় মা অসুস্থ। পনের দিন আগে স্কুল থেকে ফিরে বলল পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কদিন বাবা ডাক্তার এক্সরে নানারকম এগজামিন করাল। কিন্তু তার আগে মা বেশ সুস্থ ছিল। রাত্রে একটা ঘরে আমি মা আর ভাই শাই। অন্য ঘরে বাবা। আমার শোওয়া নাকি খুব খারাপ, ঘুমলে হুঁস থাকে না। তাই দুটো পাশ-বালিশ দিয়ে পাঁচিল তুলে দেওয়া হয় আমার আর ভাই-এর মধ্যে, মা ধারে। ভাই হবার আগেও বাবা পাশের ঘরে শততো।

মাসখানেক আগের কথা। মাঝরাতে, ঘুম ভাঙলেই তো মাঝরাত মনে হয় কেমন আবছায়া হতে হতে ঘুমটা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চাপা গলার কথা শুনতে পেলাম, ‘লজ্জা করে না তুমি এই ঘরে এসেছ?’

বাবা বললো, ‘অতসী, আমার কথাটা শোন।’

‘কিছু শোনার নেই আমার। সারা জীবন অনেক শুনছি। দয়া করে একটু ঘুমুতে দাও।’ মায়ের গলায় এ রকম বিরক্তি আমি আগে কখনও শুনিনি।

‘তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ।’ বাবার গলাটা কেমন দুর্বল লাগল।

‘আমার বয়ে গেছে রাগ করতে।’

‘কিন্তু তোমাকে জবাব দিতে হবে কেন তুমি এ রকম ব্যবহার করছ। সব কিছু একটু সীমা আছে। আমি পুরুষ মানুষ ভুলে যাচ্ছ কেন?’

‘বেশ তো।’ মায়ের গলাটা বিদ্রুপে ক্যানকেনে, ‘কে তোমাকে নিষেধ করেছে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে পুরুষ দেখাও। শব্দ আমার ছেলেমেয়েদের ওপর তার ছায়া না পড়লেই হল।’

‘তুমি আমাকে বেশ্যাবাড়ি যেতে বলছ?’

‘আমি কিছুই বলছি না। তুমি এই বাড়টাকে ওই রকম করে তুলেছ!’

‘মানে?’

‘তুমি কি ভেবেছ আমি সংসার সামলাবো, মেয়েকে পড়াবো, বাচ্চাকে দেখব, চাকরী করব আর রাতে তোমার শরীরের চাহিদা মেটাবো?’

‘এ সব কথা ও-ঘরে গিয়ে বললে হতো না? মেয়ে জেগে যাবে।’

‘জাগুক। আর একটু বড় হলে আমি নিজেও ওকে বলব এসব কথা।’

‘কিন্তু ভুল তো মানুষ মাত্রেরই হয়। আর তুমি বড়তে পারছ না কেন কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ বা বোগাবোগ মানেই প্রেম নয়।’

‘তোমার এই সব যুক্তি আমি অনেক শুনছি, ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এই দুটোর জন্য আমি পড়ে আছি এখানে। ঠিক আছে, যাও না, ওই সব মহিলার কাছে—আমি কি বারণ করেছি।’

‘প্লিজ অতসী! তুমি একটু নরম হও। তোমার খুব খাটুনি যাচ্ছে, আমি তো অনেকবার বলেছি তোমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে। ও-টাকা না হলেও আমাদের চলে যাবে।’

‘আর তারপর সারা জীবন তোমার খেয়ালখুশী মতন চলতে হবে, না?’

‘অতসী!’

‘আঃ, আমার গায়ে হাত দেবে না। ফের যদি এমন কর তাহলে আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব।’ মায়ের এবারের গলাটা বেশ চড়া।

কিছুক্ষণ কোন কথা শুনতে পেলাম না। আমি জেগে আছি এবং সব কথা শুনতে পাচ্ছি তা যাতে কেউ টের না পায় তাই মড়ার মত পড়েছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি দু-একটা ব্যাপারে কেমন লাগলেও এইসব কথাবার্তায় মায়ের ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শব্দ শব্দ দিয়ে আমাকে ধমকাচ্ছে, এ রকম খারাপ ব্যবহার করছে। কি হতো ও-ঘরে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বললে। দিনের বেলায় মায়ের সঙ্গে এই মূহুর্তের মায়ের কোন মিল নেই। তার কিছুক্ষণ পরে আমি

চমকে উঠলাম। ভাগ্যিস ঘরটা অন্ধকার ছিল। পাশবাঁশিরের আড়ালে নিজেকে শক্ত করে রেখে আমি মায়ের ফোঁপানি শুনছিলাম। মা একা একা কাঁদছে। এই প্রথম মাকে কাঁদতে দেখলাম। তখনই সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। প্রেম কথাটা আমি এতদিনে জেনে গেছি। বাবা কি অন্য কোন মহিলার সঙ্গে প্রেম করছে? মায়ের ওপর যে রাগটা হচ্ছিল সেটা চট করে চলে গেল। আমার মা দেখতে খারাপ নয়, তাহলে বাবা কেন অন্য মহিলার সঙ্গে প্রেম করবে? আগেকার দিনে রাজারা দুর্ভাগিনটে বিয়ে করত, বাবাও কি সেরকম করবে? ছি, তাহলে আমি সেই মহিলাকে মা বলতে, পারব না। মায়ের কান্না শুনতে শুনতে আমারও কান্না পেয়ে গেল। আমি চুপচাপ কাঁদতে লাগলাম। আমার মনে পড়ল, একদিন শনিবার হবে সেটা, মা স্কুলে চলে গেলে বাবার একটা ফোন এসেছিল। আমি ধরেছিলাম সেটা, বাবা তখন বাথরুমে, মহিলার গলা ছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল চিনবে না। সেই মহিলা কি!

আমাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। ছেলেবেলায় সেটা বাজলেই আমি দৌড়ে গিয়ে ধরতাম। কিন্তু একদিন একটা লোক বদমায়েসী করে খুব অসভ্য কথা বলেছিল। সেটা মাকে বলতেই আমার টেলিফোন ধরা বন্ধ হল। সবাই যে খারাপ কথা বলে তা নয়। একজন খুব মিষ্টি গলায় আমার নাম কি, বয়স কত এইসব গল্প করেছিল। এখন আমি অবশ্য টেলিফোন ধরি। সেটা বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। কমলামাসী নীচে তখন উনুন-টুনুন নিয়ে ব্যস্ত। জামাকাপড় পরিয়ে ভাইকে নিয়ে আমি খেলা করছি এমন সময় টেলিফোনটা বাজে। কমলামাসীর পায়ের শব্দ পেলেই আমাকে রঙ নান্সার বলে ছেড়ে দিতে হয়। এই নিয়ে সমীরদা খুব রাগ করে। কিন্তু আমি কি করব বন্ধুতে পারি না। মা যদি জানতে পারে তাহলে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে। এই কদিন তো ফোনই ধরিনি। মায়ের শরীর খারাপ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি কণ্টাই না পাচ্ছিল। পাড়ার ডাক্তারবাবুর ওষুধে কাজ হল না। যেদিন প্রথম ব্যথাটা বাড়ল সেদিন বাবা জানতো না, যেমন দেরী করে বাড়ি ফেরে তেমন আসছিল। এসে ওই অবস্থা দেখে কেমন চোরের মত দাঁড়িয়েছিল। কমলামাসী ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছে, ওষুধ কেনা হয়েছে শুনলে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মায়ের বিছানার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখন কেমন আছ?'

মা কথা বলতেন একটাও। দাঁতে দাঁত টিপে শূন্যেছিল, চোখের কোল টলটলে। সেটা ব্যথার জন্য না অন্য কিছু জানি না। পরদিন রাতে অফিসে গেল না, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর এই কয়দিনে তিনজন ডাক্তার দেখার পর মা হাসপাতালে গেল। এর মধ্যে আমি কি করে সমীরদার ফোন ধরি। বন্ধুতে পাচ্ছি খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছে সমীরদা, ছেলেরা না একটু কিছু বন্ধুতে চায় না।

॥ দুপুর বেলায় ॥

একটু আগে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। মদ্য গম্ভীর, অন্যমনস্ক হয়ে

স্নান-খাওয়া করল। আজ বাইরেটা বেশ মেঘলা করেছে। কমলামাসী অনেক কণ্ঠে ভাইটাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছে। বাবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি থেয়েছি। মা এখন কেমন আছে। কাল রাতের কথা মনে পড়ছে। মায়ের বিছানার পাশে আমরা বসেছিলাম। অত দৃষ্ট যে বাম্পাটা সেও যেন বন্ধুতে পেরেছিল মায়ের শরীর ভাল নয়। চুপটি করে আমার কোলের কাছে বসেছিল। বাবা সারাদিন বের হয়নি। মায়ের জ্বর জ্বর লাগছিল বলে টেম্পারেচারটা নিচ্ছিল। হঠাৎ মা বলে উঠল, ‘আমি যদি মরে যাই তাহলে ভেব না আমি চলে যাব। ঠিক ভূত হয়ে তোমাদের কাছে ঘুর-ঘুর করব।’

বাবা নিজেকে কেমন একটা শব্দ করে বলল, ‘কি যে ছাইপাশ কথা বল। মরার নাম করছ কেন?’

মা বলল, ‘বাঁচতে আমার আর ইচ্ছে করে না গো।’ ইদানীং দেখছি, অসুখটা বেড়ে যাবার পর মা বাবার সঙ্গে কেমন অদ্ভুত গলায় কথা বলে। সেই ঝাঁঝটা নেই, ভীষণ নির্লিপ্ত মনে হয়। ‘আমার এ সব কথা শুনতে ভাল লাগছে না।’ বাবা যেন রাগ করল। মা হাসল তারপর আমাদের দিকে মৃদু ফেরাল। মায়ের চোখে চোখ রাখতে পারলাম না আমি। কেমন অদ্ভুত চোখ। মা হেসে বলল, ‘তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে খুকী?’ আমি ঘাড় নাড়লাম। ‘মন দিয়ে পড়াশুনা করবি, ভাইটাকে দেখাবি। ও যখন বড় হবে তখন আমার কথা ওকে বলবি।’ সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, ‘মা, তুমি এমন করে বলছ কেন?’

‘দূর বোকা মেয়ে। বলছি তো কাঁদাছিস কেন? এখন তো তুই একা নেই, তোমার ভাই আছে। সব সময় মনে রাখবি।’

ঠিক তক্ষুনি আমার সেই রাতটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অনেক অনেক দিনের আগের সেই রাত। ভাই তখন হয়নি। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বাজ পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে পাশবালিশ সরিয়ে মায়ের কাছে যাব ভাবছি সেইসময় বাবার গলা পেলাম। বাবা এত রাত্রে আমাদের ঘরে আসে না। কি কথা হচ্ছে শুনবার জন্য কাঁট হয়ে শুয়ে থাকলাম। বাবা বলছিল, ‘কিন্তু তুমিই তো একসময় আগ্রহ দেখিয়েছিলে এখন না বলছ কেন?’

‘আমি যখন চেয়েছিলাম তখন খুকীর তিন বছর বয়েস। তুমি না বলেছিলে।’

‘তখন অসুবিধে ছিল সে কথা তো অনেকবার বলেছি।’

‘তুমি তখন আমাকে ডিভোর্সের কথা ভাবছিলে।’

‘না সে রকম নয়—’

‘এখন আর হয় না। আমার আর ইচ্ছে নেই। তুমি যদি জোর কর তাহলে যে আসবে সে আনওয়াটেড চাইল্ড হয়ে যাবে।’

‘কিন্তু একটা কথা বন্ধুতে পারছ না কেন? এই বিরাট পৃথিবীতে তুমি আর আমি ছাড়া খুকীর কেউ নেই। আমাদের নিজেদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো নেই বললেই চলে। তাই একটা সময় তো নিশ্চয়ই আসবে যখন আমাকে এবং

তোমাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। ভাবতে পার তখন খুকী কিরকম একা হয়ে যাবে। নিজের বলে ওর কেউ থাকবে না।’

মা যেন কিছুক্ষণ ভাবল, ‘ওর বিয়ে হয়ে যাবে, স্বামী পাবে, ঘর পাবে।’

‘যদি না মিল হয় দুজনের?’

‘আমার মত অ্যাডজাস্ট করে নেবে। আমি পেরেছি ও পারবে না কেন?’

‘এখন তুমি এই কথা বলছ, কিন্তু একদিন এই সব কথা তুমিই বলেছিলে।’

‘আমরা তো আবার আগের মত হতে পারি, পারি না?’

‘পারো?’

‘কেন পারি না? তুমি একবার আমাকে সুযোগ দাও।’

‘এর আগে অন্তত পাঁচবার তুমি এই কথা বলেছ। ঠিক আছে, খুকীর জন্য আমি আর একবার নিজেকে ঠকাই। তবে আজ নয়।’ বাবা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাশের ঘরে চলে গেল।

মায়ের কথাটা শুনে আমার সেই রাতটাকে মনে পড়ে গেল। আমি একা থাকব বলে মা ভাইটাকে এনেছে? এর মধ্যে, এই কিছুদিন হল, আমার স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে গেছি মানুষ কি করে জন্মগ্রহণ করে।

কিছুক্ষণ ওঘরে বসে থেকে বাবা আমার কাছে এল। আমি চুপচাপ জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিলাম বাবা এসে আমার মাথায় হাত দিল। আমার জিজ্ঞাসা করতে ‘খুব ভয় করছিল, তবু বললাম, ‘মা কেমন আছে?’

‘ভাল নয়। অপারেশন হয়েছে, জ্ঞান ফেরেনি। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবে ডাক্তার বলল।’

‘আমি যাব বিকেলে তোমার সঙ্গে।’

‘যাবি? না থাক। বাপা একা থাকবে, কান্নাকাটি করতে পারে। হ্যারে তোর মা কি খুব ঝাল খেত?’

শনি রবিবার ছাড়া দুপুরে মায়ের খাওয়া আমি দেখি না। তবু মনে করতে পারলাম না তেমন কিছু, ঘাড় নাড়লাম। বাবা আমার চুলে হাত বোলাচ্ছিল। সামনে খাটের ওপর ভাই হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। ‘খুকী, তুই তো এখন বড় হয়েছিস, বুঝতে শিখেছিস, আমি তোর মাকে বলেছি তুই থাকতে ভাইয়ের কোন কষ্ট হবে না।’

‘কেন, মা তো ফিরে আসবে?’ আমি কেমন শিউরে উঠলাম।

‘আসবে, কিন্তু যদি না আসে!’

আমি ঘাড় নাড়লাম। ভাই আমাকে খুব ভালোবাসে। ইহাং বাবা কেমন গলায় বলে উঠল, ‘খুকী, তোর মা কি তোর কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে?’

‘না তো, কেন?’

‘না, এমনি।’

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। বাবাকে কেমন যেন

হতভম্ব দেখাচ্ছিল। আমাকে ইঙ্গিত করে ফোনটা ধরতে বলল। আমি রিসিভার তুলতে লোকটা নাম্বার যাচাই করে নিয়ে বলল, ‘পেশেন্টের অবস্থা ভাল নয়, ইমিডিয়েট রক্ত চাই। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।’ খবরটা শুনে বাবা আলমারি থেকে তড়িঘড়ি করে একগাদা টাকা বের করে হস্তদস্ত হয়ে চলে গেল। বাবার সময় আমি বাবাকে বললাম, ‘তাড়াতাড়ি এসো, না হয় ফোন করো।’ বাবা ঘাড় নেড়ে দৌড়ে নেমে গেল।

বাবা চলে গেলে আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। মায়ের যদি কিছু হয় তাহলে আমি কি করব? সারা জীবন মাকে ছাড়া থাকব কি করে? অ্যান্ড্রিন মাকে অন্যরকম ভেবেছি বলে কেমন খারাপ লাগতে শুরু করল। আমার যখন সেই জিনিসটা প্রথম হয় তখন মা কি যত্ন করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। রান্ধির বেলায় মা না থাকলে আমার ঘুম হয় না। হঠাৎ মনে হল আমি তবু মাকে এতদিন ধরে পেয়েছি ভাইটা তো মা কি জানতেই পারল না। শোওয়ার ঘরে এলাম, ঘুমুতে ঘুমুতে ভাই হাসছে। বুদ্ধের ভেতরটা কেমন করতে লাগল আমার।

আলমারির দরজা হাট করে খুলে বাবা চলে গিয়েছে। মা থাকলে এমনটা হতে দিত না। আমার জামাকাপড়ের একটা আলাদা সুটকেস আছে। মা আলমারিতে হাত দেওয়া পছন্দ করত না। সব আগোছালো করে দেব নাকি। ওপরের তাকে লকার, মাঝখানেরটা বাবার জামাকাপড়, নীচেরটায় মায়ের শাড়ি। উঃ, প্রচুর শাড়ি মায়ের। চড়া রঙগুলো তো মা পরেই না। প্রায়ই বলে, ‘আর একটু বড় হলে তুই পরবি।’ আজ যদি মায়ের কিছু হয় তাহলে এই শাড়িগুলোর কি হবে? আমি একটাও পরতে পারব না। শাড়িগুলোর কাছে মদুখ নিয়ে গেলেই মায়ের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। একদম তলায় বেনারসীটা। মায়ের বিয়ের বেনারসী। হাত দিলাম, কি মোলায়েম। অন্যমনস্ক হয়ে শাড়িগুলো ঘাঁটিছিলাম আর মনে হচ্ছিল মায়ের পাশে বসে আছি। হঠাৎ হাতে শক্ত মতন কি ঠেকল। টানাটানি করে কাপড়ের চাপ থেকে সেটাকে বের করে দেখলাম একটা ছোট্ট অ্যালবাম। আমাদের অনেকগুলো অ্যালবাম আছে কিন্তু এটাকে আগে দেখিনি। কোতুলকী হয়ে পাতা ওলটলাম, প্রথমে মা-বাবার বিয়ের ছবি। তলায় তারিখটা লেখা। তার পাশে লেখা, ভীষণ লাজুক। পরের পাতায় বাবার একলা ছবি, কেমন বাচ্চা বাচ্চা। নীচে লেখা, ফুলশয্যা, খুব হ্যাংলা এবং রান্ধসও। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল আমার। মানে-গুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে। তারপর অনেক ছবি, বেশীরভাগ মা-বাবার বাইরে বাবার। মা গগলস্ পরেছে, এক জায়গায় প্যান্ট পরে কেমন পাঁহাড়ে ঘোড়ায় চেপেছে। হঠাৎ দেখি একটা পৃষ্ঠকে বাচ্চা—তার নীচে দেখা, খুবকী এল। আমার জন্ম তারিখ। ব্যাস, আর কোন ছবি নেই অ্যালবামে। সব কটা পাতা খালি। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভাবিনি, মা কেন নিজের অ্যালবামটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল?

ঘুম থেকে উঠে ভাই বলল, ‘মা আতেনি?’ আমি ঘাড় নাড়লাম, না।

এই সময়টা ও ঘ্যান ঘ্যান করে। কোন কিছতেই ভোলানো যায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খাটের ওপর দিয়ে জানলার ধারে চলে যায়। আমাদের দোতলার জানালা দিয়ে নীচের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। স্কুল থেকে মা যখন রিকশায় বাড়ি ফেরে তখন ও জানলার দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। আজ কমলামাসীকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। এই যেমন এখন ভাইকে সামলাতে সামলাতে কমলামাসী বার বার আড়চোখে আমার দেখছে, কেন ?

আমার মা কি মরে যাবে ! কিছুদিন আগে অবধি আমি জানতাম মরে গেলে ভাল লোকেরা ভগবানের কাছে চলে যায়, খারাপ লোকেরা ভূত-পেত্নী হয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। মা কেন বলল যে ভূত হয়ে ঘুর ঘুর করবে। মা কি খারাপ লোক ? মা না ফিরলে—চোখ বন্ধ করে মায়ের মৃৎখটা ভাবছিলাম। মা যেমন করে হাসে, কথা বলে, রাগ করে, চুল বাঁধে সব মনে করে নিয়ে নিজের চোখের পাতায় দেখছিলাম। ক্রমশ এমন মশগূল হয়ে গেলাম যে খেলার কারিনি কখন ভাইকে কোলে নিয়ে কমলামাসী আমার সামনে এসে ডাকছে।

‘ও খুকু ছি ছি, কাঁদে না মা !’ কমলামাসী বলতে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার গাল দুটো ভিজে গেছে। ‘আমরা তো কিছু জানি না, দিদির বাড়িবাড়ি হয়েছে মানেই কি আর—। চোখের জল মানুষের খুব খারাপ করে দেয়।’ কমলামাসী আমার সামনে ভাইকে নিয়ে বসল। বোধ হয় আমাকে কাঁদতে দেখেই ভাই অবাক হয়ে ওর কোলে জড়সড় হয়ে বসে আছে। বড় বড় চোখে আমার মূখের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

‘মাসী, মায়ের কেন এমন হল ? আমি তো কোনদিন মাকে দুঃখ দিইনি।’

কমলামাসী এখন বড়ী হয়ে গিয়েছে। যখনই কথা বলে তখন বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ে, ‘কে কিসে দুঃখ পায় তা যদি জানতে পারা যেত ভাই। এই আমি তো তেনাকে দুঃখ দিইনি একদিনও, খোকাকে মারিনি পর্যন্ত, তা তারা চলে গেল কি দুঃখ পেয়ে ? আমরা জানতে পারিনা ভাই।’

এই সময় টেলিফোনটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে গেলাম ওটা ধরতে। লোকটা যে নাম্বার বলল সেটা আমাদের নয় ! রং নাম্বার বলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বুকটা যেন হালকা হল সামান্য। আমি কি হাসপাতালের কোন খবর আশা করেছিলাম ? চলে আসছি দেওয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। এই সময় সমীরদার ফোন করার কথা। এখন রুটিন হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। এতদিন আমার সন্দেহ হতো মা বোধহয় সমীরদার ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছে। টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে মনে হল মা আমার অনেক কিছু বুঝতে পারত। আমি যখন ছোট ছিলাম মা আমাকে মিথ্যে কথা বলতে নিষেধ করত। বলত, ‘তুই যখন মিথ্যে বলবি তখনই আমার বৃকের ভেতরটা কেমন করে আর আমি টের পেয়ে যাব।’ খুব বিশ্বাস করতাম তখন কথাগুলো। সমীরদার সঙ্গে একদিন অনেকক্ষণ রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলাম। সেই প্রথমবার। ভয়ে ভাল করে কথা বলতে

পারছিলাম না, সব সময় মনে হচ্ছিল কেউ দেখে ফেলবে। আমার বন্ধু শোহিনীদের বাড়িতে সন্মতী পূজা হয়, ও জোর করে আমায় নিয়ে গিয়েছিল বাবা মাকে রাজী করিয়ে। সমীরদা শোহিনীর দাদা। এর আগে দু' একবার স্কুলে দেখেছি সমীরদাকে, শোহিনীকে পেঁছে দিতে গিয়েছিল। লম্বা খুব স্মার্ট, কলেজে পড়ে। সেই সিনেমাটার চুমু খাওয়া লোকটার মত, আমার মনে হয়েছিল আলাপ করতে না পারলে মরে যাব। শোহিনী আলাপ করিয়ে দিলে দেখলাম কথা বলতে পারছি না। তারপর ওই পূজার দিন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমাকে বাড়িতে দিতে এসে সমীরদা গল্প করতে করতে অনেক রাত্তা ঘোরাল। যখন সমীরদা বলল, 'তুমি এত সুন্দর যে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। তোমার আপত্তি আছে?' আমার মনে হল যে আমি পাগল হয়ে যাব। এই প্রথম এ সবকথা কেউ আমাকে বলল। আমরা ঠিক করে নিলাম কখন ফোনে কথা বলব। সমীরদা বাড়িতে আসতে চেয়েছিল, আমি দিইনি।

সেদিন বাড়িতে ফেরামাত্র মা ভু কঁচকে ছিল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

ধক করে উঠেছিল বুকটা, 'শোহিনীদের বাড়িতে।'

'তোর হাঁটু অবধি এত ধুলো কেন?'

'কি জানি।' বলে তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল মা আমার বুকের ভেতরটা দেখে ফেলেছে। সেই রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না, সারাক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করছিলাম। তাছাড়া আমার অন্য ভয় হচ্ছিল। মা বলে আমি নাকি ঘুমের ঘোরে কথা বলি। যদি আজ রাতে সেরকম ভাবে সমীরদার কথা বলে ফেলি। হঠাৎ মা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হয়েছে?'

চমকে উঠে বললাম, 'কিছু না তো।' মাত্র কয়েক হাত দূরে মা শূন্যে আছে, বুক হাত দিলে হৃৎপিণ্ডটাকে টের পেয়ে যেত।

'ঘুমিয়ে পড়।'

সেদিন থেকে আমার মনে হত মা যেন কেমন চোখে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকায়। হয়তো আমার ভুল তবু অস্বস্তি হতো। না, তারপর থেকে আমি শোহিনীদের বাড়িতে যাইনি, সমীরদার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিনি। সেদিন সমীরদা আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার খুব ভয় করছিল বলে যায়নি। তার চেয়ে টেলিফোনে কথা বলাই ভাল। ইদানীং সমীরদা প্রায়ই বলে বাইরে বেরদুতে। ওদের কলেজের কাছে খুব ভাল রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে কেবিনে বসে অনেকক্ষণ কথা বলা যায়। কেউ দেখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি সেই সিনেমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই।

॥ রাত্তিরবেলা ॥

একটু আগে আকাশ থেকে একটা তারাকে ঝরে পড়তে দেখলাম। কমলামাসী বলল ওটা দেখা নাকি খুব খারাপ, অমঙ্গল হয়। বাবা যে সেই গেছে আর কোন খবর দেয়নি। মা কি রক্ত নিয়ে সুস্থ হয়নি? তাহলে বাবা আসছে না কেন?

একটা টেলিফোনও তো করতে পারত। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যে আশংকাটাকে সারাদিন ঢেকে ঢুকে রেখেছি তাকে যেন আর সামলানো যাচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলায় ভাই খুব কান্নাকাটি করেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কথা বলেছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও আজ মাসীর হাতে খেতে চায়নি মোটেই। আমি কোলে বসিয়ে থাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। তাই দেখে মাসী বলেছে, 'আজ তুমি সত্যিকারের দিদি হলে, তোমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।' আজকে কেমন অন্যরকম লাগছে। মা যেভাবে ভাইকে খাওয়াতো, ঘুম পাড়াতো আমি অবিকল সেইরকম করতে ও আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হচ্ছে আমি যেন ওর কাছে দিদি নই কেমন করে মা হয়ে গেছি। মা যা যা করত তাই দেখে আমি করে যাই তাহলে ওর কোন অসুবিধে হবে না, ক্রমশ এটাই মনের ভেতর জুড়ে বসছে।

আর তারপর থেকেই মনে হচ্ছে মাকে আমি ঠিকিয়েছি। সমীরদার ব্যাপারটা আমি একদম চেপে গিয়েছি। মাকে কি বাবাও ঠিকিয়েছে? সেই মহিলার সঙ্গে প্রেমটোম করা নিয়ে মা খুব কের্দেছিল। আমি জানি মা বাবাকে খুব ভালোবাসত। অ্যালবামের ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। কি অভিজ্ঞতার মাকে এখন কাদতে হয়? আমি সেটা জানি না, যদি জানতে পারতাম তাহলে আমি হয়তো ভবিষ্যতে মায়ের মত কাদতাম না। হঠাৎ মনে হল আমার এবং বাবার জন্য আজ মায়ের শরীরে রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

ভাইটা এমন ভঙ্গীতে ঘুমচ্ছে যে ওর বুক লাগবে। ঠিক করে শুইয়ে দিতে গিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরল ও। ঠিক এই সময় অনেক দূরে আওয়াজটা শুনতে পেলাম। আমাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে শব্দগুলো রোজ গঙ্গার দিকে চলে যায়। শব্দটা কানে যেতেই সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল আমার। মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কমলামাসীকে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমি। হঠাৎ মনে হল পৃথিবীটা কেমন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। খুব চাপা, গম্ভীর এবং কান্না মেশানো হারিশব্দনিটা এগিয়ে আসছে। এক-একটা শব্দ যায় চিৎকার করে শাসাতে শাসাতে। এটা মোটেই সেরকম নয়। কমলামাসী পাশের জানালার ধারে বন্ধ পড়ে দেখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভাই কেঁপে উঠতেই আমার কি হল জানিনা আমি দ্রুত-হাত দিয়ে ভাই-এর কান চেপে ধরলাম। না, ওকে এই শব্দ শুনতে দেব না। দাঁতে দাঁত চেপে আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছ, মা এইসময় এখানে থাকলে কি করত?

ওরা কি মাকে নিয়ে আসছে? মাগো! ওরা কারা! মাঝি হাসপাতাল থেকে ওদের কি করে যোগাড় করল। আমাদের কোন আত্মীয় এতো কোলকাতায় নেই। এখানে আমরা একা। নাকি বাবার অফিসের লোকজন সব। শব্দটা এবার কাছে এসে গেছে। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামবে। আমি ভাইকে কখনো জাগতে দেব না।

এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা চিৎকার করে উঠল। নিশ্চয়ই কেউ খবর

দিচ্ছে। কমলামাসী আমাকে একবার দেখে ছুটে গেল ফোন ধরতে। শব্দটা আসছে। খুব আবছায়া দেখলাম কমলামাসীকে, 'তোমার ফোন ভাই, শোহিনী করছে।' শোহিনী! সমস্ত শরীর নিরন্তর আমার। ভাই-এর কান থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আমি কি টেলিফোন ধরতে যাব? আমি বলতে গেলাম আমি কথা বলব না। সেই সময় যেন টেউ-এর মত দুলতে দুলতে শব্দটা আমাদের বাড়ির সামনে দিলে চলে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে কমলামাসীকে দূর-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করতে দেখলাম! কোথাও যখন কোন শব্দ নেই কমলামাসী বলল, 'উঃ, বৃকটা কেমন করে উঠছিল। কি হল, টেলিফোন ধরে রয়েছে।'।

কিভাবে আমি টেলিফোন পর্যন্ত হেঁটে এলাম জানি না। শোহিনী হাসল কিরে ঘূমুচ্ছিস?' 'না।' 'তোমার মা-বাবা বাড়িতে আছে?' 'না।' 'গুড, কথা বল।' পরমুহুর্তেই সমীরদার গলা পেলাম 'কার সঙ্গে সারা বিকেল কথা বলছিলে, কতবার ডায়াল করলাম লাইন পেলাম না। আর কেউ ফোন করে নাকি?'

'মানে?' আমার মনটা হঠাৎ থমকে গেল। আমার কোন উত্তেজনা হচ্ছে না কেন? 'যা সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না। এই শোন, আমি আর পারছি না কাল বাইরে দেখা করতেই হবে।' সমীরদার গলায় দাবীর সুর।

'পারব না। আমার মা হাসপাতালে গেছে।'।

'কেন?' সমীরদাকে চিন্তিত শোনাল। ভাল লাগল আমার, 'শরীর-খারাপ।'।

'গুড। তাহলে ওই ঝিটাকে কোনরকমে ম্যানেজ করে বাড়ি থেকে বার করে দাও কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমরা তোমার বাড়িতেই—' বলে অশ্রুত হাসল, 'কী রাজী?' 'কেন?'

'তোমাকে হাম না খেতে পেলে আমি মরে যাব।'।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা কেমন করে উঠল। চোখের সামনে আমার মা দাঁড়িয়ে। হ্যাংলা এবং রান্সস কথাটা ভয়ংকর হয়ে গেল আচমকা। আমার পালাবার যেন কোন পথ নেই। রান্সসটা তেড়ে আসছে সামনে। কি করে জানি না মায়ের সেই কথাগুলো মনে করতে পারলাম, খুব গম্ভীর গলায় বললাম, 'আমি আপনার শরীরের চাহিদা মেটাতে পারব না। দয়া করে আমাকে ফোন করবেন না। এটা বে—।' কথাটা আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না। 'আরে, যা শালা, কি হল—।' সমীরদার গলাটাকে টিপে ধরলাম টেলিফোন নামিয়ে।

আমার পায়ে এখন ভীষণ জোর। মায়ের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে গিয়েছি। মা যা যা করতো আমি সেইগুলো করতে পারব না কেন? বরং মায়ের ভুলগুলো আমি যাতে না করি—এই সময় টেলিফোনটা আবার বাজল। সমীরদা? একবার ভাবলাম ধরব না, তারপর শক্ত হাতে রিসিভার তুললাম।

'খুকী তোরা কেমন আছিস?' বাবার গলা। 'ভাল আছি বাবা। মা কেমন আছে?'

'এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার বলছে কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। আমি ভাবছি থেকে যাই কাল পর্যন্ত। তোরা একা থাকতে পারবি তো মা?'

'তুমি কিছু চিন্তা করো না। আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি বাবা।' কথাগুলো বলতে যে কি তৃপ্তি লাগল।

চর, শহর এবং একটি বেকুফ

দিনরাত এখানে হাওয়া উথাল-পাতাল হয়। চিকণ বালির সর গায়ে মেখে পাক খাই নিচু আকাশে। সূর্যের কড়া টানে বদর-বদর হয়ে গিয়েছে চরের বালি। কাশ আর বুনো ঝোপে ছেয়ে গেছে চওড়া নদীর বুক। শূন্য এক পাশে, সেই সেপাড়ে, পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা জলের ধারা তিরতিরিয়ে বয়ে বয়ে বাঙলাদেশের দিকে। ওপারের গরু হেঁটে পেরিয়ে আসে এদিকের চরে স্বচ্ছন্দে।

দুই মাইল চওড়া এই নদী সেদিনও পৃথিবী কাঁপাতো। হ'মাস নিরীহ সাপের মত গা এলিয়ে যে ঘুমতো তার গায়ে খুঁটি পৌঁতার সাহস হয়নি কারো। যেই বৃষ্টির ফোটা পড়ল, পাহাড়ে নাচন শব্দ হল বর্ষার, সঙ্গে সঙ্গে নদী দাঁড়াতো ফণা তুলে তারপর ছোবল আর ছোবল। দু'মাইল চওড়া বোলা জল দিনরাত গর্জে উঠত আর পাশের শহরটার প্রাণ সেই শাসানিতে হয়ে থাকত আধমরা। হঠাৎ একদিন জলগলো নদী ছেড়ে উঠে এল দুই পাড়ে। দমড়ে মদুচে শহরটাকে ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে নেমে গিয়েছিল আবার। লোকে বলল, প্রলয়, মহাপ্রলয়। মানুষ মরল, সম্পত্তি গেল, অতবড় শহরটাকে মৃত্যুপদীর মত দেখাচ্ছিল।

ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দাঁত ভাঙ্গার কাজ শব্দ হয়ে গেল। আশ্চর্যে আশ্চর্যে বাঁধা হল নদীটাকে। সেই পাহাড়ের তলা থেকে বোন্ডার সাজানো হল, বাঁধ তোলা হল শহরের খানিক ওপর থেকে। ফণা তোলার আগেই কোমরে ঠিকঠাক ঘা মেরে রাখা হল। পোষা কুকুরের মত তখন ওই পঞ্চাশ গজে জল নেমে যায় বাংলাদেশের দিকে।

আশ্চর্য! নদী এই বাঁধন মেনেও নিল। আর তার ফণা নেই, নেই ফোঁস-ফোঁসানি। যদি কিছু বাড়তি জল বর্ষায় নেমে আসে তা চালান করে দেয় অন্য দিকে। পাহাড়ের গা থেকেই আর একটা ধারা অন্য দেশ অন্য গ্রাম দিয়ে বয়ে যায়। তাই শহরের মানুষ নিশ্চিন্ত। আর দিনের পর দিন বয়ে যাওয়া জল রাস্তায় বালি ফেলে চরের শরীর মোটা করছে। নদী তাই নিজের বালি নিজেই আঁতরু করতে পারে না। পঞ্চাশ গজেই প্রাণভোমরা দুকপুক করে।

শহরটা কিন্তু চটপট নিজেকে সরিয়ে নিল। বেশ রঙে হয়ে উঠেছে আবার। সেখান থেকে একটা লোক একদিন উঠে এল বাঁধে। উঠে জরিপ করল নদীর বুক। তারপর পেছন ফিরে চিৎকার করল শহরটার উদ্দেশ্যে। তার বদপাড়টা ভেঙ্গে দিয়েছে নগরপাল। ঘর ভাড়া পাওয়া এখানে স্বপ্নের মত ব্যাপার। শূন্য দিনমজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রান্ধির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না। একটা ভিখরীকেও এই শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বদপাড়ি ভেঙে তাকে নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল জেলখানায়। তিনদিন বেদম পিটুনি দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। পকেটে যার টাকা নেই তাকে কে দেবে ঘর! অন্য মজদুররা ওই ভিনদেশীকে দেখেনি ঠাই। ফলে লোকটা উঠে এল বাঁধে। এসে বলল, শহরের মুখে আমি ইয়ে করি।

লোকটা বালির মধ্যে হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর কয়েকটা বাঁশ আর দরমা দিয়ে তৈরী করে নিল মাথা গোঁজার জায়গা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয় কিন্তু জানলা কেটে নিল সে। ফুরফুরে বাতাস ঢুকতে লাগল অবিরত।

আর তাই দেখে শহরের লোক উঠল আঁতকে। একি পাগল! ওই সাপের গালে গাল রেখে কেউ বুম্মাতে পারে? খবরটা পৌঁছালো নগরপালের কাছে। তাঁরা কাগজ নেড়ে দেখলেন নদীর চর শহরের সম্পত্তি নয়। অতএব যে মরতে চায় সে মরুক, শহরের লোকের তাতে কি যায় আসে!

অতএব তিনমাসের মধ্যেই চালার গায়ে লতানো গাছের কচিপাতা বাতাসে দোল খেতে লাগল। সারাদিনে মজদুরের কাজ সেরে বিকেলে ফিরে যায় লোকটা চালায়। শহরের লোক ভুলেও চরে পা দিত না। দুরের বাঁধে দাঁড়িয়ে তারা চালাটাকে দেখতো আর হাসতো। লতানো গাছে কি যেন একটা ফলও ফলিয়েছে লোকটা। খবরটা শহরের নিচু তলায় পৌঁছে গেল। যারা কোনমতে ঘর যোগাড় করে আধপেটা খেয়ে-পড়োঁছিল তাদের দুজন সাহস পেল। কোনরকমে আর একটা চালা তৈরী করে নিল খানিক তফাতে। তবে সে কিনা সংসারী মানুষ, বউ বাসন মাজে বাড়ি বাড়ি। শ্বিতীয় লোকটা অবশ্য সেই পয়সায় খাল না। তার গাঁজার মশলার হাত চমৎকার। এরকম একটা নির্জন চরে তার ব্যবসা জমে গেল খুব। সন্ধ্যা হলেই শহরের ছোকরারা বাঁধ পেরিয়ে নেমে আসে গাঁজার টানে। অবশ্য বউটি ফিরে এলেই হাওয়া হয়ে যায় বাউন্ডুলেরা। তখন চড়াপড় পড়ত গেঁজেলের ওপরে। প্রথম লোকটা শেষে চিৎকার করে বলছিল, ‘আই, যা কিছু ঝামেলা শহরে গিয়ে করবি, এই চরে যেন কোন শব্দ না হয়।’ লোকটার বিশাল চেহারা, একমুখ দাড়ি দেখে ভয় পায় এরা।

তারপর একদিন মেঘ পাক খায় আকাশে। ফিনকি দিয়ে জল ঝরতে থাকে। শ্বিতীয়জনের বউ ছুটে যায় প্রথমজনের কাছে ‘কি হবে, বর্ষা এল যে!’

লোকটা হাত ঘোরায়, ‘যা ভাগ! বৃষ্টি দেখতে দে। ভয় হোঁ এলি কেন?’ এই গায়ে পড়া ভাবটা একদম সহ্য হয় না তার। বউটা দুতিনদিন চেষ্টা করেছিল ভালমন্দ খাবার পাঠিয়ে দিয়ে ভাব জমাতে। যেমন আছে তেমন থাকো, অত গা শোঁকাশোঁকির কি দরকার? গেঁজেলের খন্দের কমেছে। বৃষ্টিতে চরে আসতে ভয় পায় সবাই। বউটা একটু নরম হয়েছে যদিও কিন্তু হঠাৎ জলের ভয় ধরেছে গেঁজেলেরও মনে। কিন্তু নদীটা যেন চিরে গেল হঠাৎ। ওপাশে ছিল পোষা কুকুরের মত, একটা ধারা হঠাৎ এপাশে এসে গেল বর্ষার জল পেয়ে, কিন্তু শ্বভাব হল আদুরে বেড়ালের মত। মাঝখানের চরটা উঁচু হয়ে শক্ত বালি আর দুটো

চালা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগল বেশ । এখনি বেশ সুবিধে হয়েছে বউটার । জলের ধারায় গা ডুবিয়ে স্নান করে । চরের দিকে ফিরে বৃকের কাপড় ছাড়ে । লোকটাকে চোখ বন্ধ করতে হয় । ছুটে গিয়ে শাসায় গের্জেলটাকে, ‘ভালোভাবে যদি এখানে না থাকে তাহলে উড়িয়ে দেব চালা ।’ গের্জেলটা বৃকতে পারে না কিন্তু বউটা ঠোঁট বেকিয়ে বলে ‘চঙ !’

একটা বর্ষা ফরোলেই শূকনো বালি ওড়ে হাওয়ায় আর দুটো রিকশাওয়ালা নেমে আসে চরে । তাদের ডেরা ভেঙ্গেছে নগরপাল । সুন্দর উদ্যান হবে সেখানে । এসে জিজ্ঞাসা করে প্রথমজনকে, ‘এখানে ঘর তুলব ? শহরে থাকার জায়গা নেই ।’

লোকটা মাথা নাড়ে, নিশ্চয়ই ‘নিশ্চয়ই । তবে আমার চালা থেকে তফাতে ।’ আঁটোঁসাটো চালা বানায় তারা । তাই দেখে ভরসা বেড়ে গেল শহরের নড়বড়ে আধ-পেটাদের । তিনমাস না ঘুরতে পনের ঘর বাসিন্দা হয়ে গেল চরের । বালির ওপর বুনো ঘাস গজাচ্ছে, নধর লতানো গাছে চালাগুলো ছেয়ে যায় । আর একটা চালায় রেডিও বাজে সারাক্ষণ । তবে লোকটা ফিরে এলেই তার গলা নেমে যায় । শহরের লোক সকাল বিকেল বাঁধে বেড়াতে এসে বলাবলি করে, সাহস খুব । একটা বর্ষা কোনমতে কেটেছে কিন্তু পরের বর্ষায় নদী ক্ষেপলে দমবন্দ্ব হয়ে মরে যাবে ব্যাটারা । নদীর স্বভাব জানে না এই পরগাছাগুলো ।

কিন্তু একদিন দারোগাবাবু এলেন চারজন পদলিস পেছনে নিয়ে । বাঁধ থেকে বালিতে পা উঠিয়ে চালা অবধি হেঁটে এসে হাঁক দিলেন, ‘এই, তোদের মোড়ল কে ? সদর কোই হ্যায় ?’

গের্জেলটার বউ আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল আলাদা চালাটাকে । দারোগা তার সামনে গিয়ে গর্জন করল, ‘কে আছিস, বোরিয়ে আয় !’

সারাদিন খেটেখুটে লোকটা, তখন সব শূয়েছিল, অবাক হয়ে বোরিয়ে এসে দেখল পদলিস ।

‘তুই এই চরের মোড়ল ?’

লোকটা ঠোঁট নাড়ল । সে মোড়ল হতে যাবে কেন ? সে কারো সাত-পাঁচ থাকে না ।

পেছন থেকে বউটা চোঁচিয়ে উঠল, ‘হ্যাঁ বাবু, ও মোড়ল ।’

‘শোন । এই চর তোমাদের ছাড়তে হবে ।’ দারোগাবাবু হুকুম করলেন ।

‘ছাড়তে হবে ?’ লোকটার চোখ ছোট হল, ‘কেন ? অপরাধটা কি ?’

‘এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামাচুরি বেড়ে গেছে । লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায় । এটা বেআইনি বসতি অতএব উঠে যাও তোমরা । আমি কোন কথা শুনতে চাই না ।’ দারোগাবাবু লাঠি নাচালেন ।

লোকটা মাথা চুলকালো, ‘অভয় দেন তো একটা কথা বলি ।’

‘কি?’

‘আপনার হাতে খারাপ ফোঁড়া হয়েছে।’

‘আমার হাতে?’ দারোগাবাবু হকচাকিয়ে দূরটো হাত ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, ‘কই? নেই তো! ইয়াকি’ হচ্ছে হারামজাদা, শূরার।’

লোকটা হাতজোড় করল, ‘অভয় দিয়েছেন তাই বললাম। হুজুর, খারাপ ফোঁড়ার কথা শুনেই আপনি সেটাকে ডাক্তার দেখাতে গেলেন না। ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ঠিক কিনা? তাই তো?’

‘কি বলতে চাস?’

‘হুজুর, ভাল করে দেখুন, এখানকার কেউ চুরি করে কিনা! সত্যি হলে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দেব।’

দারোগাবাবু হাসলেন, ‘বুদ্ধিমান লোক মনে হচ্ছে। বেশ, ধরতে পারলে আমি সব চালায় আগুন ধরিয়ে দেব, মনে রাখিস।’

দারোগাবাবু চলে গেলে আনন্দিত লোকগুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে, ‘দাদা, তুমি বাঁচালে এ যাত্রা। তোমাকে আমরা সবাই মোড়ল বলে মেনে নিলাম।’

লোকটা হুঙ্কার দিল, ‘ভাগ শালারা! আমাকে একা থাকতে দে।’

লোকগুলো হেসে বলল, ‘দাদার মন সরল, ঠিক সম্ম্যাসীর মত।’

লোকটা চেঁচালো, ‘দারোগা কি বলে গেল সবাই নিশ্চয় শুনেছ। চোরছ্যাঁচোর এখানে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।’

লোকগুলো হেসে উঠল, তারপর ফিরে গেল যে ঘর ডেরায়। এই সময় একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এল হেলতে দুলতে। তার শরীর ভারী এবং চোখ চড়ুই পাখির মত উড়ছে বসছে। এসে বলল, ‘চুরি-চামারি মানে কি?’

লোকটা নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে তাকাল, ‘এটা আবার কে?’

স্বিতীয়জনের বউ এগিয়ে এল পাশে, ‘আমার বোন। এখন থেকে এখানে থাকবে।

‘অ। তা বোনকে চুরির মানে শিখিয়ে দাও।’

‘আহা, তুমিই বল না শূনি। হুকুম করলে, চোর ছ্যাঁচোর থাকতে পারবে না। তা চুরি করা কাকে বলে সেটা বলে দাও।’ মেয়েটি চোখ ঘোরাল।

‘অন্যের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হয়।’ লোকটি ভেবেচিন্তে জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর মনে হাত চাপা দিয়ে বলল, ‘কেউ যদি জিনিসটা হারিয়ে ফেলে আর একজন যদি তা চুক করে তুলে নেয়?’

‘সেটাও চুরি বলে।’ লোকটা গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

‘তাই?’ চোখ ঘোরাল মেয়েটি। ‘তাহলে তো চোর ধরতে যেতে হয়।’

‘মানে?’

‘আমার একটা জিনিস যে চুরি গেছে।’

‘কি জিনিস?’

আঙ্গুল তুলে ধীরে ধীরে বৃকের ওপর রাখল মেয়েটা। রেখে হেসে উঠল উচ্চস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে তার বোন আঁতকে উঠল, ‘ওমা, কখন?’

‘ওই যে যখন দারোগার সঙ্গে কথা বলছিল। কি চমৎকার কথা বলে, না দিদি?’

লোকটা আর অপেক্ষা করল না। চালায় মাথা নামাবার আগে চিৎকার করল, ‘ওসব ছেনালি কথাবার্তা আমার কাছে বলে সর্বাধিক হবে না। আমি মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াই না।’

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারাটাকে তুলে নিল হাওয়া, সমস্ত চরময় ছাড়িয়ে দিল যেন।

*

*

*

নদীর বৃকে বালি জমে যাওয়ায় খালটার অবস্থা কাহিল। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে খালটা বয়ে যেতো। জল গিয়ে পড়তো নদীর বৃকে। সেই মহাপ্রলয়ের সময় খালটাকেও সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেছিল নদী। নিজের জল উজিয়ে দিয়েছিল খালের বৃকে। শহরের মানুষ সে রাস্তাও বন্ধ করেছে বাঁধ বেঁধে। ঠুটো জগন্নাথ হয়ে গেছে লম্বা খালটা। একটু একটু করে মজে গেছে জল তলার শ্যাওলারা পর্যন্ত অথর্শী এখন। গেল বিজয়ার ভাসান পর্যন্ত নৌকোয় চেপে হয়নি খালের বৃকে। একটা মরা আঁশটে গন্ধ ছড়ায় খালটা সারাদিন। শহরের মাতব্বররা বলল, এভাবে খালটাকে মেরে ফেলা ঠিক নয়। বেশ টলটলে জল থাকবে, নৌকো চলবে। হাউসবোট ভাসালে লোকে বেড়াতে আসবে এখানে, শহরটারও ইজ্জত বাড়বে। নানারকম ফন্দিফাঁকির চলতে লাগল খাল-উন্নয়নের জন্যে কিন্তু কোন রাস্তা বের হয় না। খালের সামান্য ঘোলাটে জল বাঁধের গায়ে মৃখ গর্জে পড়ে থাকে। বাঁধের ওপাশে বালির চর। তার বহুদূরে নদীর ধারাটি বয়ে যায়। আগের মত খাল তার বৃকে মৃখ ডোবাতে পারে না। এমন কি তার শরীরের মাছগুলো গত গ্রীষ্মে পেট উজ্জে ভেসে উঠেছে। এখন চওড়া খালের ওপারের সুন্দর সেতুগুলোকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়।

তবে এটা ঠিক, খালটা শহরের লোকের কাছে নদীর তুলনায় অনেক আপন। এটা যদি সম্পূর্ণ বৃজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হাজার হাজার টাকায় কীটা কিনে বাড়ি বানাবার লোকের অভাব হবে না। বোধহয় তাই এই খালের গায়ে কোন চালাঘর তুলতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। আবর্জনা বাড়তে দেওয়া চলবে না। বাস করতে চাও চলে যাও নদীর চরে। সেখানে তোমার কি হল তাতে কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব নেই। তবু শহরের মানুষ অবাক হয়ে দ্যাখে নদীর চরের মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বেশ গাছগাছালি লাগানো শূরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঘরদোরের গঠনও পাটোচ্ছে। বেশ শোখন আর মজবুত চেহারা মেছে সেগুলো। রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, দিনমজুর আর ঠিকে ঝিদের চমৎকার পাড়া হয়ে গিয়েছে ওটা। বর্ষা যখন এদিকে একটা ধারা গজিয়ে যায় তখন ভেলা করে পারাপার করে ওরা। সুন্দর

হাওয়া বয় সারাদিন ওখানে। চাষবাসের একটা চেষ্টা শব্দ হলে গিয়েছে এর মধ্যে।
রাতে কাছে পিঠে শেয়াল ডাকে না। শহরের কিছুর বাউঁড়ুলে ছেলে চলে যায়
ওখানে। লুকিয়ে গাঁজা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওরা। এই ঝামেলা
লেগেই আছে। আর গেল বয়স খালটা জলে ভরে গিয়েছিল। সেই জল স্থির হয়ে
থেকে একটা পচা গন্ধ আরও তীব্র হয়ে শহরে ছড়াচ্ছে। অসুখ বিসুখ হচ্ছে
মানুষের। খালের জল ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন
এবার খালটাকে বৃজিয়েই ফেলবেন। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার যে পরিকল্পনা
ছিল অর্থাভাবে বাতিল করে দিয়ে মোটা দামে জমি বিক্রী করে আর পাঁচটা ভালো
কাজ করা যাবে।

*

*

*

সন্ধ্যা নাগাদ চরে ফিরে এল লোকটা একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে। চমৎকার
নাদুস-নুদুস কাৎলা মাছ। এসে ঝাঁপ খুলে ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলল,
‘যা খুব ভুল হয়ে গেল। লোভে লোভে কিনে ফেললাম এখন কাটবে কে?’

‘চিন্তা কি, কেটে দেব, রেঁধে দেব, খাইয়েও দিতে পারি।’

‘কে?’ চমকে উঠল লোকটা। ঘরটায় এখন আঁধার ‘এই ঘরে কে?’

লোকটার হাঁকডাকের উত্তরে একটা ছোট্ট হাসি বাজল, ‘পেঙ্গী! চরের পেঙ্গী!’

দ্রুত হাতে কুপী জ্বালালো লোকটা। তারপর সেটাকে উঁচু করে লোক খুঁজল।
আলো পড়তে বৃকে আঁচল টানলো মেয়েটা, ‘আঃ লজ্জা লাগে না। ব্যাটাছেলের
চোখ না তো করাতের দাঁত। নামাও ওটাকে।’

বাজ পড়ল ঘরে ‘অ্যাঁই এখানে কি চাই? চুরি করার মতলব?’

‘চুরি!’ হাসল মেয়েটা, ‘ডাকাতের ঘরে চুরি? লোকে হাততালি দেবে।’

‘মানে? আমি ডাকাত?’

‘নিশ্চয়ই। আমার মন ডাকাতি করেছ গো।’ তারপর সদর ধরলো, ‘ও যে
দিন-দুপুরে চুরি করে রাতিরে তো কথা নাই।’ শব্দে শব্দে পা নাচালো, ‘কি মাছ
গো?’

লোকটি তখন তার বিশাল চোখেরা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না নিচু
ছাদের জন্যে। ঘাড় নামিয়ে তবু ছুটে এল পাশে, ‘অ্যাঁই, ওঠ, বেরো এখান থেকে যা
চলে যা।’

‘কোথায় যাবো?’

‘কেন তোর দাঁদির ঘর নেই। সেখানে গিয়ে জামাইবাবুর গাঁজা সাজ।’

‘ওই জন্যে তো পালিয়ে এলাম ষত রাজ্যের বাবু ছোকাগলো দিনরাত সেখানে
জাঁকিয়ে বসে থাকে। আমি গেলেই ড্যাবডেবিয়ে তাকাবে। বৃকের আঁচল ফেলে যে
শোব তার উপায় নেই। রাস্কসগুলোর মধ্যে আমি ঝুঁকতে পারি? তুমি বল?’ ঠোঁট
ফোলালো মেয়েটি।

‘কেন তোর দাঁদি কোথায়? সে মাগীর তো বড় মদুখ!’

‘অ, দিদির কথা আর বলো না। সে তো এখন জামাই-এর দোসর হয়েছে। গাঁজা খেতে এসে ছোকাগলুলো ভাল টাকা দেয় বলে রসের কথা বলে। দিদির এখন গতির খাটিয়ে ঝি-গিরি করতে বয়েই গেছে। ছিলিমে টান দিচ্ছে আর এর ওর সঙ্গে রস করছে। ওর মনে খুব দঃখ।’

‘দঃখ ? দঃখ কেন ?’

‘বাঃ, দঃখ হবে না ? তোমার দিকে নাকি প্রথমে ঝুঁকিছিল। তখন এই চরে তোমরা দুইঘর ছাড়া নাকি মানদুঃ ছিল না। তা তুমি পান্তা দাও নি।’

‘পান্তা দেব কেন ? সে অন্যের বউ না ?’

‘তাই তো। তবে কাঁচ তো আর ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তার জন্যে হিরে চাই।’ বলে খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েটি।

‘তা আমি কি করব এসব শুনো। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাও, আমায় একা থাকতে দাও।’ লোকটার গলার স্বর ভাঙছিল।

‘বাঃ, তুমি জানো না তো কে জানবে ? তুমি এখানকার মোড়ল।’

‘না, আমি কেউ নই। একা থাকতে চলে এলাম তাও সব ভিড় জমালো।’

‘তাহলে ওরা ঠিকই বলে।’

‘কি বলে ?’

‘তুমি পদ্রুদ্রমানদুঃ নও। তাই লুকিয়ে থাকতে চাও।’

‘কে বলে ?’ গর্জ উঠল লোকটা।

‘ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমি বলি কি, আজকের রাতটা এখানেই থাকি।’

‘না, কক্ষনো না।’

তোমার পায়ে পড়ি চোঁচিয়ে ওদের জানিও না। তাহলে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে আমাকে। কাল সূর্য উঠলে আমি চলে যাব।’

‘কোথায় ?’

‘যেখানে দঃখ চাখ যায় ! মেয়েছেলের শরীরে যৌবন থাকলে ঠিকানার অভাব হয় না। এখন মাছটা কাটবো ?’

‘মাছ ?’

‘ওই যে পড়ে আছে। দেখি দেখি ভাল করে আলো ফেলো তো।’ এমা, এ যে পোয়াতি মাছ। ব্যাটাছেলেদের কাটতে নেই।’

‘পোয়াতি ?’

‘হ্যাঁ, দেখছ না পেট ভরতি ডিম ?’

লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সত্যি মাছটার পেট বেশ ফোলা। কোনরকমে বলল, ‘ঠিক আছে।’ সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে কুপির আলো নিবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা, ‘তুমি কেমন পদ্রুদ্র দেখছ আমি ?’

ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চাইল লোকটা। কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরে মেয়েটা চাপা গলায় হিসহিস করল, ‘ওরকম করলেই চোঁচাবো। বলব তুমি আমার ইজ্জত

নিয়েছ !'

‘আমি ?’ লোকটার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ।

‘হুম্ । লোকে দেখবে আমার শরীরে কাপড় নেই । দ্যাখো না, দ্যাখো । মিথ্যে বলছি না ।’

*

*

*

মাকরাভিরে লোকটার মনে হল মেয়েরা হল নদীর মত । শূন্যে থাকলে মরা চর আর ঢল নামলেই কালনাগিনীর মত হিংস্র, যতক্ষণ না গিয়ে গিলছে ততক্ষণ শান্ত হয় না । এই যে মেয়েটা এখন তার শরীরের ওপর হেলান দিয়ে কি আরামেই না ঘুমাচ্ছে । দৃঢ়দুব্বার সে ঝড় তুলেছে তবে এই শান্তি । অবশ্য সুন্দর করে মাছ রেঁধেছিল, তাই দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া গেছে । বেশ সুখী সুখী লাগছে আজ । ঘরে মেয়েছেলে থাকলেই হবে না, সেই মেয়েছেলেকে সুখ দিতে জানতে হবে তবেই পৃথিবীটাকে অন্যরকম লাগবে । তবে এ মেয়ে নিষাৎ ভাল মেয়ে নয় । নিশ্চয়ই অনেক ঘাট ঘুরেছে এর মধ্যে, নইলে এতো ছলাকলা শিখলো কি করে ? যদি ভাবো খারাপ তো খারাপ, নইলে নয় । ওই নদীর কথাটাই ফিরে আসে । এ ঘাটে ছলাৎ ও ঘাটে ছলাৎ, কেউ করল স্নান কেউ কাচলো কাপড় কিন্তু পরের ঘাটে নদী আবার নতুন । লোকটা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ । ঘুম ভেঙে হাঁসফাঁস করল মেয়েটি অক্ষুণ্ণ আওয়াজ বেরুল, ‘কি হল ?’

লোকটা বলল, ‘বাঁধ দিলাম, বেঁধে নিলাম ।’

মেয়েটি হেসে ফেলল অস্বস্তিতে, ‘ওমা, আমি কি নদী ?’

লোকটি বলল, ‘তাই ।’

*

*

*

রোদ উঠলে চরে শূন্য হল হইচই । মেয়েটির বোন আর গেঁজেলটা এল তেড়ে । চেঁচিয়ে লোক জড়টিয়ে আনল, ‘সোমথ মেয়েকে নিয়ে শূন্যে সারারাত, বিচার চাই ।’

লোকজন উত্তেজিত হল । মেয়েটার জন্যে যাদের জিভে লাল জমতো তারা বলল বেশী । থানায় যাও, পদলিস ডাকো । একি কেলেঙ্কারি ! যাকে মোড়ল ভাবা হয় সে-ই কিনা এই পাপ করল ! লোকটা মেয়েটার দিকে তাকাল, ‘কি বলছে সবাই, শূন্যেছিস !’

মেয়েটা শরীর মোচড়ালো, ‘তুমি শোন, ঘুম পাচ্ছে আমার ।’

মেয়েটার বোন তাতে ভোলে না । তার ঢাকা চাই । ক্ষতিপূরণ করতে হবে । খাইয়েছে পরিয়েছে যাকে, তাকে বেইজ্তত করেছে । লোকটা বলল, ‘আমার ঢাকা নেই ।’

এরা নাছোড়বান্দা । কাজে যাওয়া হল না লোকটার দৃশ্যে ঢাকা চাই । নগদ । এক পয়সা কম নয় । লোকটা মাথা নাড়ে, অসম্ভব । দৃঢ়দুব্বার নাগাদ ঘুমিয়ে টুনিয়ে মেয়েটা বোরিয়ে এল চালা থেকে, ‘দিয়ে দাও দৃশ্যে ।’

মেয়েটা বলল, 'তা বললে চলে। ঠিক আছে, আমি দাঁদির কাছে রইলাম, তুমি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো আমাকে।' গতর দু'লিয়ে সে চলে গেল বোনের সঙ্গে। লোকটার সামনে শুলেছিল একটা নেড়ি, প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সেটা চর ফাটাতে লাগল চিংকারে। কি করা যায় বুঝতে পারছিল না লোকটা। ভিড় এখন পাতলা। রেডিও বাজছে কোন এক চালায়। গের্জেলের ঘরে মেয়েটা সৈঁধিয়েছে বোনের হাত ধরে। সেখানে জমেছে শহরের ছোকরাগুলো। লোকটা ছটফট করছিল। টাকা তার আছে। সবসাকুল্যে আড়াইশো টাকা। তার নিজের চালার তলায় বালি খুঁড়ে এক হাত গেলে টিনের কোটোয়। কিন্তু সে টাকা জমিয়েছে আপদ-বিপদের জন্য। দূরের চালাগুলোর দিকে তাকাল সে। বেশ সংসারী সংসারী চেহারা। ওপাশের ধুধু-চর বলকাছে এখন। বুদ্ধের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। চালায় ঢুকতেই মোচড় দিল মন। এরকমটা কখনও হয়নি। কালকের রাতটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি তবু খিদে পাচ্ছে না। বিছানার দিকে তাকাতেই কণ্টটা বেড়ে গেল। মেয়েমানুষের শরীর, তার ব্যবহার, দুটো কথাবার্তার টোকা আর রান্নার স্বাদ শালা পাইখনের মত। একবার গিললে আর ছাড়ে না। দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে কোটোটা বের করল সে।

গের্জেলটার চালার দরজা সরিয়ে উঁকি মারতেই মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। বাপরে বাপ! গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর এখন ভাসছে। ওকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। পা ছাড়িয়ে সে শুলেছিল বোনের পাশে। সেই পায়ে হাত বোলাচ্ছে শহুরে ছোকরা। লোকটা চেঁচালো, 'উঠে আয়।' তারপর ছুঁড়ে দিল টাকাগুলো। বোনটা দ্রুত হাতে কুড়িয়ে নিয়ে গুণে বলল, 'দুশো।' তড়াক করে বেরিয়ে এল মেয়েটা, 'তবে যে বললে টাকা নেই? মরণ! এই নাহলে পুরুষ!'

*

*

*

মাস তিনেক বাদে এক সকালে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। অবাক হয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?' মেয়েটা পা ছাড়িয়ে বসল, 'কি হবে আমার। পেটে একজন এসে গেল সাত তাড়াতাড়ি।'

লোকটা হেসে বলল, 'এই কথা।'

'হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কি দিয়ে? কটা টাকা কামাও? আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দিকি।' মেয়েটা চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে

লোকটার জিভ শুকিয়ে এল। শহরে মাংসের দাম অনেক। মালি বয়ে যা পায় তাতে দুবেলা ভাত আর সেন্ধ জোটে। তবু কোনরকমে একজনের জন্যে মাংস নিয়ে এল বিকেলবেলায়। চেটেপুটে খেয়ে নিল মেয়েটা। খেয়ে বলল, 'আমি খাচ্ছি না পেটেরটা খেল। কাল একটু ইলিশ এনো।'

লোকটা বলল, 'টাকা নেই। অত নোলা কেন?'

মেয়েটা বলল, 'পুরুষমানুষ তো বাচ্চা ধরে না, বুঝবে কি।' লোকটা গোঁজ হয়ে রইল।

দুর্দিন বাদে মেয়েটা বলল, ‘দিদির যে কাজ ছিল শহরে তা আমার নিতে বলল। ভালই হবে, দুটো পরসা পাবো।’

লোকটা বলল, ‘খবরদার, তুই শহরে যাবি না।’

‘কেন, গেলে কি আমাকে খেয়ে ফেলবে? পেটে বাচ্চা আছে না?’ মেয়েটা রুদ্ধে দাঁড়াল। লোকটা ভাবল, তা বটে। রক্ষা কবচ তো পেটে বাঁধা। ভয় কি।

দুর্দিন বাদে বেশ রগরগে ইলিশ রাখলো মেয়েটা। লোকটার পাতে ধরে দিয়ে বলল, ‘পেটি খাও।’ লোকটা অবাক গলায় বলল, ‘পেলি কোথায়? এর তো বহুত দাম।’ মেয়েটা হাসল, যে বাড়িতে কাজ করি তার বাবু দিয়েছে। ‘বাজার থেকে আসছিল, পথে দেখা হতে হেসে বললাম, ‘কতকাল খাইনি। বাবু গলে গিয়ে দিয়ে দিল।’

মাথায় আগুন চড়ে গেল লোকটার, ‘খবরদার, ও বাড়িতে আর ঢুকবি না।’

মেয়েটা বলল, ‘কেন?’

‘ও তোর সর্বনাশ করবে।’ লোকটা গর্জালো।

‘মাথা খারাপ তোমার। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কাল সন্দেশ আনবো।’

‘কোথেকে?’

‘আর একটা বাবু দেবে বলেছে।’

লোকটা আর পারল না। লাথি মারল ইলিশ মাছে। তারপর চিৎকার করে বলল, ‘ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সৈম্ভভাতে সুখ হবে কিনা বল?’

মর্তিত দেখে কঁকড়ে গেল মেয়েটা। ভয়ে ভয়ে বলল, ‘হবে।’

লোকটা চেঁচালো, ‘শহরে কেউ তোর গায়ে হাত দিয়েছে?’

মেয়েটা সভয়ে মাথা নাড়ল ‘না।’

দুর্দিন বাদে মেয়েটা আবার উসখুস করল। লোকটা বলল, ‘কি চাই?’

‘আচার। আমের।’

‘এই চরে ওসব পাওয়া যায় না। আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করিস কেন? দিদির কাছে গিয়ে চাইতে পারিস না?’ লোকটা মৃদু ফেরালো।

‘দিদির কাছে চাইলে তোমার মানে লাগবে না?’

‘এক কথা? বোন দিদির কাছে চাইলে আমার মান যাবে কেন?’

তিনদিন বাদে এক বোতল বড় আচার এল। লোকটা বলল, ‘বাবাঃ, এত কে দিল?’ মেয়েটা লাজুক হাসল, ‘খেয়ে দ্যাখো।’

‘কে দিল? তোর দিদি?’

‘না, দিদির খদ্দের। ওই যে শহরের লোকটা যে গুলি খেতে আসে। আমার ইচ্ছের কথা শুনে শহর থেকে এনে দিল।’

‘এমনি এমনি কেউ দেয়? কি করেছিল ও?’

‘কিছু না। শুধু বলিছিল তোমার মিষ্টি হাতে গাঁজা সাজিয়ে দাও,

দিয়েছিলাম।’

আগুন হল লোকটা, ‘খবরদার, আর ও ঘরে ঘাবি না। হাত কেটে ফেলব।’

অনেক রাত্তিরে মেয়েটা আদর খেতে খেতে বলল, ‘তবে যে তুমি বল আমি নদীর মত তাহলে এত অবিশ্বাস কর কেন?’

লোকটা সরল গলায় বলল, ‘নদীর মত হারামি আর কেউ নেই।’

*

*

*

এবার বর্ষার রোয়াব যেন বেড়ে গেল দশগুণ। ভেলায় চেপে পারাপার শুরুর হল চর থেকে। শহরের ভেতর যে খাল সেটা হয়ে গেল টাইটুম্বদর। সাত দিনেও বৃষ্টি থামে না। বৃষ্টির জল জমছে শহরের রাস্তায়। খালের জল উপচে উঠল দূপাশের শহরে। জলটা বাড়ছেই কারণ বেরিয়ে যাওয়ার মদুখ বন্ধ। সেখানে বাঁধ আছে নদীকে আগলাতে। খবর এল পাহাড়ে জম্বর জল ঝরছে। সব ঝোরা এসে লাফিয়ে পড়ছে নদীতে। পল্লিস হেঁকে বলে গেল, চরের লোক পালাও নইলে এবার ডুববে। পড়ি কি মরি করে পালানো শুরুর হল। যা কিছু শখের তাই নিয়ে লোকজন উঠল বাঁধে। প্রসববেদনা সামলে মেয়েটা বলল, ‘পালাবে না?’

লোকটা মাথা নাড়ল, ‘না।’ মেয়েটা আঁতকে উঠল ‘জল আসছে, ভাসাবে সব।’

‘আসুক আগে। অত মানুষের দঙ্গল আমার ভাল লাগে না।’ বলে মেয়েটির ক্ষীণ উদরে হাত বুলিয়ে দিল, ‘এখানেই বাচ্চাটা হোক। এই নিরিবিলিতে।’

‘তুমি কি পাগল? যেটা আসছে তার কথা ভাবো।’ মেয়েটা কঁকিয়ে উঠল।

‘ভাবনার কিছু নেই।’

মেয়েটা অসহায় চোখে তাকাল। এখন এই লোকটার ওপর নির্ভরতা এত বেড়েছে যে একা চলে যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। সে দৃহাতে লোকটাকে জড়িয়ে কণ্ঠ সামলালো।

নদীর বৃকে ঢল নেমেছিল পাহাড়ের নিচে। সেটা গড়িয়ে আসতে দৃদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। চরের বালি এত উঁচু যে সোজা আসতে পারছে না। ফলে জলের ধারা মাঠ ভাসিয়ে পাকা রাস্তাটাকে বেছে নিল খাত হিসেবে। যেহেতু নদীর বিপরীত দিকে তাই ওই অংশে বাঁধ গড়া হয়নি। নিচু জমি পেয়ে ছুটে যাচ্ছিল জল। বৃষ্টি থামছিল না। ময়লা ন্যাতার মত চপচপে আকাশটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছিল। নদীর জল সেই মদত পেয়ে ঢুকে গেল খালে। টাইটুম্বদর খালটা বহুদিন পরে নদীর স্পর্শ পেয়ে ছটকে উঠল আকাশে। আর তখনই ডুবে গেল শহরটা। উল্টো দিক থেকে জল ঢুকছে কিন্তু বেরোবার পথ বাঁধের জন্যে বন্ধ। সমস্ত শহরের লোক যে যেভাবে পারে ছুটে এল বাঁধের ওপর প্রাণ বাঁচাতে। জলটা পাকছে শহরে। একতলা বাড়িগুলো গেল তলিয়ে। মানুষ আর জন্তুর মৃত্যুদেহ ভাসতে লাগল সেই ঢেউয়ে। অতবড় শহরটা অতিকায় হৃদ-এর চোখে নিয়ে নিল এবার। বাঁধগুলো তার দেওয়াল।

বাঁধে আর মানুষ ধরে না। হঠাৎ ওদের নজর পড়ল চরটার দিকে। বিশাল

নদীর চর শুকনো পড়ে রয়েছে। নিজের জমা করা বালি ঠেলে নদীর জল এদিকে আসতে পারেনি। কিছু লোক নেমে এল চরে। এসে হাত পা ছাড়িয়ে বলল ‘কি আরাম!’

তাদের আরাম দেখে অন্যরা উৎসাহিত হল। মদুহুতেই বাঁধের সংকীর্ণ জায়গা ছেড়ে শহরের সব মানুষ পিল পিল করে নেমে এল চরে। বাতিল চালার মালিকরা অসহায় চোখে দেখছিলেন তাদের চালাগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে। শেষ পৰ্যন্ত তারাও মিশে গেল শহরের লোকদের মধ্যে। এই মদুহুতে পোশাকে আচরণে ওদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

লোকটা এক হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে দেখছিলেন এই জনস্রোত। এখন তার চারপাশে শুধু মানুষের মদুখ। সে চাপা গলায় বলল, ‘শালা!’

মেয়েটা বলল ‘ওরা যে শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এল।’

লোকটা দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে টাকা বের করে বলল, ‘চল।’

‘কোথায়?’ মেয়েটা ভরে ভরে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা কোন উত্তর দিল না। মেয়েটাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বাঁধের ওপরে। তখন শহরের কোন মানুষ বাঁধে নেই। এমনকি চরের লোকেরাও এখন সেখানে। লোকটা দেখল শহরটা এখন বিশাল হৃদ, জল ফুঁসছে। আর চরটা যেন আচমকা শহর হয়ে গিয়েছে। রাত ঘনালে চরে আলো জ্বলে উঠল। লক্ষ লক্ষ হায়নার চোখের মত জ্বলতে লাগল চরটা। আর শহরটা গভীর জঙ্গলের মত অন্ধকারে মাখামাখি। মেয়েটার যন্ত্রণা বাড়ছিল। শেষে চিৎকার করে উঠল, ‘ও, মাগো!’

লোকটা তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। এবার কণ্ঠ মদুছিয়ে দেবার গলায় বলল, ‘বিয়ো, খুশী মনে বিয়ো।’ মেয়েটার কানে সে কথা ঢুকল না। কাটা ছাগলের মত ছটফট করছিল সে। ওলট-পালট হওয়া শহর আর নদীর শব্দ শুনতে শুনতে গালে হাত দিয়ে লোকটা বিহবল গলায় বলল, ‘এখানে কেউ নেই, এই বেলা সেরে নে।’

চাষযোগ্য ভূমির বড়ই অভাব এই গ্রামে। সেই কবে পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে মাটি নিজেদের জন্য চিহ্নিত করে গিয়েছিল তার বেশী খুব একটা বাড়েনি। এক পুরুষ আগেও জঙ্গল কাটা যেত, জমির শরীর বাড়ানো যেত সুবিধে পেলে। এখন সরকার সেটাও বন্ধ করেছেন। তাছাড়া এই পাহাড়ের মাটিতে এত পাথর যে চাষ সহজ নয়। অনেক খাঁ খাঁ প্রান্তরে দিনরাত হাওয়ারা খেলা করে। বিনি পয়সায় সেই জমি দিলেও কেউ মুখ ফেরাবে না। অতএব যেটুকু চাষযোগ্য জমি তার ওপরে মায়া প্রতিটি পরিবারের, সারা বছরের পেট ভরার যা অবলম্বন। কিন্তু তাই বা ভরে কই? দিন দিন নতুন মানুষ আসছে সংসারে। তাদের পেটের জায়গা বাড়ছে। অথচ জমি বাড়ছে না এক ফোঁটাও।

এই গ্রামের মানুষেরা শহরে যায় না, খেতে চায় না। বড় শহর নয়, মোটামুটি গঞ্জ এলাকা বলতে মানেভঙ্গন, তাও আট ঘণ্টার হাঁটাপথ। সেখানে গেলে যে কাজকর্ম পাওয়া যায় না তা নয়। মাল বইবার লোক দরকার হয় ব্যবসায়ীদের। হাতে নগদ পয়সা আসে। কিন্তু তা নিয়েও ঝামেলা আছে। আরও দশবিঘটা গ্রামের মানুষ সেই একই ধান্দায় হাজির হয় সেখানে। এর ওপর আছে খোদ মানেভঙ্গনের বেকাররা। ওরা তাদের ভাল চোখে দেখে না। ফলে দিন দিন কাজ কমে যাচ্ছে দ্রুত। আরও দূরে যে শহর দার্জিলিং সেখানে নাকি খুব বড় বড় মানুষ থাকে, এই গ্রামের মানুষ অত দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আশেপাশের জঙ্গলে আছে প্রচুর কাঠ। মেয়েরা তাই চুপিসারে নিয়ে আসে ভোজালি চালিয়ে। এখন বৃক ফুলিয়ে কাঠ কাটার দিন নেই। মাঝে মাঝেই ফরেস্ট গার্ডরা টহল মারে। তবু কাঠ আসে গ্রামে। শীতকালে যখন হুহু বাতাস করাত চালায় তখন ওই কাঠ প্রাণ বাঁচায়। দুটো মাস তো সাদা হয়ে যায় গ্রামটা বরফে। জমির মুখ দেখা তো দূরের কথা, গাছের পাতাও চেনা মূর্শকিল হয়ে পড়ে। তখন যার উনুনে আগুন জ্বলে তার মত ভাগ্যবান আর কে এই তল্লাটে ওই জঙ্গলে এককালে জানোয়ারগুলোকে পাওয়া যেত। খিদে পেলে তীর হুড়ে তাদের কাঁধে তুলে আনা যেত অনায়াসে। এখন জঙ্গলটাও খাঁ খাঁ করে। তার ওপর আছে ওই ফরেস্ট গার্ড। সবসময় শাসিয়ে যায়, খবরদার, বনের পক্ষ দিয়ে কেউ হাত দেবে না। সব সরকারী মাল।

জঙ্গল সরকারী মাল, জঙ্গলের পশুও সরকারী মাল, তাহলে জঙ্গলের মানুষ কেন সরকারী মাল হিসেবে ঘোষিত হবে না? এই সরল সত্যটি কেন ওদের মাথায় ঢেকে না? তাহলে ওদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়ত ফরেস্ট গার্ডদের ওপর।

সারা বছর ওই চাষের জমি আর কতটুকু খাবার যোগান দিতে পারে? কম্বলটা সমস্ত শরীরে জড়িয়েও কাঁপুনি যাচ্ছিল না মানে লেপচার। বাতাসের দাঁত গজিয়েছে এর মধ্যেই। গাছের পাতাগুলো লাল থেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শেষ ফসল কাটা হয়ে গেছে প্রত্যেকের। এখন জমি খাঁ খাঁ করছে। কদিন বাদেই সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যাবে চৌদিক। মানে তাদের জমিটাকে দেখাচ্ছিল। এই জমি তাদের পরিবারের পনের জনের পেট ভরায় কোনরকমে।

আগামী বরফে পনের বছর পূর্ণ হয়ে যোলে পা দেবে মানে। বংশের ধারা অনুযায়ী চেহারা হয়নি, বেশ ছিপিছিপি এবং লম্বাটে, মূখের চামড়া মোমের মত মোলায়েম। দাড়ি দূরের কথা ফিনফিনে লোমও উঁকি মারেনি নাকের তলায়। চোখের পাতায় সুন্দর ভাঁজ আছে যা কিনা এই গ্রামের আর কারো নেই। মানে একবার পেছন ফিরে তাকাল। গ্রামের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানেই তাদের বাড়ি। আর ওই বাড়িতেই আজ দুপুর থেকে চলছে ব্যাপারটা। জ্বরদন্ত আলোচনা। থুত্ন শব্দ তুলে থুত্ন ফেলল সে। তারপর দূরের সান্দাকফু পাহাড়ের দিকে তাকাল। অন্তত দশবার গিয়েছে সে সান্দাকফু। কোন মজা নেই, শুধু সাদা সাদা পাহাড়গুলোকে দেখতে পাওয়া ছাড়া। তা সেই দেখতে আসে কাঁহা কাঁহা থেকে মানুষজন। হেঁটে সান্দাকফুতে পৌঁছে এমন ভাব করে যেন রাজ্য জয় করে এল। এই গ্রামের পাশ দিয়েই উঠতে হয় ওদের। ওসব দৃশ্য দেখা বেশ মজার। এক হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে চড়াই ভেঙ্গে, ফোঁস ফোঁস করে জিজ্ঞাসা করে, “কিতনা দূর?” তা এইরকম একটা দল তাকে নগদ বিশ টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তিন হুগা আগে। চারজনের দলের সঙ্গে কোন কুলি ছিল না। কাঁধের ব্যাগটা এত ওজনদার হয়েছিল যে সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানে। এমন কিছুই না। লোকগুলো কতরকম খাবার খেয়েছিল পথে, ভাগ পেয়েছিল সে। জীবনে কখনও ওইরকম খাবার জিভে পড়নি তার। তারপর থেকে একটা নেশা হয়ে গেছে মানের। এই ঢালু জায়গাটার এসে বসে থাকে সে। আবার যদি কোন বাঙালি বাবুর জিভ বেরিয়ে আসে তাহলে পকেটে কাগজ আসবে! কাগজের বন্ড দাম এই গ্রামে।

মানে উঠল। ওপরে যাওয়ার শৌখিন বাবুদের আজ আর পাওয়া যাবে না। ঠান্ডা বাড়ছে হু-হু করে। আলো কমছে। সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে যা সিঁধান্ত নেবার নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিঁধান্ত দুটো, হুগা বড়াভাবী বেরিয়ে যাবে, নয় থাকবে। রিম্বিক থেকে বড়াভাবী বাপ আর ভাইও এসেছে। জোর ব্যাপার।

মানে চোখ বন্ধ করে বড়া ভাই-এর মূখ মনে করলে চেষ্টা করল। দুকুড়ি দশ বছর বয়স ছিল লোকটার। সবসময় হাসতো। পরিবারের কর্তা হিসেবে সব দায় নিজের কাঁধে নিত। দুঃখ পেলেও হাসিটা ছিল মূখে। মানের যখন তিন বছর বয়স তখন বাপ মারা যান। মা গিয়েছিল জন্ম দিয়েই। বড় ভাই তার

বাপ হয়ে গেল। বড়া ভাই-এর বাচ্চা নেই, বড়াভাবী তার মা হল না কিন্তু। তার জন্যে ছিল মরা বাপের মা। তার কাছেই পরিবারের সব বাচ্চাদের থাকতে হত। সে বড়িও চোখ বন্ধেছে বছর তিনেক। বড়া ভাই ছিল মাটির মানুষ। লেপচাদের কথা খুব ভাবত সে। লেপচারার সংখ্যার দিন দিন কমে যাচ্ছে, বেশির ভাগই সাহেবদের ধর্ম নিয়ে নিয়েছে। বড়া ভাই-এর এসব ব্যাপার একদম পছন্দ ছিল না। প্রায়ই তাদের কাছে ওই খারাপ লাগার কথা বলত। বলত, আমাদের পরিবারের যেন কোন ভাঙ্গন না দেখা দেয়। ওই জমি আমাদের পনের জনের রক্তের মতন। ওই জমি আমাদের মা, আমাদের একই সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

কিন্তু বড়াভাবী একদম মান্য করত না বড়া-ভাইকে। সারাদিন ঝগড়াই লেগে থাকত। বড়ি দাদি গজ গজ করত, একটা বাচ্চা পেটে দিতে পারলেই নাকি ঝগড়া থেমে যাবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে ভগবান আছে সে নিজের কাজকর্ম ভাল করে বোঝে না। তাছাড়া বড়াভাবীর গায়ে নানান দুর্নামের গন্ধ লাগতে শুরু করেছিল। এই গ্রামের নিম্নম হল কোন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে লটঘট করলে কড়া শাস্তি হবে। কিন্তু অভিযোগ তুলতে হবে সেই মেয়ের স্বামীকে। বড়াভাই সব জেনেও চুপ করে বসে থাকত। তারপর হঠাৎ এই সেদিন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল বড়াভাই-এর। আর দুদিনেই শরীর স্থির। সারা গ্রামের মানুষ বলেছিল, এরকম লোক আর জন্মাবে না।

কিন্তু তাতে কার কি লাভ হল? বড়াভাবী এবার চলে যাবে রিম্বিকে। যাওয়ার সময় পনের ভাগের দুভাগ জমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার আর বড়াভাই-এর অংশ। ওই জমি চলে গেলে পেটে হাত পড়বে সবার। জমি যদি ছেড়ে দিতে না চায় তো পরিবারের বাকি লোক তা কিনে নিতে পারে বড়াভাবীর কাছ থেকে। কিন্তু সে-টাকা কই? খামোকা নিজের জমির জন্যে টাকা দিতে ধার করবে কেন সবাই? কিন্তু আর একটা আইন আছে লেপচা পরিবারে। জমি বাঁচাবার জন্যে যে আইন করে দিয়েছিল পূর্বপুরুষেরা সেই আইনে বড়াভাবীকে বেঁধে রাখা যায়। আর তাই নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে বাড়ির উঠানে। মেজ ভাই এই সভার উদ্যোক্তা।

মানে আর একবার বাড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের পাতলা চাঁদের ঝলবে এখনই। সে খানিকটা চড়াই ভেঙ্গে পরিত্যক্ত চালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই চালাটা ছিল একটা বড়ির। তার না ছিল জমিজমা না ছিল মস্তান। লোকের কাছে হাত পেতে বেঁচে থাকত। কিন্তু মানুষটা ছিল অশুভ। প্রত্যেক বাচ্চা ছেলেকে বলত আমি মরলে আমার বাড়িটা তোর। ওই বাড়িতে হাওয়া ঢোকে, বরফ আটকায় না, জল হলে ন্যাতা হয়ে যায়। কে থাকতে যাবে সেখানে! বড়ি মরার পরও কেউ হাত দেয়নি, চালাটা অমানি হয়ে। মানের মতলব এল, এটাকে সারিয়ে নিয়ে থাকলে কেমন হয়! গাঁয়ের আর পাঁচজন যদি আপত্তি না করে তাহলে বেশ একা একা থাকা যাবে। এই সময় কলরব শোনা গেল। চারটে

মেয়ে কলবলিয়ে উঠে আসছে নিচের ঝোরা থেকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভরা কলসি। মানের খেলার সাথী ছিল একদিন। বড় হয়ে যাওয়ার পর ওরা এখন ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। মানেকে দেখামাত্র ওদের হাসি বেড়ে গেল। কলসি নামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে মদুখরা সে হাত নেড়ে বলে উঠল, ‘এ মানে, হি হি, আজ তুই ওইরকম নোংরা জামা পরে আছিস, ছি হি।’

মানে নিজের জামা দেখল, মোটেই নোংরা নয়। তাছাড়া এর অনেকটাই তো কম্বলের তলায় ঢাকা আছে। সে বলল, ‘ষা ভাগ্! নিজের কাম কর।’

‘কাম?’ মেয়েগুলো আরও গলিত হল যেন। তারপর একজন গালে হাত রেখে বলল, ‘পেট ভরে মিঠাই খাব কিন্তু। মানভঞ্জন থেকে আনবি না সুখিয়াপোখারি?’

‘মিঠাই? মিঠাই কেন খাওয়াতে যাব তোদের?’

‘আই বাপ! আজ বাদে কাল তোর বিয়ে আর মিঠাই খাবো না?’ সঙ্গে সঙ্গে হাসির বাজনা বাজল যেন। তারপর ওরা কলসি তুলে নিল আবার মাথায়। এবং এতক্ষণ যে মেয়েটি একদম কথা বলছিল না, সঙ্গিনীদের হাসির সঙ্গে তাল রাখছিল মাত্র, সে বলে উঠল, ‘ওই বড়ি জমিকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে থাক।’

এই কথায় কোন হাসি বাজল না। ওদের শরীর দ্রুত গায়ের দিকে ফিরে যাওয়া মাত্র বাতাসে হাঁক ভেসে এল, ‘মানে, এ মা-নে, মানে দা-জু-উ-উ।’

হাঁকটা দিচ্ছে ওর মেজ ভাইপো। মাত্র আট বছর বয়স, তার খুব ন্যাওটা। কিন্তু বড়ি জমিকে জড়িয়ে শূন্যে থাকতে বলল কেন মেয়েটা? ওই জমি তাদের প্রাণ, অন্নদাতা, তাদের রক্ত। ওই জমিকে ভালোবাসবে না তো তাকে জড়াতে যাব আমি? মেয়েটির উদ্দেশ্যে একটি গালাগাল সজোরে উচ্চারণ করতেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলল ভাইপো, ‘এ দাজু, সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? চল, চল।’

‘খুঁজছে কেন?’ মানে খেঁচিয়ে উঠল, ‘আমাকে কি দরকার? বড়াভাবী বাপের বাড়িতে চলে যাবনি।’

দ্রুত মাথা নাড়ল ভাইপো। না, যাবনি। তার মানে পরিবারের জমি পরিবারেই থাকছে। একটু ভাল লাগা শূরু হতে না হতেই আর একটা দম বন্ধ উত্তেজনা জন্ম নিল বৃকে। মেজ ভাই গায়ের মাতব্বরদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু সঠিক উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের সভায় স্থির ছিল যদি বড়াভাবীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বন্ধ করা যায় তাহলে সেই সন্ধানটি আজকেই মিটিয়ে ফেলা হবে। মানের সমস্ত রক্ত কম্বলের তলাতেও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

উঠানে আগুন জ্বলছে। জংলী কাঠের আগুন। পরিবারের এবং গায়ের মাতব্বররা সেই আগুনের চারপাশে জড় হয়ে গোল হয়ে বসে ধূমপান করছে।

চারপাশে ঘরের আড়াল থাকায় এখানে হাওয়া ঢোকে না, ঠাণ্ডাটা কম। মেয়েরা কেউ এই আলোচনায় নেই। তারা বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ঘরে কান পেতেছে। মানে সভায় ঢুকে শরীর থেকে কম্বলটা খুলল। আগুনের তাতে চমৎকার গরম ছড়াচ্ছে। মেজভাই তাকে দেখে বলল, ‘এই যে, মানে এসে গিয়েছে। আয় মানে, এখানে বস।’ এত আদর করে তাকে কখনও ডাকেনি মেজভাই। মানে একবার সমবেত মাতব্বরদের দিকে তাকাল, তারপর আগুনের সামনে গিয়ে বসল।

মেজভাই বলল, ‘বড়া দাজ্জ, আপনি কথা শব্দ করুন।’

বড়া দাজ্জ হলেন এই গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। চার কুড়ির ওপর বয়স। মানে চোখ তুলে দেখল বড়াভাবীর বাবা কিংবা ভাই এই আলোচনা সভায় নেই। ওরা কখন চলে গিয়েছে তা সে জানে না। বড় দাজ্জ বললেন, ‘এ বড় খুশীর কথা, খুশীর কথা। ভগবান আমাদের পেট ভরানোর মত জমি বেশী দেননি। যা দিয়েছেন তাই আমরা ষড় করে রাখতে চাই। পাহাড়ের নিচের মানুষদের অনেক জমি, সেখানে ভগবান অনেক জল দেন, খুব ফসল ফলে। আমাদের মেহনত করতে হয় অনেক বেশী কিন্তু তাও পেট ভরে না। সেই জমি যদি ভাগ হয়ে যায়, কেউ তার অংশ নিয়ে চলে যায় তাহলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মানে?’

মানে মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে।

‘ভাল। তোমরা চার ভাই। তোমাদের বড় ভাই-এর মত মাটির মানুষ আমি দেখিনি। ভাল মানুষদের ভগবান খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যান তাঁর কাছে। তোমার মেজভাই অত্যন্ত বিচক্ষণ। খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তোমার সেজভাই-এর ওপর ভগবান করুণা করেননি। জন্ম থেকেই সে হাঁটতেও পারে না, কথা বলতেও পারে না। বড় কষ্ট তার। আর ছোটভাই হিসেবে তোমার জন্যে আমরা গর্ব করি। কি সুন্দর স্রাস্থ্য দিয়েছেন ভগবান তোমাকে। সেজভাই-এর সব খামতি তোমার মধ্যে তিনি পূরণ করে দিয়েছেন। এখন কথা হল, তোমার বড়া ভাই মারা যাওয়ার পর তোমার বড়াভাবী কি করবেন! তার বয়স মাত্র দুই কুড়ি চার। এখনও তাকে যৌবন ছেড়ে যায়নি। কোন সন্তান নেই। সে আবার বিবাহ করতে পারে। তার বাপ আজ এসেছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যাওয়ার সময় সে নিয়ে যাবে জমির ওপর তার দাবী স্বামীর অংশ। বুঝতেই পারছ তোমাদের সংসারের ওপর কি আঘাত নেমে এসেছিল। তোমাদের এমন অর্থ নেই যে অংশটা বড়াভাবীর কাছ থেকে কিনে নেবে। ওরা তো ছাড়বেই না। কিন্তু আমাদের আইনে, ধর্মে যে বিধান আছে তা সবাই মানতে বাধ্য। বিধানটা হল যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার সবচেয়ে বড় অবিবাহিত ছেলে। সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার পরের ভাই। যদি কোন ভাই অবিবাহিত না থাকে তাহলে জেঠা বা কাকার ছেলেদের সঙ্গে ওই বিবাহ হতে পারে।’

বড়া দাজ্জ নিঃশ্বাস ফেলল, ‘কিন্তু তোমার বড়াভাবী এসব বিধান শুনতে

চাইছিল না। তোমার মেজভাই বিবাহিত অতএব মেজভাই-এর এই পবিত্র অধিকার ভোগ করার কথা। সে অবিবাহিত। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বড়াভাবী। আমাদের বিধানে অবশ্য এ ব্যাপারে সমর্থন করা আছে। এখন একমাত্র তুমিই অবিবাহিত এবং তোমাদের জমি এবং বড়াভাই-এর প্রতি সম্মান দেখাবার সুযোগ পেয়েছ। এ ব্যাপারে তোমার কিছ্‌র বলার আছে?’

মানে শূন্য চোখে আগুনের দিকে তাকাল। বড়াভাবীকে বিয়ে করতে হবে তাকে? আজ সকাল থেকে এই ভয়টা তাকে টোকা মেরে যাচ্ছিল। এখন আগুনের সামনে বসে তার শীত আরও বেড়ে গেল। বড়াভাবীর মাথার চুলে পাক ধরেছে। খুব কাছে গেলে সেই দুই একটা বেরিয়ে আসা সাদা চুলকে দেখা যায়। শরীর বেশ ভারী। বুক দুটো পাথরের মত সান্দ্রাক্ষু পাহাড়কে কেটে বসিয়ে দেওয়া। সে যখন জন্মেছিল তখন বড়াভাবীর বয়স এক কুড়ি সাত। মানের কোন দিকে মন ছিল না। সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল। সে বিয়ে করবে একটা পনের ষোল বছরের মেয়েকে যার এই শীতেও নাকের ডগায় টলটলে ঘাম জমে। একটা বড়ি মোষের সঙ্গে এরা কেন তাকে জুতে দিচ্ছে? ওই বড়ি যদি মারা না যাবে তবু সে বিয়ে করতে পারবে না। যদি দু’কুড়ি বছর পর বড়ি মারা যায় তাহলে সে নিজেও বড়ো হয়ে যাবে। আর তখন কে তাকে বিয়ে করবে? মানের শরীরে কম্পন এল।

আর এই সময় বড়া দাজু বলল, ‘মানে, তুমি রাজী?’

সে কিছ্‌র বলার আগেই মেজভাই উঠে দাঁড়াল, ‘হ্যাঁ। ও রাজী। আমি মানেকে জানি। ওর মত শান্ত ভাল ছেলের দাদা বলে আমি গর্বিত। ও কখনও আদেশ অমান্য করে না। তাছাড়া এই জমিকে ও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। এবারেও সারা মরসুম আমার সঙ্গে চাষ করেছে। এর ওপরে আরও একটা কথা আছে। আমাদের বড়া দাদার বিধবা বলেছে যে এই পরিবারের কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে মানেকেই করবে। অন্য কাউকে নয়। মানে তার পছন্দের সম্মান রাখবে। মানে, ভাই আমার, হ্যাঁ কি না?’

মেজদাদার কথাগুলো হঠাৎ বিবশ করে দিল মানেকে। সে সম্মোহিতের মত ঘাড় নাড়তেই সমবেত মানদুহ হর্ষধ্বনি করে উঠল। মেজভাই হাত জোড় করে বলল, ‘তাহলে আর দেবী নয়। দ্বিতীয় বিবাহে তো বেশী নিয়মের দরকার হয় না। আজই কাজ সেরে ফেলা যাক।’ বড়া দাজু সম্মতি দিলেন এই প্রস্তাবে।

পাহাড়ে রাত নামে সন্ধ্যার আগেই। আর সেটা ঘুম-হয় বাতাসের ঝাপটা লাগলেই। নিয়ম কানুন চুকে গেলে মানে চোরের মত বসেছিল। গাঁয়ের বিভিন্ন ঘর থেকে যারা এসেছিল তারা রাতের দোহাই দিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে শুনল। এর পরের পূর্ণিমায় খাওয়া দাওয়া হবে। শেষ লোক বেঁ গেলে তার নাম পূরণ। জাতবজ্জাত লোকটা। হাতে কাঁচা পয়সা আছে। জমির ধার ধারে না, মানেভগ্ন দার্জিলিং-এ গিয়ে টুরিস্টবাবুদের গাইড হয়। যাওয়ার আগে সে কানে কানে বলে

গেল, 'তোরা' বউ-এর খাঁই খুব। শরীরটা যেন চোরাবালি। চট করে ডুবে যাস না যেন। তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে।'

শেষ কথাগুলো য়ে একদম বুক থেকে বলা তাতে সন্দেহ নেই। তার ডবল বয়সের এই লোকটা এতদিন তাকে পাস্তাই দিত না অথচ আজ এমন ভঙ্গিতে বলে গেল যেন কতকালের বন্ধু। শালার যে বড়াভাবীর ওপর নজর ছিল তা এই গ্রামের কার না জানতে বাকী আছে। মানে উঠল। বিয়ের পর বউকে সে-রাতের মত সরিয়ে নেয় না কেউ, কিন্তু বড়াভাবী নিজেই উঠে গেছে তার নিজের ঘরে যেখানে সে বড়া-ভাইয়ের সঙ্গে শ্বশুর।

মানের নিজের কোন ঘর নেই। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে বৃদ্ধিদাদির ঘরে তার রাত কাটতো। সে-ঘরে নিশ্চয়ই এখন রাত কাটানো যাবে না। মানে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতোই তাকে দেখতে পেল মেজভাই, 'আই, কোথায় যাচ্ছিস?'

'ঘরুরতে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এই ঠান্ডায় কেউ বাইরে যায়!'' তারপর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল মেজভাই, 'আজ তুই আমার বৃকে শান্তি এনে দিয়েছিস মানে! এই জমির অংশ চলে গেলে আমাদের পরিবারটা বাঁচত না। ওই পূরণ শালা জমিটা কিনবার জন্যে ঘরঘর করছিল। তুই বাঁচিয়েছিস। যাক, এখন এই তুই ওকে বড়াভাবী বলে ভাববি না, নিজের বউ-এর মত দেখাবি। প্রয়োজনে কড়া হবি। যা ঘরে যা।'

'কোন ঘরে?'

'বড়া দাদার ঘরে।'

'না। ওই ঘরে আমি শোব না। বড়াভাই আমার বাপের মত।'

মেজভাই হকচকিয়ে গেল, 'তাহলে! আমাদের আর একটা নতুন ঘর তুলতে যে সময় লাগবে!'

'লাগুক। তাতে আমার কি? আমি চললাম, বৃড়ির চালায়।'

'বৃড়ির চালা? ওখানে তো হাওয়া ঢোকে।'

'ঢুকুক। আমার কম্বল আছে।' কথাটা বলে হন হন করে হাঁটতে লাগল মানে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন হুটহাট করে ঘটে গেল যে যেন একটা পদতুল।

ক্রোধ মানুষের অন্য অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দেয়। মানে জানলই না ঠান্ডার কামড় কতখানি। চালায় ঢোকান পর সে প্রথম ঠান্ডা টের পেল। কম্বলের তলায় শরীরটা কনকন করছে। চালাটা নোংরা নয়। ক্রোধ হয় বাচ্চারা এখানে খেলা করে বলেই বেশী ধুলো জমেনি। ধুলো জমলে নাকে গন্ধ আসতো। ফাঁক ফোকর দিয়ে বাতাস আসছে। একটা দেওয়াল ঘেষে বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশ পেতে খাট করা। কোন বিছানাপত্র নেই, কোন আসবাব নেই। দরজা একটা আছে বটে তবে সেটা ঠান্ডা বাঁচানোর জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে নয়। একটা আলো;

সঙ্গে রাখলে ভালো হত। বাড়ি থেকে বেরদ্বার সময় যে উত্তেজনাটা বৃদ্ধি ছোবল মারছিল এখন সেটার মাজা ভেঙ্গেছে। অশ্বকারেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চোখ সয়ে নিয়ে সেই আলোটাকে আবিষ্কার করে। মানে সেই আলোর ফাঁকফোকর-গুলো ভর্তি করতে চাইল। প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় বাতাস ঢোকা বন্ধ হল। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাময়িক প্রতিরোধ। একটু ঝড় উঠলে বা বরফ পড়লেই যে-কে সে-ই হবে।

বাঁশের মাচাটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। আর একটা কম্বল আনলে হত। বাবুরা পাহাড়ে বেড়াতে যায় এক ধরনের থলি নিয়ে। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলে আর ঠাণ্ডা লাগে না। সেরকম একটা হলে বেশ হতো। কম্বল মন্ডি দিল মানে। এই চালাটা কারও নয়। জমিরটায় পাথর বলে কোন মালিক নেই। এই চালাটাই সারিয়ে নিলে কেমন হয়। বড়া দাজুর কাছে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা পাঁচটা ওজর দেখাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শরীরটায় ঠাণ্ডা কিছুতেই যাচ্ছে না। মানে উঠল। ঘরের কোণায় কয়েকটা মোটা কাঠ দেখেছিল। সেগুলো জড়ো করে কয়েকটা কুচো কাঠে দেশলাই ঠুকল সে। যদিও এই কাঠে রস নেই তবু ধরানো খুব মৃদুশকিল। ফুঁ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আগুনের দেখা পেল। তারপর সেটাকে লালন করতে করতে আরও একটু বাড়ল। দুটো হাত সঁকে নিল মানে। আর তার পরেই চোখে পড়ল একটা নেড়ি জ্বল জ্বল করে তাকে দেখছে মাচার নিচে বসে। এটার বোধ হয় এটাই আস্তানা এখন। তাড়াতে গিয়েও মন পাচ্ছিলো সে। থাক বেচারী। আগুনটা মাঝখানে বাড়ছে। বেশ তাত ছড়াচ্ছে। চালায় একটা লালচে আভা কাঁপছে। আবার কম্বলটাকে টেনে নিল সে। মোটা কাঠের গুঁড়িটায় আগুন ধরছে। সারারাত জ্বলবে নিশ্চয়ই। শরীরে আর তেমন ঠাণ্ডা ভাব নেই। শূদ্ধ বাঁশের খাঁজগুলো পিঠে লাগছে। চোখ বন্ধ করল মানে। আজ তার বিয়ে হয়ে গেল। কত সোজা ব্যাপার যেন। অথচ সে বিয়ে করতে পারত একটা ডাঁসা মেয়েকে। ওই আজ যারা কলসী মাথায় করে জল নিয়ে এসেছিল তাদের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়েটাকে। ফাঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। নিজের শরীরে যে যৌবনের ফুলকি জন্মেছে সেটা কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু—হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতেই দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন শব্দটা ইচ্ছে করেই করল। দরজাটা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপরেই চাপা গলায় প্রশ্ন, ‘এখানে এসে শোওয়া হয়েছে যে?’

মানে সাড়া দিল না। বড়াভাবীর বলার ধরন এই রকম। সে যখন বাড়ন্ত হল, হাত পায়ের গুলি শান্ত হল তখন থেকেই ওইরকম সেক্সোনো কথাবার্তা।

‘আজকের রাতে কেউ আলাদা শোয় নাকি?’

‘আমি এখানেই শোব।’ চোখ না খুলে বলল মানে।

‘এখানেই শোব? ই-হি! শোব বললেই হল! শূতে দিচ্ছে কে? এই

খোলা মাঠের মধ্যে আমি শূতে পারব না। ওঠ, ঘরে চল। লোকে বলবে কি! শেষ বাক্যটা এমন নরম গলায় যে চোখ না খুলে পারল না মানে। আর খুলতেই সে চমকে উঠল।

বিয়ের আসরে বড়াভাবীকে সে দেখতে পায়নি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা ছিল তার। ঘোমটার ফাঁকে চিবুকের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সে দিকেও নজর দিতে ইচ্ছে করেনি। কোন আকর্ষণ বোধ করেনি সে ওদিকে তাকাতে। কিন্তু একি সাজ সেজেছে বড়াভাবী। গায়ে কম্বল জড়ানো বটে কিন্তু মাথার চুল খুব কায়দা করে বাঁধা, মুখে পাউডার, খোঁপায় ফুল, আর দুহাত ভরতি নানান রঙের চুড়ি। কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। প্রতিদিনের আটপোরে গন্ধটা একটুও শরীরে নেই।

বড়াভাবী ততক্ষণে মাচান্ন এসে বসেছে। বসে বলল আমার অবশ্য ওই বাড়িতে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। আমি তো বাপের বাড়িতে চলে যাব বলে ঠিকই করেছিলাম। ওখানে কত ছেলে আমার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে আছে। শুধু ওখানে কেন, এই গ্রামে নেই নাকি। যেমন ধর পূরণ। সে বলেছিল তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও আমি তোমাকে সাদী করে ফের এই গ্রামে নিয়ে আসব। কিন্তু লোকটা ধান্দাবাজ, একসঙ্গে পাঁচটা মেয়ের পেছনে ঘোরে। তারপর যখন তোমার মেজমাই আমার হাতে পায়ে ধরল, বলল, জমি বাঁচাও, বিধান মানো, আমার বাপটাও যখন তাই বোঝালো, তখন আমি বললাম, মরে গেলেও ওই রশ্মি নুলো দেওরটাকে বিয়ে করতে পারব না। 'বিয়ে যদি করতেই হয় তো তোমাকে।' কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে মানের চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে মন্দির হাসল সে, 'তরতাজা জোয়ান, যত বয়স হবে তত গাছের মত মজবুত হবে। এই রকম জোয়ান না হলে সুখ হবে কি করে বল। তাই রাজী হয়ে গেলাম। চল, ওঠ, ঘরে যাই।' দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে হাই তুলল বড়াভাবী।

‘আমি এখানেই থাকব।’ মিন মিন করে বলল মানে।

‘এখানে কেন? এই নোংরা জায়গায় আমি থাকতে পারব না।’ ফোঁস করে উঠল গলার স্বর।

‘বড়াভাবী তুমি আমাকে মাপ করে দাও।’

‘ব-ড়া-ভা-বী।’ হি হি করে হেসে উঠল, যেন এর চেয়ে হাসির কথা সে জীবনে শোনেনি, ‘আমি আজ থেকে তোমার বউ, তুমি আমার সম্প্রতি। ওম্ব বলে খবরদার ডাকবে না।’

দুচোখ বড় করে তার রক্ত দেখাল যেন সে! ‘আমার নন্দা নিমা। তাই বলবে।’ মানে ঢোক গিলল, ‘ওই ঘর বড়াভাই-এর। ওখানে গেলে—।’

‘ও এই কথা। দূর পাগল। তোমাদের বড়াভাই একটা মানুষ ছিল নাকি। একটা পিপড়ের ক্ষমতাও ওর চেয়ে বেশী ছিল। যে পুরুষ বউকে সুখ দিতে পারে না সে আবার পুরুষ নাকি? তার জন্যে মন কেমন করার কোন দরকার নেই।’

চল ।’ এবার হাত ধরে টানল নিমা ।

হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল মানে, ‘আমার মন মানছে না ।’

‘কেন ? মন মানছে না কেন ? আমি কি খারাপ ? গ্রামের সব ছোঁড়াবুড়ো আমায় পেলে বতেরে যায় তা জানো ?’ গর্জে উঠল নিমা, ‘নাকি অন্য মতলব । কোন বাচ্চা মেয়ের কাছে ফেরে গেছ এর মধ্যে । ডাগর ছাগল পেলে রান্ধুসরা তো ছাড়ে না । সত্যি বল ?’

‘না’ আমি ওসবের মধ্যে নেই ।’

‘নেই তো ? ভাল । শোন, তোমায় একটা কথা বলি । ওই যে হাড়িজরাজিরে বাচ্চা মেয়েরা ওরা কোন কন্মের নয় । এক হাটুঝোরায় স্নান করতে কি মজা লাগে ? স্নানের জন্যে চাই ডুব জল, ইচ্ছে মতন সাঁতার দেওয়া যায় যেখানে । কথাটা মনে থাকবে ?’

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মানে, ‘তা হোক, তবু আজ আমি এখানে থাকি ।’

কিছুক্ষণ কথা না বলে নিমা ওর দিকে তাকিয়ে থাকল । যেন মতলবটা বুঝতে চাইল । আগুনটা এখন জ্বলছে । তার লাল আভাষ নিম্নার মূখটা রহস্যময় দেখাচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দরজার কাছে গেল । বাইরে মূখ বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল, ‘আই বাপ, কি ঠান্ডা ।’

তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল কিছু সময়, ‘এটা তো বন্ধই হয় না । না হোক, এত ঠান্ডায় আর কে আসবে । সরো, কন্মলটা পেতে দিই ওই মাচার ওপরে । একটা নিচে আর একটা গায়ে দেব । তুমি ততক্ষণে আগুনটা আরও জোরদার করে দাও । তাহলে রাতটা গরমে গরমে কাটবে ।’ চোখ মটকে হাসল নিমা ।

হুকুম পালন করতে করতে বড়াভাবী, না, নিম্নার সুবুহু নীতম্ব দেখে মানে আরও জ্বলজ্বল হয়ে যেতে লাগল । এই মেয়েমানুষটাকে খুঁড়ি, জেঠি এবং বড়াভাবী ছাড়া অন্যকিছু ভাবা যায় না । এখন ওর মতলব এই চালাতে রাত কাটানো । মানে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে আগুন ধরিয়ে নিল । তারপর চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল তার কি করা উচিত । ভেবে কুল পাচ্ছিল না সে ।

‘উঃ কি ঠান্ডা রে বাবা । আমাকে সুখটানটা দাও তো ।’

মানে চোখ তুলে দেখল একটা সাদা পাইথন তার সামনে নড়ছে ১ ওটা যে নিটোল হাত যার কোথাও আবরণ নেই, কন্মলের তলায় শোওয়া শরীরটা থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে প্রত্যাশায় আঙ্গুল নাড়ছে তা বুঝতে সময় লাগল । সে সম্মোহিতের মত বিড়িটা এগিয়ে দিতেই লাল ফুলকিটা টিপের মত আর একটা ঠোঁটে আটকে গেল যেন । তারপর ভুল করে খানিকটা ঘোঁরা ছেড়ে বিড়ির শেষ অংশটাকে আগুন ছুঁড়ে দিয়ে ডাকল, ‘এই, এসো ।’

মানে এবার আবিষ্কার করল বড়াভাবী কিভাবে নিমা যে কি না এখন থেকে তার বউ সমস্ত কাপড়জামা ওপাশে ছেড়ে রেখে কন্মলের তলায় শুয়ে আড় ভাসছে । আর সেই ভঙ্গিমায় কন্মল সরে যাওয়ায় আগুনের রঙ লাগছে খোলা চামড়ায় ।

‘এসো, এসো না?’

জঙ্গলে আগুনের হাত শক্তিশালী হলে বাতাস তার বন্ধু হয়ে যায়। কোন ঝরনার সাধ্য নেই সেই আগুন নেবায়। এই নিস্তব্ধ চরাচরে, বাইরে যখন ধারালো বাতাস বইছে শীতের ছুঁরি মুখে, কোথাও কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই তখন আগুনের বৃকে কাঠের জোড়গুলো ফাটছিল নিঃশব্দে।

এত ক্লান্তি এই জীবনে আসেনি মানের। একটা দেশলাই কাঠি যখন একগাদা শুকনো কাঠের ওপর পড়ে তখন আগুনের চেহারাটা বদলে যায়, কাঠিটাই পড়ে মরে। ভোরের আগে হাতে পায়ে ধরেছিল নিম্না। বারংবার ক্ষমা চেয়েছিল, নিষ্কৃতি চেয়েছিল এই রাত্রের জন্য। একটা পনেরো বছরের উদ্দামতার কাছে হার মেনেছিল সে। জ্বলে ওঠার পর মানে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিঃশ্বাসে সমুদ্র শূষে নেওয়ার পর তাকে দেওয়ার কিছু ছিল না নিম্নার। পরাজিতা অথচ ভীষণ সুখী দেখাচ্ছিল তাকে। এখন ঢালার মাঝখানে জ্বালানো নিবন্ত আগুনে শিশুর মত তার ঘুমন্ত মুখটা দেখে উঠে দাঁড়াল মানে। ক্লান্ত শরীরে কিন্তু ঘুম আসছে না।

সমস্ত শরীর কম্বলে মুড়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডা চাবুক কবালো। মানে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরে একটুও শক্তি নেই! কিছুদিন আগে তার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। ওদের জমির পাশে যেখানে পাহাড়ের শূরু সেখানে খানিকটা সমান জায়গা আছে। সারাদিন কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়েছিল সে। অনেকটা জমি কোপানোর পর যে আনন্দ তা টুক করে চলে গেল বিকেলবেলায়। কোদালের ফলা ঠং করে বাজল পাথরে। জমির তলায় পাথরের আন্তরগ। তখন যে ক্লান্তি শরীরে এসেছিল এটা সেইরকম। কোথায় যাচ্ছিল খেয়াল নেই, পাতলা অন্ধকারে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ও মাটির গন্ধ পেল। তারপর মুখ তুলে দেখল আমনের আকাশে লালের ঘোর লেগেছে। কাশ্মিরজংঘার শরীরের রঙ পাচ্চাচ্ছে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শূন্য চামের জমির সামনে।

এই ফসলকাটা হয়ে যাওয়া ক্ষেত আর কোনকালে বাড়বে না। উঁবু হয়ে বসে ভাঙ্গা মাটিতে হাত রাখল মানে। বড়াভাবী কিংবা নিম্না অথবা তার বউয়ের মা হবার বয়স ফুরতে আর বেশী দেরী নেই। অথচ সে বাপ হতে পারে আরও দুকুড়ি বছর। তন্মিদি যদি বড়াভাবী কিংবা নিম্না অথবা তার বউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বংশধর আসবে না। না এলে সংসার বাড়বে না। বড়াভাই ছেলেমেয়ে রেখে যাবনি। সেজভাই পঙ্গ, অথর্ব। সে-প্রশ্নই নেই। চারভাই-এর এই জমিটা আর কিছুকাল পরেই মেজভাই-এর দুই ছেলের হয়ে যাবে। চার থেকে দুই-এ। কাল রাত্রে সোহাগের সময় মেয়েছেলেটা বলেই ফেলল সে আঁচ বাচ্চা চায় না তাতে ঘোঁষন মরে যায়। এ থেকে আর একটা রহস্যের আড়াল সরলো। বড়াভাই-এর কি সবটাই দোষ ছিল?

মানে আরও কয়েক পা হাঁটল। সেই পাহাড় কেটে সমান করা জমিটার সামনে ও এখন। এই জমি কেউ ছোঁয় না, কারো লোভ নেই। সারাদিন কুপিয়ে ষখন সে এর তলায় পাথরের আস্তরণ পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল হতাশায় তখন গ্রামের মানুষ হেসেছিল। এই অচাষযোগ্য জমির ওপর কারও লোভ নেই, তাই মমতাও নেই। মানে নিজেদের চাষযোগ্য জমিটার দিকে তাকাল। মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করে সে ওই জমিটাকেই শুদ্ধ বাঁচায়নি, জমির অনেক দায়ও বাঁচিয়ে দিল। এখন থেকে ফসল খাবার মুখ কমবে এই পরিবারে।

হাত বাড়িয়ে পাথরে জমির মাটি স্পর্শ করল সে। শিশিরে কাদা কাদা হয়ে আছে। এই মাটি ফসল ফলাবে না, তাই কারো আকাঙ্ক্ষা নেই, ভালোবাসা নেই এর ওপর। কিন্তু এর তলায় যে পাথরের আস্তরণ তার সীমা কতদূর। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নিশ্চয়ই চলে যায়নি। ওই পাথরের আস্তরণের নিচে নিশ্চয়ই নরম মাটি আছে উর্বর হয়ে। একবার যদি পাথরের আস্তরণটা তুলে ফেলা যায়— মানে রোমাঞ্চিত হল। পাওয়া যায়? একথা কেউ তাকে বলেনি।

দূরে কুয়াশায় ঢাকা বৃষ্টির ঢালাটার দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হল সামান্য মাটি খুঁড়ে সে পাথরটাকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু আরও খুঁড়লে যদি বর্বর মাটি, কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বলেছে পাথরের শক্তিও সীমিত। তাহলে?

জ্যা-মুন্ডু তীরের মত মানে ছুটল তাদের বসতবাড়ির দিকে, একটা কোদাল খুঁজতে।

- সমাপ্ত -